[সাধনামূলক উপন্যাস।]

"আলোচনা" সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে

পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

স্বদেশী শিল্পে নিবিষ্ট-প্রাণ, পরদুঃখ-কাতর,

বারেন্দ্রকুল-গৌরব, স্বনামধন্য কর্ম্মবীর

স্বর্গীয় মহাত্মা

কিশোরীমোহন বাকৃচি মহোদয়ের

সুপবিত্র স্মৃতির উদ্দীপনে—

দাদা!

আজ বহু দিবস হইল, আপনি সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া সংসারের ও..পারে স্বর্গে চিরশান্তির আগারে বাস করিতেছেন, আমরা আপনার সেই অমিয় মধুর স্মৃতিটুকু বুকে ধরিয়া এই আধিব্যাধি পীড়িত সংসারে অবস্থান করিতেছি। কোথায় আপনি আর কোথায় আমরা, তথাপি সময়ে সময়ে আপনার স্মৃতি এ অধম গ্রন্থকারকে একটু নাড়া-চাড়া দেয়—অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। একদিন সংসারে অবস্থান কালে একত্র কত প্রাণের কথা, সংসারের কত সুখ দুঃখের কথা কহিয়াছি, ধর্ম্মের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া কত আনন্দানুভব করিয়াছি, সেই সকল বিস্মৃত কথা এখনও স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমি প্রাণে যে কত তৃপ্তি অনুভব করি—তাহা বিবৃত করিতে অক্ষম। আপনি আমার ধর্ম্মমূলক কথার এবং পুস্তকে লিখিত ধর্ম্মময় চরিত্র চিত্রণের বড় প্রশংসা করিতেন, তন্ত্রশাস্ত্রে এ অধম গ্রন্থকার নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও আমার মুখে তন্ত্রের কথা শুনিতে আপনি বড় ভাল বাসিতেন। তাই ভাই আজ আপনি কোন্ অজানা দূর দেশে, মানব চক্ষুর অগোচর শান্তিময় প্রদেশে অবস্থান করিলেও আমার তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

"শক্তি-সাধনা" আপনার সুপবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভাই! তুমি যেখানেই থাক, যে প্রদেশেই বাস কর, বিশ্বরাণী ভবভাবিনীর সুবিশাল রাজ্য ছাড়া নহ, মায়ের ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া অমৃতের অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছ, আজ তাহার সহ আমার এই মাতৃনাম মহামন্ত্রের সুরসাল সাধন-তত্ত্বটুকু, অজ্ঞতা হেতু কটু হইলেও, মধুময় ভাবিয়া কথঞ্চিৎ উপভোগ করিয়া তোমার এই কনিষ্ঠ সোদরোপম গ্রন্থকারকে ধন্য কর—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী
১০৫ পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
শুভ ১৬ই বৈশাখ
১৩৩৩ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে শক্তি-সাধনা একান্ত আবশ্যক। মাতৃশক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া, নির্ভীক-চিত্তে কর্ম্মযোগে প্রাণের আহুতি দিতে না পারিলে—শুধু কথায় কাজ হইবে না। জীবন-সংগ্রাম দিন দিন বড়ই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এমন কি, তাহাতে জয়লাভ করা সাধারণ শক্তিতে আর কুলাইতেছে না, এইজন্ত শক্তির আবশ্যক। সাধনা করিয়া এই শক্তিকে জাগাইতে হইবে। বিনা সাধনায় সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা না করিলে আর আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অসীম শক্তিশালী না হইলে, হৃদয়কে সুদৃঢ় ও নির্ভীক করিয়া কর্ম্মযোগে আসক্তি-সম্পন্ন না হইলে তুমি দাঁড়াইবে কোথায়—স্থান কই? ভগবান্ বলিতেছেন—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।" ভারত-শ্মশানে শক্তি-সাধনার দিন আসিয়াছে। তাই মা-ময় প্রাণ লইয়া শক্তি-আরাধনা কেমন করিয়া করিতে হয়, কিরূপে একদিনে ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ করিয়া সাধক বিশ্ব-বিজয়ী হইতে পারে, এই পুস্তকে সেই সাধন-প্রণালী বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়া, কর্ম্মযোগের সার—শক্তির সাধনাতে যে মানুষ দেবতা হয়—তাহা রামেশ্বর-চরিত্রে প্রকটিত করা হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের উপাসনা ভিন্ন কলির জীবের আর অন্ত উপায় নাই। কিন্তু সেই তন্ত্রশাস্ত্র অতীব দুর্বোধ্য এবং সকামভাবে তাহার সাধনা অতিশয় প্রলোভনময়। বুঝিতে না পারিয়া এই গুপ্ত সাধন-শাস্ত্রকে লোকে ব্যভিচারে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে। ভগবান্ সদাশি[illegible] আশুসিদ্ধিপ্রদ সাধনার পরিণাম দেখিয়া সময়ে সময়ে চক্ষে [illegible]

তাই আজ **"শক্তি-সাধনা"** নাম দিয়া শব-সাধনার প্রক্রিয়া, শক্তি-সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা—ঠিক উপন্যাসের ভাষায় প্রকাশ করিলাম।

উপন্যাসপ্রিয় পাঠক! নায়ক-নায়িকার পবিত্র-প্রেম, সতীত্বের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মলার পরের জন্য আত্মত্যাগ, শক্তি-সাধক জ্ঞানানন্দের শব-সাধনায় মাতৃ-দর্শন, অসীম শক্তিলাভে অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপ সংসাধন, সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার হাল-ফ্যাসানের শিক্ষায় ঘোর অধঃপতন, হিন্দু-সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী ব্রহ্মচারিণী দাক্ষায়ণীর "কাটনা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করত সংসার পরিচালন" প্রভৃতি পাঠ করিয়া, আশা করি—প্রণয়-পুলকে পুলকিত হইবেন। তারপর শক্তি-সাধনার অমোঘ শক্তি; চণ্ডী-পাঠের বিশ্ববিজয়িনী ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই সম্মোহিত হইবেন। এই পুস্তকে একাধারে উপন্যাস ও সাধন-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুগম পন্থা প্রচারের জন্য পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ! মৎপ্রণীত পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩০।৪০ খানি গ্রন্থের মত এখানিকেও স্নেহের চক্ষে দেখিলে, পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের দুই হাজার কাপি প্রকাশের যাবতীয় স্বত্ব মেসার্স পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাকৃচি প্রভৃতি মহাশয়গণকে অর্পণ করিলাম। ইহার পর, পরবর্ত্তী সংস্করণের যাবতীয় স্বত্ব আমার নিজস্ব রহিল। ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী
১০৫ নং, পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
১৬—১ ৩৩

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ওঁ ভূঃ।

প্রথম খণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য।

পশু বা তামসিক ভাব।

ব্রহ্মানুসন্ধান ও ব্রহ্মে বিচরণ।

কর্ম্মযোগ।

শক্তি-সাধনা

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশীবাস।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য পাকা হইলে তবে মানবের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। তখন সংসার-ভাব সম্যক্ ভাবে তিরোহিত হইলে আর এসব কিছুই ভাল লাগে না, মন স্বভাবতই আরও কিছু মধুর বস্তু লাভের জন্য অস্থির হইয়া পড়ে, পরকালের পথ মুক্ত করিবার জন্য তখন প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে। সংসার হইতে অবসর লাভের জন্য প্রাণে একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়া সকল বিষয়ে যেন বৈরাগ্য-ভাব আনয়ন করে—এই অবস্থাই বাণপ্রস্থ। শাস্ত্র এই জন্য "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বলিয়া আদেশ করিয়াছেন। সংসার ছাড়িয়া যে বনেই বাস করিতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই, তবে তখন যেন মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়; তাহা হইলেই জীবের আর পরকাল নিস্তারের কোনও ভাবনা থাকে না।

দেবীপুরের দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রপাঠী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সুব্রাহ্মণ।

বহুদিন ধর্ম্মভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এখন আর তাঁহার কিছু ভাল লাগে না; তাই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া কাশীবাসের ইচ্ছা করিয়াছেন। পুত্রদুইটি উপযুক্ত হইয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্মে তাহারা এখন পরিপক্ক, তবে আর বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকা কেন? এখন দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই প্রাণ সুস্থির হয়।

অধ্যাপক দেবানন্দের সংসার খুব সচ্ছল। শিষ্য যজমানের কল্যাণে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রণের বিদায়পত্রে এবং দক্ষিণা ও প্রণামী প্রভৃতিতে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। উপার্জ্জনও যেমনি, খরচও তাঁহার তেমনি ছিল। গৃহে একটি টোল ছিল। তাহাতে আট-দশটি ছাত্র ঠিক নিজের বাটীর মত প্রতিপালিত হইত; অতিথিশালায় কত অতিথি আসিত যাইত, তাহার স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের সন্তোষ বিধান করিতেন। গৃহে পূজা-পার্ব্বণ ত' ফাঁক পড়িত না, তারপর লক্ষ্মীশ্রী হইলে আত্মীয় স্বজন যেমন আপনাপনি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া আসিয়া জুটে—ভট্টাচার্য্য-গৃহে তাহারও অভাব পরিলক্ষিত হইত না। এত খরচ করিয়াও ব্রাহ্মণ নগদ অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; ছোটখাট একখানি জমীদারীও তাঁহার ছিল। প্রজাগণ সকলেই রামরাজত্বের মত তথায় সুখে বাস করিত, কর-আদায়ের জন্য কখন কাহাকেও কোন প্রকার পীড়ন সহ্য করিতে হইত না। সংসারের সকল সুখ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া দেবানন্দ এখন উদাস-প্রাণ, ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী সুখভোগের জন্য তাহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত। যাহাতে জুয়ার-ভাটা নাই—যে সুখে সুখী হইলে প্রাণ আর অন্য কোনও সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না, ব্রাহ্মণ এখন সেই অতুল স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংসারে আপনার বলিতে দেবানন্দের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর, কনিষ্ঠ রামেশ্বর, পত্নী উমাকালী, আর একটি কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী—নাম দাক্ষায়ণী এবং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ প্রমোদা, এই কয়েকটি মাত্র পরিজন; কিন্তু ব্রাহ্মণের মাসিক আটমণ চাউলেও সংসারের ভরণ-পোষণ হইত না। এমনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বেশ্বরের বয়স ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাঁহারও এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে; কনিষ্ঠ রামেশ্বরের বয়স পঁচিশ বৎসর, এখনও বিবাহ করেন নাই। সর্ব্বেশ্বর ইংরাজী-শিক্ষায় মূর্ত্তিমন্ত বলিয়া পিতার সমস্ত বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন আর কলিকাতার কোন আফিসে চাকুরী করিয়া মাসিক কিছু উপার্জ্জনও করেন। তিনি বলেন—পিতার এ সমস্ত অর্থব্যয় কেবল বাজে খরচ মাত্র—ব্যয় করিবার কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু দেবানন্দের ন্যায় পিতার উপর কোন কথা বলা তাঁহার সাধ্য নাই—কাজেই নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন। শ্বশুরের বাজে খরচ দেখিয়া প্রমোদার গা ইস্‌পিস্ করিত, কিন্তু কি করিবেন —উপায় ত' নাই। কনিষ্ঠ রামেশ্বর ঠিক পিতার অনুরূপ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আচার-ব্যবহার রক্ষায় নিপুণ, শাস্ত্রাধ্যয়নপটু সুপণ্ডিত; পৈতৃক শিষ্য-যজমান রক্ষা করিতে, পিতার কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়া বংশের মানবৃদ্ধি করিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রগাঢ়, কিন্তু দাদা ও বৌদিদি বিপরীত ভাবাপন্ন; তাঁহারা এখনকার ধরণে ওসমস্ত কীর্ত্তিকলাপ উচ্ছেদ করিয়া, স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া হাল্‌ফ্যাসনে থাকিতে পারিলে আর কিছুই চান না। অত গোলমাল তাঁহাদের অসহ্য।

পিতামাতা যখন কাশীবাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সর্ব্বেশ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া মৌখিক খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রমোদাও কৃত্রিম দুঃখ জানাইতে লাগিল। রামেশ্বর কিন্তু

প্রমাদ গণিলেন, তিনি পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া, কেমন করিয়া থাকিবেন। পার্থিব দেবতা পিতামাতার চরণ বন্দনা না করিয়া যে রামেশ্বরের দিন চলে না। যেদিন তিনি এ কার্য্য করিতে না পাইতেন, সেদিন তাঁহার বৃথা বলিয়া মনে হইত। গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিয়াও তাঁহার তত তৃপ্তিবোধ হইত না, যত জনকজননীর পূজায় তৃপ্তি বোধ করিতেন। দেবানন্দ যেদিন দূরদেশে বিদায় লইতে যাইতেন, সেদিন রামেশ্বর বড় একটা পাঠাভ্যাসে মন সংযোগ করিতে পারিতেন না। যেন চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। তাই অতবড় বুড়োছেলেও মায়ের আঁচলে আঁচলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেদিন পিতার অভাব জননীতে পূরণ করিয়া লইতেন। রামেশ্বরের এরূপ ভাব দেখিয়া সকলে না হউক, সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সর্ব্বেশ্বর সকল বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রামেশ্বর দাদা ও বৌদিদির কার্য্যে কোন প্রকার সমালোচনা করিতেন না, তাহার কারণ তাঁহারাও যে দেবদেবীর স্থানীয় ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা ; প্রমোদা যে মাতৃস্থানীয়া, ইহাদের কথায় আবার প্রতিবাদ কি ? কোন বিষয় অযৌক্তিক হইলেও রামেশ্বর তাহা অবনতমস্তকে পালন করিতেন। সমস্তদিন পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ লইয়াই কাটাইতেন ; একখানি কাপড়, একখানি চাদর এবং একজোড়া চটিজুতা হইলেই তাঁহার বেশভূষার চরম হইত—সেই তপঃ-জ্যোতিঃপূর্ণ কলেবরে এই বেশভূষাতেই রূপের তেজ ফুটিয়া বাহির হইত। আর বড়বাবু নানাপ্রকার মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, এমন কি হ্যাটকোট পরিলেও তাঁহাকে তেমন সুন্দর দেখাইত না। ভগবান্ প্রদত্ত গঠন প্রণালী ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য যে স্বতন্ত্র, কৃত্রিমতায় কি তাহা লাভ হইতে পারে ? তাহা হইলে কুরূপও ত' সহজে সুরূপ হইতে পারিত। রামেশ্বরের প্রকৃতি যেমন

কমনীয় ছিল, জনমনোহর সৌন্দর্য্যও তাঁহার দেহ-অঙ্গনে তেমনি খেলিয়া বেড়াইত, দেখিলে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলকেই ভক্তি করিতে বাধ্য করিত।

পিতামাতা তীর্থগমন করিবেন। বাণপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবেন, পুত্র হইয়া হহাতে বাধা দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। স্বধর্ম্মপরায়ণ বিপ্রজাতি যদি এ সকল প্রতিপালন না করিবেন, তবে করিবে কে? ইহা ত' তাঁহাদেরই আশ্রমোচিত কার্য্য —বরং পুত্র হইয়া পিতামাতার এরূপ পরকাল চিন্তার পথে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য! রামেশ্বর জনক-জননীকে বাধা দিলেন না। আর সর্ব্বেশ্বর ত' পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন। পিতামাতা চলিয়া গেলে বিষয়ের ভার ত' তাঁহার হাতেই পড়িবে, তখন দেখা যাইবে, কেমন করিয়া এত বাজে খরচ হয়, আর প্রজারা খাজনা না দিয়া কেমন করিয়া রেহাই পায়। তবে পতি-পত্নীতে বাহ্যিক রাক্ষসীমায়া দেখাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা জানিতেন—পিতা-মাতা যাহা মনস্থ করিবেন তাহা নিশ্চয়ই করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না,—ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ যাক্ আর থাক্। যখন বাণপ্রস্থ গ্রহণ করিবেন, স্থির করিয়াছেন—তখন তাঁহার বাক্য নড়চড় হইবে না; তবে আমি কৃত্রিম কান্নাকাটি করিয়া মায়া দেখাইবার ত্রুটী কেন করিব?

প্রাণে ভগবদ্ভাব জাগিলে, আর তাহাকে কোন টানেই টানিয়া রাখিতে পারে না। তখন বিষয় বৈভব, পুত্র-পরিজনের মায়া আর কোন কার্য্যকারী হয় না। বিষয়বৈরাগ্য এমনি মনোহারী; এমনি আসক্তিশূন্য। যিনি এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন, তাঁহার জীবনই ধন্য, নতুবা কপটতা আশ্রয় করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সাধু সাজিলে, তাহাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে

হয়; তীর্থস্থানে গিয়া ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা ভুলিয়া গৃহের পুঁইমাচার চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে।

তখন তীর্থের পথ এত সুগম ছিল না; একান্ত অনুরাগ না জন্মিলে কেহ বাটী হইতে বাহির হইতে পারিত না। ভগবান্ দেবানন্দকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাণে ঐকান্তিকতা জাগিয়াছে, তাঁহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তিনি দেবাদিদেব ও অন্নপূর্ণার পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। এক তিল আর তাঁহার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই;—যেন এ সমস্ত কাঁটা ফুটিতেছে।

হিন্দুর মতে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহা শাস্ত্রের বচন; স্বামী যাহাতে আসক্ত, পতিব্রতা পত্নীর কি তাহাতে অনাসক্তি আসিতে পারে? তিনিও সমস্ত মায়া কাটাইয়া স্বামীর অনুগমনে উদ্যতা হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রদ্বয়কে সমস্ত কাজকর্ম্মের উপদেশ দিয়া তাঁহারা দেবারাধনায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিতে ভূস্বর্গ কাশী যাত্রা করিলেন। পিতামাতার নিকট কনিষ্ঠ পুত্রের মায়ার টান বড় বেশী:—রামেশ্বর বেশী উতলা হইলে, পাছে পিতামাতার কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এই জন্য তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেও, বাহ্যিক প্রফুল্লতা দেখাইতে লাগিলেন।

দেবানন্দ ও উমাকালী কনিষ্ঠপুত্রকে জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর করে সমর্পণ করিয়া, দাক্ষায়ণীকে সংসারের এবং অতিথি-সৎকারের ভারার্পণ করিয়া, অনুগত প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ শুভদিনে শুভ যাত্রা করিলেন। এতদিনে সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার অন্তরের একটা বোঝা নামিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় ছেলের চাতুরী।

বড় ছেলে সর্ব্বেশ্বরের মন গোড়া থেকেই ভাল নয়। তিনি কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না, কাহাকেও সাহায্য করিতে বা কাহারও অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে তিনি আদৌ ভাল বাসেন না। নিজের পরিবার এবং ছেলে দুইটি ভাল থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিলেই তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ এমনি ছোট, মন এমনি নীচ ভাবাপন্ন।

প্রমোদা তাঁহার প্রাণের প্রণয়িনী, তাঁহার বাক্য সর্ব্বেশ্বর জীবনে কখনও অবহেলা করেন নাই। পিতামাতার কথা, সহোদর ভ্রাতার কথা, পিসিমার কথা ববং ঠেলিতে পারা যায়, কিন্তু প্রণয়িণীর বাক্য লঙ্ঘন করা অতীব অন্যায় ও কাপুরুষের কার্য্য। সে আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া দিয়া অপর একজনকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে; তাহার কথা না রাখিলে ধর্ম্মসঙ্গত পাপ হইবে যে? পিতামাতার কাশী গমনের পর সর্ব্বেশ্বর এইরূপে নিজের মদগর্ব্বে কাজ করিতে লাগিলেন। মনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, পিতামাতার ভয়ে এত দিন তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কোন কাজ করিতে পারেন নাই—এইবার বাধাবিঘ্ন ঘুচিযাছে, বুড়াবুড়ি কাশী চলিয়া গিয়াছে—এইবার সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার দম্ভ দেখে কে? দুই তিন মাস যাইতে না যাইতেই দেবানন্দ ও উমাকালীর এত সাধের সাজান সংসার, ধর্ম্মভাবে উজ্জ্বলীকৃত এমন পবিত্র

ভবন বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হইয়া গেল, বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল। আত্মীয়স্বজন যাহারা এতদিন এ সংসারে গুরুর মত আদর পাইয়া আসিতেছিল, দেবানন্দ যাহাদিগকে পূজা-ভোগ দিয়া দেবতার মত সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, আশ্রিত বলিয়া যাহাদিগকে একটী দিনের জন্ত কোনও কথা বলেন নাই—পাছে তাঁহারা হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন—আজ কয়েক মাস মাত্র তাঁহারা এস্থান পরিত্যাগ করিতে না করিতেই তাঁহাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার, যেরূপ বচন-বাণ স্বামী-স্ত্রীতে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই পলাইতে পথ পাইতেছেন না, ইহারই মধ্যে অনেকে এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; সকলেই বলিতেছেন—এরূপ সুখ অপেক্ষা চির দুঃখ বরং প্রার্থনীয়। দেবানন্দ ও উমাকালীর পবিত্র বংশে এমন দুর্বৃত্ত পুত্র কেমন করিয়া জন্মিল?

রামেশ্বর দাদার ও বৌদিদির ব্যবহার দেখিয়া প্রথম প্রথম দুই একটি হিতকথা বলিয়া পিতামাতার কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কথা দাদা ও বৌদিদির ভাল লাগে নাই। তাঁহারা বলেন—তোমার যদি এত দয়ার শরীর, তাহা হইলে নিজের খরচে উহাদের প্রতিপালন করনা? পিতা কি এমন জমীদারীর আয় রাখিয়া গিয়াছেন যে এত গুলি লোক চিরজীবন বসিয়া খাইবে? পিতার বিদায় পত্রাদির আয় যথেষ্ট ছিল, তাহাতে তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন। এখন আর সে আয় নাই, তবে ঐ সকল নিষ্কর্ম্মা লোকের অন্ন হইবে কিসে? বিশেষতঃ আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ। ভগবান্ হাত-পা দিয়াছেন, বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়া মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন, পশুত' আর নয় যে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, খাটিয়া খাক্ না। পরের স্কন্ধে কতদিন আর এরূপ করিয়া চলিবে, যেরূপ দিন

কাল পড়িতেছে, তুমি তার কি জানিবে ভাই—আস্কে খাও ফোঁড়, গণনা ?

পিতার আত্মীয়-স্বজন ত' বিতাড়িত হইল কিন্তু শ্বশুরকুলের সম্পর্কে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছে, শাশুড়ী-শ্যালক-শালী প্রভৃতির কলরবে ভট্টাচার্য্য-সংসার আবার নূতন শ্রীধারণ করিয়াছে। প্রমোদা তাহাদের তুষ্টিসম্পাদন করিতে, তাহাদের সেবাযত্ন করিতেই ব্যস্ত—অপর সকলে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাক—তাহাতে প্রমোদার যায় আসে কি ? সংসারে পরিশ্রম করিবার কেহ নাই, কেবল দাক্ষায়ণী ও পুরাতন ঝি, সেই সদ্গোপের মেয়ে চঞ্চলা। চঞ্চলা বাস্তবিক চঞ্চলা, সে বহুদিন এ বাড়ীতে দাসীত্ব করিতেছে। দেবানন্দ ও উমাকালীর মত প্রভুর অধীনে তাই, নতুবা অন্য স্থান হইলে একদিনও তথায় থাকিতে পারিত না। সে যেমনি মুখরা—তেমনি চঞ্চলা। এখন পাছে বিতাড়িত হয়, তাই নূতন কর্ত্রীর মন যোগাইতে ব্যস্ত, অন্য কাজ করিবার সময় তাহার কোথায় ? কাজেই দাক্ষায়ণীকে এই বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধেই বহন করিতে হইতেছে। রামেশ্বর দাদার ও বৌদিদির বিচার ব্যভিচার দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইতে লাগিলেন—বড় ভাই পূজনীয় বলিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। দাদার শ্যালক মহিমচন্দ্র গণ্ডমূর্খ, এত বড মিন্সে কখন লেখাপডার ধার দিয়াও যায় নাই, মা সরস্বতীর সহিত তাহার চিরবিবাদ হইলেও পোষাক-পরিচ্ছদের বেশ আঁটা-আঁটী ভাব—সদাই বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত, যেন একটী ক্ষুদ্র নবাব। দিদি ছোট ভাইটীকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাহাকে আদর দিয়া ক্রমশঃ মাথায় তুলিতেছেন, সে এক সর্ব্বেশ্বরকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। মহিমচন্দ্র প্রণয়িণীর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া সর্ব্বেশ্বরও তাহাকে বেশী কিছু বলিতে সাহস করেন না, পাছে মানময়ীর মানের কিছু লাঘব হয়।

এখন শাশুড়ী সর্ব্বেশ্বরী কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, যাহা না করিবেন, কিছুতেই তাহা হইতে পারিবে না। অতিশয় দরিদ্র-গৃহের গৃহিণী কখন ত' এরূপ কাণ্ডকারখানা, এত অধিক আয়ের সংসার স্বচক্ষে দেখেন নাই, এরূপ আহারাদির ব্যবস্থা, এত দাস-দাসী লইয়া সংসার চালান, তাহার জীবনে ত' কখন হয় নাই; কাজেই এত বড় একটা সংসারের কর্ত্রী হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইলে তাহার মস্তিষ্ক ত' গরম হইয়া উঠিবেই, তাই প্রমোদার জননী ভবতারিণীর মেজাজ সদাই খিট্ খিটে, মন অহরহঃ রোষভারাক্রান্ত, সকলের নিকট এই-ভাব, কিন্তু কন্যা-জামাতা ও পুত্রের নিকট সদাই যোড়হস্ত।

দাক্ষায়ণী প্রত্যহ বেলা বারটা অবধি সংসারের কাজ করিয়া তারপর গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের-পূজা-ভোগের উদ্যোগ করিয়া দেন, রামেশ্বর স্বহস্তে পাক করিয়া দেবতার তুষ্টিসম্পাদন করেন। ভিন্ন গোত্রে দেবতার ভোজন হয় না বলিয়া দাক্ষায়ণীর দ্বারা এ কার্য্য হয় না। উমাকালী স্বহস্তে যাহা করিতেন, এখন রামেশ্বর তাহাই করেন, তদ্ব্যতীত গৃহের পূজা ও যজমানের কার্য্য সমস্তই তাঁহাকে করিতে হয়। দাক্ষায়ণী সংসারের কাজ করিয়া পরে অতিথিশালায় যে কয়টী অতিথি অবস্থান করেন, তাহাদের পাকাদির যোগাড়, কেহ অশক্ত হইলে স্বহস্তে তাহাদের রন্ধন করিয়া দিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া অপরাহ্নে রামেশ্বরের সহিত আহারাদি করেন; ব্রাহ্মণের বিধবা—রাত্রে কোন দিন কিছু জলযোগ করেন, কোন দিন করেন না। রামেশ্বর ঠাকুরের শীতলের দ্রব্যাদি প্রসাদ পাইয়া রজনী যাপন করেন। তাহাদের কিরূপ হইতেছে, তাহারা খাইতে পাইতেছে কি না, সুখে কি দুঃখে আছে, বড় দাদা ও বৌদিদি তাহার কিছুমাত্র সংবাদ গ্রহণ করেন না।

রামেশ্বর তাহার জন্য দুঃখিত নহেন, কারণ তিনি ত' দাদার মুখাপেক্ষী

নহেন? হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ আছে, দেবতার আশীর্ব্বাদে শরীর সুস্থ ও সবল, শাস্ত্রপাঠে সদাই প্রাণে আনন্দ, তবে দাদা ও বৌদিদির কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে কেন? তিনি আহারাদির পর সময় পাইলে অতিথিশালায় যে কয়জন অতিথি থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত অবশিষ্ট সময় ধর্ম্মালোচনায় কাটাইয়া দিতেন,সংসারের কোন কথায় থাকিতেন না, পাছে কোনরূপ গর্হিতাচরণ দেখিলে কোন কথা বলিয়া ফেলিতে হয়, তাহার দরুণ পাছে দাদা ও বৌদিদির মনে কোন কষ্ট হয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে কয়েকখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত একতালা গৃহ আর বাহির দিকে কয়েকখানি মাটীর ঘর, বড় একখানি আটচালায় অতিথিগণের থাকিবার স্থান, পার্শ্বে ভোগের গৃহ, তাহার পার্শ্বে লক্ষ্মী নারায়ণের একটী ক্ষুদ্র মন্দির। তখনকার দিনে খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হইলে এরূপ বাসভবন পল্লীগ্রামে কাহারও থাকে না। বড় দাদা ও বৌদিদি পুত্র-কন্যা লইয়া অন্দরের ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করেন, আর দেবানন্দ ও উমাকালী বাহিরের যে দুইটী ঘরে থাকিতেন, রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণী তাহাতেই অবস্থান করেন। অন্দরের পাকশালা একটী স্বতন্ত্র গৃহ, তাহাও সুবৃহৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র ভবানী-প্রসাদ ও কন্যা হেমলতা, কাকা ও ঠাকুরমার বড়ই অনুরক্ত, তাহারা সর্ব্বদাই রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণীর নিকট থাকে। মা, মামা ও দিদিমা ডাকিলেও যায় না, তবে পিতা আসিয়া যখন ডাকেন, তখন ক্ষুদ্র বালক ও বালিকাটী বাবা কলিকাতা হইতে বোধ হয় কোন নূতন খাবার দ্রব্য আনিয়াছেন, এই লোভে পিতার সাড়া পাইবামাত্র ছুটিয়া যাইত, যাহা হয় কিছু নূতন জিনিষ পাইত, লইয়া আবার ভবানী কাকার কাছে, হেমলতা ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খেলা করিত—বাড়ীর ঐ সকল অলক্ষ্মণের সঙ্গ তাহাদের ভাল লাগিত না।

শক্তি-সাধনা।

বংশের দুলাল ভবানীকে রামেশ্বর প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন, খাওয়ার সময় সে পাতে না বসিলে তাঁহার খাওয়া হইত না। বালকের হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ, তাহার কে আপনার আর কে পর, সে ভালবাসার ভিতর দিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল, তাহার ভবানী কাকাকে না দেখিলে, তাহার কাছে প্রত্যহ বৈকালে প্রথমভাগের সেই 'কর-খল' মুখস্থ না করিলে তাহার মন ভাল থাকিত না, পড়ার আগ্রহ বাড়িত না। কাকাও তাহাকে খাওয়াইয়া বুকে করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন, তারপর তাহাকে পড়া শিখাইতেন। বংশাবলীর সকলের নাম, গাঁই-গোত্র কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন, বালক তোতাপাখীর মত অল্পদিনের মধ্যে তাহা এত কণ্ঠস্থ করিয়াছিল যে আজকাল এম-এ উপাধিধারী যুবকও তাহা পারে না। কারণ আজকাল এ সব শিক্ষা, নিজের বংশাবলীর ইতিহাস আর কেহ কণ্ঠস্থ করে না, তাহার স্থানে ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহাদের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে, বাঙ্গালী আজ ঘর ছাড়িয়া পরের হইয়াছে।

হেমলতা কাকার কাছে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর গল্প শুনিয়া তারপর দাক্ষায়ণীর কাছে গৃহকর্ম্ম শিখিতে যাইত। সে বালিকা হইলেও এই সকল যে অবশ্যকরণীয় তাহা এখন হইতেই তাহার অন্তরফলকে অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রমোদা একমাত্র বধূ, বড় আদরের হইলেও শাশুড়ীর সহিত কখনও এ সকল কার্য্যে এমন করিয়া যোগ দেন নাই। দরিদ্রের কন্যা হইলেও ধনবানের পুত্রবধূ হইয়া তিনি অহঙ্কারেই মাতিয়া থাকিতেন—হাবভাবেই দিন কাটাইতেন, তাহার পর যেটুকু সময় পাইতেন, অতি সন্তর্পণে আসিয়া এক একদিন শাশুড়ীর সহিত গৃহকর্ম্মে যোগ দিতেন এবং যতদূর সম্ভব উমাকালী তাহাকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু শিক্ষায় যাহার মনস্থির হয় না, সে কতক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে? অমনোযোগী হইলে উমাকালী নিজের কর্ম্ম

পঙ্গু হইবে ভাবিয়া বধূমাতাকে নিজের গৃহকর্ম্মে যাইতে বলিতেন, প্রমোদা চলিয়া আসিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিত। উমাকালী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সংসার-কার্য্যে সুনিপুণা করিতে পারেন নাই।

এখন শাশুড়ী নাই, প্রমোদাই এখন কর্ত্রী, সকলেই তাহার ভয়ে জড়সড়। রামেশ্বর বড় দাদা ও বৌদিদিকে দেবতার মত মান্য করেন, তাঁহাদের কোন কাজের প্রতিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস নহে, তাই তাঁহারা যাহা করেন, অপ্রতিহত-প্রভাবে তাহা সমাহিত হয়। এমন সাধু-প্রকৃতি ছোট ভ্রাতার উপরও সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা সন্তুষ্ট নহেন। সদাই খিট্ খিট্ করিয়া থাকেন, বলেন—ধর্ম্মকর্ম্মে ঐরূপ ভাবে সমস্ত দিন কাটাইলে চলিবে না, উপায়-উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইবে, বসিয়া খাওয়া আর কতকাল চলিবে?

জমীদারীর প্রজাগণ কর্ত্তা মহাশয়ের আমলে বেশ সুখে ছিল, এক দিনের জন্য উৎপীড়িত হয় নাই। এখন নূতন জমীদারের হস্তে পড়িয়া তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বর হুকুম দিয়াছেন প্রজার কিছু থাক আর নাই থাক, তাঁহারা খাইতে পাক আর নাই পাক; জমীদারের খাজনা পূর্ব্বের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে না। কর্ত্তার সময় অন্যরূপ আয় ছিল, তাই তিনি খাজনা ফেলিয়া রাখিতেন, আমার সময় তাহা হইবে না। গোমস্তা মহাশয়কে কড়া হুকুম দিয়াছেন—যে প্রজা খাজনা না দিবে, তাহার নামে বাকী খাজনার নালিশ কর, তাহার হাল-গরু বেচিয়া টাকা উসুল কর। জমীদারের গোমস্তা ত' এক একটি যমের দূত, উৎপীড়ন ত' তাহারা কথায় কথায় করিয়া থাকে, তাহার উপর জমীদার কর্ত্তৃক যদি উৎসাহিত হয়—তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? গোমস্তা তড়িৎ ঘোষ এখন উৎপীড়নের চরম দেখাইতে লাগিল, দরিদ্র প্রজাগণের নামে নালিশ, তাহার পর টাকা আদায়ের

সময় তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, মানুষের হৃদয় লইয়া কেহ সেরূপ করিতে পারে না।

প্রজাগণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। তাহারা প্রথমে বড় বাবুর কাছে আসিয়া নালিশ করিল, কত কান্নাকাটি করিল, পাষাণ-হৃদয় সর্ব্বেশ্বর সে কথায় কাণ দিলেন না, প্রজার সে দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল না। তারপর তাহারা ছোট বাবু রামেশ্বরকে করযোড়ে সমস্ত নিবেদন করিল; কোমল হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ রামেশ্বর প্রজাগণের দুঃখে গলিয়া গেলেন, তিনি দাদার কাছে তাহাদের জন্য অনেক করিয়া অনুনয়-বিনয় করিলেন। তাহাতে প্রজার পক্ষে কোনও ফল ত' ফলিলই না—পরন্তু তাঁহার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইল। তিনি শুনিলেন—বসিয়া বসিয়া খাইতেছ, কোন খোঁজ ত' রাখ না, প্রজারা খাজনা না দেওয়ায় জমাদারী দেনা হইয়া পড়িয়াছে, এইবার দেনার দায়ে যখন বাস্তু পর্য্যন্ত টান পড়িবে, তখন থাকিবে কোথায়? তথাপি রামেশ্বর বলিল—দাদা! উহাদের পীড়ন করিলেই কি খাজনা আদায় হইবে, না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? উৎপীড়ন না করিয়া বরং ভাল কথায় কাজ ভাল হয়।

তোমাকে আর সে পরামর্শ দিতে হইবে না, আমি তোমার অপেক্ষা বেশী বুঝি, যখন দেনার দায়ে ঘর বাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইবে—করুণার ছড়া তখন কোথায় থাকিবে বুঝিতে পারিবে। বৃথা অগ্রজের সহিত বচসা করিয়া মস্তিষ্ক গরম করা ভাল নহে, দাদা অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝেন; তিনি প্রজাগণকে অন্যরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। সেদিন বৌদিদির নিকটও তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হইল। মহিমচন্দ্র ভগ্নীপতির ও ভগ্নার আস্কারায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেও সেদিন রামেশ্বরকে দুই এক কথা বলিতে লাগিল। রামেশ্বরের

তাহা সহ্য হইল না, যাহার খায় তাহারই সহিত এইরূপ ব্যবহার। রামেশ্বরও সেদিন বেশ দুই কথা তাহাকে কড়া করিয়া শুনাইয়া দিলেন। তাহাতেই প্রমোদা একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—ইহার একটা প্রতিকার না করিলে চলিবে না, মহিম কি উহার খায় না পরে, যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমার ভাইকে গালি দেওয়া? সর্ব্বেশ্বর আসিলে প্রমোদা সেই সকল কথা নানা প্রকারে রসান দিয়া স্বামীর কর্ণে ঢালিয়া দিল। সর্ব্বেশ্বর আরও দুই একদিন এইরূপ কত অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়াও কিছু বলেন নাই, আজ আর রাগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ছোট ভাইকে ডাকিয়া যাহা ইচ্ছা হইল—তাহাই বলিলেন। আরও বলিলেন—রামেশ্বর ঐরূপ করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া আর সকলের সঙ্গে ঝগড়া করা—হইবে না, উপায়ের চেষ্টা দেখ, যজমান চরাইয়া আর কতদিন চলিবে? ওদিকে জমীদারীর দুই হাজার টাকা দেনা হইয়াছে—অর্দ্ধেক তোমাকে দিতে হইবে, নতুবা উহা বিক্রয় হইয়া যাইবে। অতিথিশালা বন্ধ করিয়া দাও, আমি উহার বৃথা খরচ আর বহন করিব না, কতকগুলা অকর্ম্মাকে আর অমন করিয়া প্রশ্রয় দিব না।

রামেশ্বর মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—দাদা! আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছেন কেন? মহিম আমাকে সময়ে সময়ে অনেক সম্বন্ধ ছাড়া কথা শুনাইয়া দেয়, কোন দোষ না থাকিলেও আপনার ও বৌদিদির তিরস্কার শুনিতে পারি কিন্তু মহিমের অযথা কথা কি শুনিতে পারা যায়? এজন্য অনেক সহ্য করিয়া আজ দুইচার কথা বলিয়াছি। ইহাতে আপনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন কেন? জমীদারীর দুই হাজার টাকা দেনা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে হইবে বলিতেছেন, আমি অত টাকা কোথায় পাইব ভাই! যদি জমিদারী রাখিতে না পারেন, বিক্রয় করিয়া ফেলুন—আমার কিছুমাত্র আপত্তি

নাই। অতিথিশালা তুলিয়া দিতে পারিব না; পিতার অমন একটা মহৎকীর্ত্তি জীবিত থাকিতে তোলা হইবে না। তবে আপনি যদি উহার ভার না লয়েন—আমি যজমানের কাছে ভিক্ষা করিয়া উহা চালাইব। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—জমিদারী বিক্রয়ে তবে তোমার মত আছে ?

রামেশ্বর—যদি ক্রমশঃ দেনা হয়, তাহা হইলে অমত করিয়া কি করিব ?

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—আচ্ছা তাহাই হইবে ; অতঃপর অতিথিশালার খরচ আমি আর দিব না, তুমি উহা যেরূপে পার চালাও। সর্ব্বেশ্বর রাগে মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরও সন্ধ্যার আলো জ্বালিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোমালিন্য।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এ জগতে দুই প্রকারেই নাম বজায় রাখিতে পারা যায়—ভাল কাজেও নাম থাকে, মন্দ কাজেও নাম থাকে। তবে ভাল কাজে যে নাম রাখিয়া যায়, তাহার স্মৃতি আজীবন লোকে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রীতিচন্দনে পূজা করিয়া থাকে, সেই মহৎ আদর্শ তাহাদের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেয়। আর মন্দ কাজে যাহার কীর্ত্তি বজায় থাকে, নাম জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, রসনায় লোকে তাহার নাম উচ্চারণ করে বটে—তবে ঘৃণার সহিত; এবং সে আদর্শ যতই জগৎ হইতে লোপ পায়, তাহার চেষ্টা করে। পুত্র-কন্যাকে তাহার আদর্শ অনুকরণ করিতে নিষেধ করে।

দেবীপুরে দেবানন্দ যে সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের আপদে বিপদে ঠিক আপনার মত যেরূপ সাহায্য করিতেন, তাহা জীবনে কেহ ভুলিতে পারিবে না। চিরদিন তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সেই অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার জনে জনে ঘোষণা করিবে, সেই দেবোপম ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি চিরকাল গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাগণ হৃদয়মন্দিরে রাখিয়া দেবতার মত পূজা করিবে, পুত্রকন্যাগণকে সেই পবিত্র দেব-দম্পতির আদর্শ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিবে। আর তাঁহারই পুত্র

হইয়া সর্ব্বেশ্বর যে কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, যেরূপ অন্যায় আচরণে অভ্যস্ত হইয়া টাকার বলে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহাও লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে না, তবে পূজার পরিবর্ত্তে তাহার নাম করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, টাকার ভয়ে প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনে অজস্র গালি দিবে এবং তাহার আদর্শ কোনও প্রকারে পুত্রকন্যার হৃদয়ে বদ্ধমূল না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। সংকীর্ত্তি ও অসংকীর্ত্তিতে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

সর্ব্বেশ্বর এখন অতুল ধনের অধীশ্বর—টাকার অহঙ্কারে তিনি এখন ধরাকে সরার মত দেখিতেছেন, টাকার জন্য কোন কুকর্ম্ম করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। দেবীপুরবাসী তাহার অত্যাচারে দিন দিন বড়ই উৎপীড়িত হইতে লাগিল, সকলেই বলিতে লাগিল—এমন দেবকল্প ব্রাহ্মণের বংশে এমন কুলাঙ্গার পুত্র কেন জন্মাইল? প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের কোনও প্রকার ক্ষমতা দেখান চলে না, ক্ষমতা দেখাইতে গেলেই হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে, টাকার বলে শেষে প্রবলেরই জয়জয়কার হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনীর উৎপীড়ন, ইহা কলিকালেরই বিশেষবিধি। কোন প্রকারে নিস্তার পাইবার উপায় নাই! তবে যদি দরিদ্রের বন্ধু, বিশ্বের নিয়ন্তা ভগবান্ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি সদয় হইয়া যদি দুরাত্মা জমীদারের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন—তবে রক্ষা, নতুবা আর উপায় নাই। সকলে অনন্যোপায় হইয়া ঊর্দ্ধমুখে বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্‌কে সর্ব্বেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহাদের আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

মানুষের যখন সময় ভাল হয়, তখন বুঝি কোনরূপ বাধাবিপত্তি—কোনরূপ আপদ্-বিপদ্ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই সর্ব্বেশ্বর প্রজাবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের এত অভিশাপ, এত মনঃক্ষুণ্ণের মধ্যেও

আপনার অপ্রতিহত প্রভাব অচলঅটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন, একপদও টলিয়া পড়িলেন না, বা কিরূপ পিতার পুত্র হইয়া কিরূপ ভাবে লোকের সহিত ব্যবহার করিতেছি, তাহা একদিনের জন্য চিন্তাও করিলেন না, অবাধে পাপসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর রামেশ্বর ভ্রাতার ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। কাশীতে পিতামাতাকে এ সকল বিষয় জানান কর্ত্তব্য কিনা বিবেচনা করিলেন, তারপর মনে মনে বলিলেন—পিতামাতা এখন উপযুক্ত পুত্রের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; ধর্ম্মে-কর্ম্মে চিত্ত স্থির করিয়া জীবনে শান্তি অনুভব করিতেছেন। এ সময় তাঁহাদিগকে আবার সংসার চিন্তায় ফেলিয় পরকাল চিন্তার পথ রুদ্ধ করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। দাদার এ সকল অত্যাচার শুনিলেই তাঁহাদের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিবে, হয়ত' তাঁহাদের শান্তির বদলে প্রাণে বিষম অশান্তির উদয় হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় বাধা প্রদান করিবে। অতএব এখন আর এ সকল বিষয় তাঁহাদের কর্ণগোচর করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যে যেমন কাজ করিবে, কিছুদিন পরে সেই তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করিবে, তাহার জন্য আর বিব্রত হইলে চলিবে কেন? যখন এত বুঝাইয়া, এত মিনতি করিয়াও তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলাম না, তখন ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তিনি মানবকে ধ্বংসের দিকে লইয়া গেলে, কাহার সাধ্য তাহাকে ফিরাইয়া আনে? রামেশ্বর ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এখন আর তাঁহার সহিত দাদার তত সদ্ভাব নাই যে, কোনও সদ্‌যুক্তি দিলে তিনি শুনিবেন বা সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন। এখন মহিমচন্দ্রই যে তাঁহার পরামর্শদাতা, তাহারই পরামর্শে যে দাদা এখন উঠেন-বসেন, অপরের সৎপরামর্শ এখন তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে না।

বাহিরে প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার ত' হইতেছেই, এমন দিন নাই, যে দিন একটা না একটা প্রজার হাহাকার রামেশ্বরের কর্ণে না পৌছে। তাহার উপর তাহার বিষয়-আশয় ফাঁকি দিয়া নিজের করিয়া লইবার জল্পনা-কল্পনাও ভগ্নিপতি ও শ্যালকের মধ্যে প্রত্যহ চিন্তিত হইতেছে। অমন লাভের জমীদারী, অমন নিরীহ প্রজা, কোথায় তাহার ঋণ, আর কোথাই বা তাহার অনাদায়, তথাপি প্রজার নামে দোষ দিয়া তাহাদের উৎপীড়ন করিয়া, ছোট ভাইকে ফাঁকি দিবার জন্য এতটা চক্রান্ত চলিতেছে।

রামেশ্বর ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাঁহার কোনও প্রকার অবিশ্বাস নাই। বড় দাদা গুরু, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস রামেশ্বর ভুলেও মনে স্থান দিতে পারেন না। এই জন্য জমীদারী বিক্রয় হইয়া গেল, রামেশ্বর বুঝিলেন—নিশ্চয়ই দেনা হইয়া থাকিবে, নতুবা জমীদারী কে ইচ্ছা করিয়া বিক্রয় করে? সরলহৃদয় রামেশ্বর ত' জানেন না যে তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিয়া প্রকারান্তরে সর্ব্বেশ্বর বিনামী করিয়া অন্য সম্পত্তি কিনিলেন। সরল চিত্তে এ পাপচিন্তা একদিনের জন্যও উদয় হইল না।

রামেশ্বর এখন অতিথিশালার সমস্ত ভার নিজেই বহন করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। পিতার যজমানবর্গ যখন শুনিলেন যে তাহাদের গুরুর কীর্ত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বেশ্বর নষ্ট করিতেছেন এবং তজ্জন্য রামেশ্বর বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তখন তাহারা সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামেশ্বরকে উহা বজায় রাখিতে উৎসাহিত করিলেন। রামেশ্বর এখন তাহাদের পরামর্শ মত কাজ করিয়া অতিথিশালাটীকে একপ্রকার বজায় রাখিয়াছেন; দাদার নিকট এ বিষয়ের এক কপর্দ্দক সাহায্য গ্রহণ করেন না। দিবসের

অর্দ্ধেক সময় শিষ্য-যজমানের কাজ করিয়া, নিজের পূজা, আহ্নিক ও দেব-সেবাতেই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তার পর অতিথি-শালার অভাব অভিযোগ মিটাইতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। এ সকল বিষয়ে আর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করে না, কেবল পিসিমা দাক্ষায়ণী তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়, তিনি একমাত্র রামেশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া এতদিন দাদার কীর্ত্তি কিছুতেই নষ্ট হইতে দেন নাই। এ জন্য বাটীর সকলেই তাঁহার প্রতি সময়ে সময়ে অতিশয় কোপ প্রকাশ করেন, কিন্তু দাক্ষায়ণী তাহাদের সে সকল কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না।

অতিথিশালা কোন দিন অতিথিশূন্য থাকে না, দুইচারি জন অতিথি তথায় প্রায়ই অবস্থান করে। দেবানন্দের ভাগ্য এরূপ সুপ্রসন্ন, অনেক সিদ্ধ সাধকও দেবানন্দের অতিথিশালার নাম শুনিয়া, ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের পদার্পণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবন যে অতিশয় পবিত্র, ইহার রেণু যে স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাহা দেবানন্দ জানিতেন, আর জানেন তাঁহার প্রিয় পুত্র ধার্ম্মিক রামেশ্বর। তাই তিনি বুক দিয়া এই সকল মহাত্মাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। এ সকল মহাত্মার অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করা, তাহাদের সঙ্গলাভে চরিতার্থ হওয়া কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? সর্ব্বেশ্বর তাহা বুঝিতেন না, তাই তিনি ইহার ত্রিসীমানায় আসিতেন না—ঐ সকল সর্ব্বত্যাগী মহাত্মাগণের মলিন বেশভূষা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন।

দাক্ষায়ণীকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হয়; এরূপ অত্যধিক পরিশ্রম একজন স্ত্রীলোকে কখনও করিতে পারে না। যদিও চঞ্চলা সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করে কিন্তু তাহার সাহায্য বাহিরের, শূদ্রের মেয়ের দ্বারা ত' অন্য কাজ হয় না, কাজেই দাক্ষায়ণীকে একহাতে সাতযোল ধরিতে

হইত। রান্না করা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবেশন পর্য্যন্ত। বেলা বারটা অবধি এই কাজ করিয়া দেবতা ও অতিথি সেবার কাজে ব্যাপৃত হওয়া কতদূর কষ্টকর, তাহা যে করে সেই জানে। দাক্ষায়ণী তখনকার ধার্ম্মিকা ব্রাহ্মণের বিধবা তাই, এখনকার হইলে যে কি হইত—তাহা বলা যায় না।

রামেশ্বর পিসীমাতার এরূপ অত্যধিক পরিশ্রম দেখিয়া এক একদিন বড়ই কাতর হইতেন, পাছে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, পাছে তিনি কোনরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু শুধু দুঃখ প্রকাশ করিলে কি হইবে, সংসারে কাজকর্ম্ম করিবার লোক ত' আর কেহ নাই? ব্রাহ্মণের ঘরের ব্রহ্মচারিণী কর্ম্মকুশলা দাক্ষায়ণী বাল্যকাল হইতে এ সংসারে না থাকিলে, ভট্টাচার্য্যের সংসার এতদিন ছারখারে যাইত। রামেশ্বর পিসীমাতাকে পরিশ্রম একটু কম করিতে বলিলে তিনি বলিতেন—পরিশ্রম করিয়া সকলকে খাওয়ানইত' আমাদের কর্ম্ম, ইহাতে আমার তত কষ্ট হয় না বাবা! তবে তুমি একটী বিবাহ কর না, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়; নতুবা এইরূপ করিয়াই দিন কাটাইতে হইবে—আমার ভাগ্য বুঝি আর ফিরিবে না, দাক্ষায়ণী বড় মনঃকষ্টে সময়ে সময়ে রামেশ্বরকে এইরূপ কথা বলিতেন। স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া রামেশ্বর বিবাহ করিতে নারাজ। এই জন্য দাক্ষায়ণী বলিতেন—বাবা! তুমি প্রমোদাকে দেখিয়া হতাশ হইয়াছ, কিন্তু ঐরূপ স্ত্রীলোক কি সকলেই, তাহা হইলে কি হিন্দুর সংসার কখনও চলিতে পারিত? দাক্ষায়ণী কখন নিজের অহঙ্কার মুখে প্রকাশ করিতেন না বরং বিধবা অবস্থায় অনবরত খাটিয়া খুটিয়া শরীরে শান্তি অনুভব করিতেন। হিন্দুগৃহের গৃহকর্ত্রি মা ব্রহ্মচারিণি! তোমার পদে কোটী কোটী নমস্কার, তোমাদের এ পবিত্র হস্তের শীতল

স্পর্শ না থাকিলে, তোমাদের পরম রমণীয় সুশৃঙ্খলা আবদ্ধ না হইলে কি হিন্দুর সংসার এত পবিত্র, এত সুখের আস্পদ হইত।

পিসীমার কথায়, প্রতিদিন তাঁহার উত্তেজনায় রামেশ্বরের চিত্ত সময়ে সময়ে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইত, আবার কোন কোন দিন মুখরা প্রমোদার দাদার প্রতি ভৎর্সনা শুনিলে, তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলে, বিবাহে এমন বিরক্তি আসিত যে প্রাণান্তে আর তাহা করিতে ইচ্ছা যাইত না।

অতিথিশালা এখন বেশ চলিতেছে, দাদার সাহায্য না পাইলেও আর কোন প্রকার অনাটন হইতেছে না। তাঁহার পিতার এক জন শিষ্য-পুত্র সংস্কৃত শিক্ষার মানসে তাঁহার নিকট শিক্ষিত হইতে আসিয়াছেন। রামেশ্বর তাহাকে ছাত্ররূপে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি প্রভৃতি শিক্ষা দেন। দেবতা ও অতিথি সংকারে পিসীমার সাহায্য জন্য গ্রামের একটী প্রবীণা ব্রাহ্মণী স্ব-ইচ্ছায় আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের আত্মীয় স্বগোত্রীয়, কাজেই এখন এ সকল কাজ বেশ ভাল চলিতেছে। কিন্তু দাদার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে, সকলেই সর্ব্বেশ্বরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহাকে মনে মনে কত তিরস্কার করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেবানন্দের অপবাদ যে রটিতেছে না তাহাও নহে। পিতাপুত্র যে এক, একজনকে টানিয়া ধরিলে প্রকারান্তরে আর একজনের উপরও যে টান পড়ে, কান টানিলে মাথা যে আপনি নমিত হইয়া আসে!

দেখিয়া শুনিয়া রামেশ্বরের আর দেশে থাকিতে প্রাণ চায় না। কোন প্রকারে দেশত্যাগী হইয়া বংশের এ কলঙ্ক শ্রবণ হইতে রক্ষা পাওয়াই শ্রেয়ঃ। বড় ভাইয়ের দুর্নাম, পূজনীয় পিতার বৃথা নিন্দা, সৎপুত্রে কে কবে শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিয়াছে? অকারণ হইলে

তিনি তাহাদের জিহ্বা টানিয়া বাহির করিতেন কিন্তু দাদা যে ইহার মূল, তাহাদের দোষ কি—মানুষ আর কত সহ্য করিবে ?

দিন দিন বড়ই অসহ্য হইলে রামেশ্বর একদিন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অন্য সময় হইলে যাইতে পারিতেন না, কারণ দেবসেবা ও অতিথিসেবা তাহার গলায় রহিয়াছে কিন্তু তিনি না থাকিলেও এখন উহা অচল হইবে না—সমভাবেই চলিয়া যাইবে দেখিয়া তাহার কিছু দিনের জন্য গৃহত্যাগী হইবার ইচ্ছা হইল। ইহা সংসার-বৈরাগ্য নহে, প্রতিদিন বংশের দুর্নাম শুনা তাহার পক্ষে অসহ্য, তাই স্থান ত্যাগ করিয়া কিছু কম পড়িলে আবার আসিবেন—ইহাই মনের বাসনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহিমের মহিমা।

শরৎ কাল—আকাশ বর্ষার মেঘ-মলিনতা ধৌত করিয়া সুশুভ্র শরচ্চন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া হাসিতেছিল। তখনও রজনীর ঘোর পৃথিবীতল পরিত্যাগ করে নাই, আকাশের গায়ে তখনও নিদ্রালস চন্দ্রমা দুই একটী তারকা সহ বিরাজ করিতেছিল; রাত্রিচর জন্তুগণ তখনও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। নিশার শীতল বাতাস তখনও ঊষার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে নীরব পল্লীর গৃহ-প্রাঙ্গণ, বন-উপবন স্নিগ্ধ করিতেছিল।

শারদীয়া পূজার আর বেশী বিলম্ব নাই। যাঁহাদের কৃতার্থ করিতে মা আসিতেছেন—যাঁহাদের বাড়ীতে দেবীর আবাহন হইবে—তাঁহারা এখন হইতেই প্রতিমাগঠন, মণ্ডপ সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। দেবীপুরে দেবানন্দের বাটীতে মাতৃপূজার খুব আড়ম্বর হইত। অন্নপূর্ণাকে গৃহে বসাইয়া তিনি এই কয়দিন অকাতরে সকলকে অন্নদান করিতেন, বহুদূর হইতে দুঃস্থ পল্লীবাসী তাঁহার গৃহে ভগবতীর প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। দেবানন্দ ও উমাকালী ৺বারাণসী ধামে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার শরণাগত হইয়াছেন, কাজেই বাটীতে সে উৎসব, শারদীয়া পূজার সে মহতী ঘটা আর নাই। কর্ত্তা গিন্নীর তীর্থবাসের পর হইতেই তাহা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে- তবে পূজাটা একে-

বারে বন্ধ হয় নাই, লোক-দেখান রূপে এখনও তাহা সমাহিত হইয়া থাকে। সর্ব্বেশ্বর এই পূজা-উপলক্ষে গৃহিণীর সোণার গহনা, পুত্রকন্যার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহাদি সংস্কারে বহু টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এসকল খরচ পূজার খাতেই হিসাব করিয়া লওয়া হয়—লোক জন যত খাওয়ান হউক আর নাই হউক, এখন তামসিক ভাবে অর্থব্যয় বিলক্ষণ হইয়া থাকে।

এবার দুই ভাইয়ে তাদৃশ মিল নাই,—তাই পূজার ঘটাও তত হইবে না, তবে রামেশ্বর বলিয়াছেন—দাদা! পূজাটী বন্ধ করিবেন না, পিতা-মাতার কীর্ত্তি-কলাপ নষ্ট করা ক্ষমতাবান্ পুত্রের উচিত নয়। তুমি ত' ভগবানের কৃপায় কিছু উপার্জ্জন করিতেছ—বৎসরে এই খরচটি আর চালাইতে পার না? আমি ত' ভাই, তোমার নিকট আর কিছু চাই না, দেবসেবা ও অতিথিসেবা ত' আমি একপ্রকার চালাইয়া লইতেছি? সর্ব্বেশ্বর সে কথায় কাণ দিতেন না—যে রোজগার করিতে পারে না, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া অফিসে যাইতে পারে না—সে আবার মানুষ কিসের? সর্ব্বেশ্বর পূজার জন্য কনিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিলেন না; তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী মহিমচন্দ্রের উপরই এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন—আর সহকারী করিয়াছেন—বাড়ীর পুরাতন গোমস্তা তড়িৎ ঘোষকে। মার পেটের ভাই অমন সুন্দর সচ্চরিত্র. ধার্ম্মিক-প্রকৃতি রামেশ্বরের সহিত কোনও কথা বার্ত্তা হইল না, রামেশ্বর সে জন্য দুঃখিতও নহেন। তিনি বুঝেন—আমার সহিত সদ্ভাব থাক আর নাই থাক ভগবান্ আমাকে একপ্রকার চালাইয়া লইবেনই। দাদার কাচ্ছা-বাচ্ছা অনেকগুলি—খরচও যথেষ্ট, কোন প্রকারে বংশের কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারিলেই হইল। বাবার নাম হইলে কি দাদার নাম হইবে না বা দাদার নাম হইলে কি আমার নাম হইবে না? রামেশ্বর এমনি সরল প্রকৃতির লোক।

দাক্ষায়ণী জানিতে পারিয়াছেন—রামেশ্বর দুই চার দিনের মধ্যেই গৃহ ত্যাগ করিবেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা! এই পূজার সময় সকলে বিদেশ হইতে দেশে আসে—আর তুই বাবা! দেশ থেকে চলে যাবি—তুই চলে গেলে আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না। রামেশ্বর বলিলেন—পিসীমা! আমি কিছু দিনের জন্য দেশ-ভ্রমণে যাইব—শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে, শরীর একটু ভাল হইলেই চলিয়া আসিব। শরীর খারাপ হইয়াছে বলিলে স্নেহশীলগণের নিকট সকল বিষয়েই অব্যাহতি পাওয়া যায়—এই জন্য পিসীমা আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু রামেশ্বরের ন্যায় ধার্ম্মিকের শরীর কখন খারাপ হইতে পারে না। পূজার সময় নানা প্রকার হট্টগোল হইবে—কেহ খাইতে পাইবে, কেহ পাইবে না, কত লোক কত নির্য্যাতন ভোগ করিবে—তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা এস্থান ত্যাগ করাই ভাল; এই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাইতেছেন—অন্য কোনও কারণ নাই বলিয়া পিসীমাতাকে বুঝাইয়া দিলেন। সেজন্য দাক্ষায়ণীও আর কোন কথা কহিলেন না।

শরতে দেবানন্দের বাটীতে শিবদুর্গার, আর বসন্তে বাসন্তী দুর্গাদেবীর আরাধনা হইত। প্রতিমা সেইরূপই প্রস্তুত হইতেছে। এবার প্রতিমা প্রস্তুতকারক কুম্ভকার পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রতিমা গড়িতে বড়ই বিলম্ব হইয়াছে। দেবানন্দের সময় কত লোক এই প্রতিমা গড়িবার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতে উমেদারী করিত—কিন্তু গত বৎসর কুমারের টাকার গোলমাল করায় আর কোন মিস্ত্রী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে আসে নাই—সকলেই জানে, টাকা সহজে আদায় হইবে না, বড় লোকের বাড়ী পরিশ্রম করিয়া শেষে কি গর্দ্দানা লাভ করিয়া ফিরিতে হইবে? যে সকল কুমার বাবুর প্রকৃতি জানিত—তাহারা আসে নাই। একজন নূতন

লোক এবার প্রতিমা গড়িতেছে—মায় সাজ তাহার সহিত চল্লিশ টাকা চুক্তি হইয়াছে। মহিমের ঐ টাকা ফাঁকি দিয়া দিদির নিকট বাহাদুরী লইবার চেষ্টা। তজ্জন্য মহিমচন্দ্র মাঝে মাঝে ইহার তত্ত্বাবধান করেন। সর্ব্বেশ্বর একদিনও প্রতিমার বিষয়ে কোন সংবাদ লয়েন নাই, গঠন-প্রণালী কিরূপ হইতেছে—তাহা স্বচক্ষে দর্শনও করেন নাই, মহিমচন্দ্রই সমস্ত দেখিতেছেন। পূজার সময় তিনি অফিসের মহাজন-মহলে পূজার পার্ব্বণী আদায়ের জন্যই ব্যস্ত, আর এখন যে সম্পত্তিটুকু আছে, তড়িৎ ঘোষ তাহার আদায় উশুল করিতেই প্রাণপণ করিতেছে, এদিকে যা করেন—বাবু মহিমচন্দ্র। বাড়ী-ঘর মেরামত হইতেছে, স্ত্রীপুত্রদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ নূতন রকমের তৈয়ারী হইতেছে। সকলের সকল হইতেছে—হইতেছে না কেবল রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণীর; তাঁহাদের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহেন না; সংসারে প্রাণপণে কেবল খাটিয়া যাও, ত্রুটী হইলে বরং দুকথা শুনাইয়া দিবার লোক আছে, তথাপি আহা করিবার কেহ নাই।

দেবানন্দের আমলে যেমন লোক জন খাওয়াইবার একটা আড়ম্বর ছিল, অন্ততঃ এ কয়দিন গ্রামের দীন-দুঃখীদের দুঃখ মোচনের জন্য যেমন ঐকান্তিক একটা ইচ্ছা ছিল, এখন সে সব কিছু নাই। রামেশ্বর দেখিয়া শুনিয়া আর সে দিকে যান না, কোন কথাও বলেন না; তিনি আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। অতিথিশালায় সাধুসন্ন্যাসীদের, আগত-অভ্যাগত দুই চারিজন দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারিলেই তিনি যেন স্বর্গের সুখানুভব করেন।

পূজার আর বেশী দিন নাই। আগামী কল্য দুর্গাষষ্ঠী, বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর আমন্ত্রণাদি অধিবাস হইবে। প্রাতঃকালে অফিস যাইবার সময় সর্ব্বেশ্বর একবার প্রতিমার প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন। দেখিলেন—

সমস্ত ঠিক হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতিমা শিবদুর্গা, বসা ষণ্ডের উপর বিরাজ করেন, এ নূতন কারীকর দাঁড়া ষাঁড়ের উপর শিবদুর্গা স্থাপন করিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর মহিমকে বলিলেন—দেখ মহিম! আমাদের বসা ষাঁড়ের উপর প্রতিমা বসেন—তুমি না জানিয়া দাঁড়া ষাঁড় করাইয়াছ? যাহা হউক যদি বসা করাইতে পারে—তাহা হইলে ভাল হয়, না হয় এ বৎসর ঐরূপই হউক; এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অফিস চলিয়া গেলেন। আজ অনেক টাকা আদায় হইবে এবং অফিস বন্ধ হইয়া যাইবে, কাজেই আজ অতিশীঘ্র না যাইলে সমস্ত কাজ সারা যাইবে না।

দাক্ষায়ণী রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া রন্ধন কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। সকলের আহার হইয়া গিয়াছে, তড়িৎ ঘোষ আহারাদি করিয়া বাজারে গিয়াছে। মহিমচন্দ্র ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, কারীকর আসিলে তাহাকে বলিয়া তবে আহার করিতে যাইবেন। কুমার মিস্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইল: মহিম বলিলেন—ওহে বাপু! তুমি একি করিয়াছ? বাবু বলিলেন—আমাদের চিরকালই বসা ষাঁড়ের উপর প্রতিমা হয়, তুমি দাঁড়া ষাঁড় করিয়াছ কেন? কুমার বলিল—মশায়! এতদিন বলিলেত হইত, এখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে—কল্য পূজা, এখন আবার অন্য প্রকার করিতে হইলে সময় লাগিবে যে? যাহা হউক, দেখি—যদি সহজে হয়। সে কাজ আরম্ভ করিল, মহিম আহারের জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কারীকর বহুকষ্টে বাবুর অনুমতি মত সেই রূপ প্রতিমা করিয়া দিয়া, চিত্র করিতে লাগিল, তার পর সাজ পরাইয়া প্রতিমা সন্ধ্যাকালে শেষ করিয়া মহিমের অপেক্ষা করিতে লাগিল, সে এইবার চুক্তির টাকা লইয়া বিদায় হইবে—এই আশা।

কিছুক্ষণ পরে মহিমচন্দ্র আসিলেন এবং প্রতিমা দেখিয়া বলিলেন—বাঃ! বেশ হয়েছে, তুমি কারীকর বটে। আচ্ছা দাঁড়া ষাঁড়টীকে কেমন

করিয়া বসা করিলে মিস্ত্রী ? কারীকর বলিল—মশাই ! নানা কৌশল আছে. আমরা চিরকাল এই কাজ করছি, আর এখানে কর্ত্তে পার্ব্বোনা কেন ? মহিমচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন,—বল না মিস্ত্রী ! কেমন করিয়া দাঁড়া ষাঁড় বসা করিলে ? মিস্ত্রী তার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মশাই ও আর কি, সুমুখের পা দুইটী কাটিয়া, পিছনের পা দুইটী বাঁকাইয়া দিলাম, ওরকম কত কর্চ্ছি, এ আর নূতন কি ? মহিমচন্দ্র এইবার রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি ব্যাটা ! হিন্দুর বাড়ী ষাঁড় কাটা, হারামজাদা বামুনের বাড়ী গোহত্যা, কই হ্যায়রে ব্যাটাকো বিশ জুতি লাগাও। ষাঁড়কাটা বেটা হিন্দুর বাটীতে গোহত্যা !

বাবুর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মিস্ত্রী ভয়ে জড়সড় হইল। সে পাড়া-গাঁয়ের মিস্ত্রী, এমন বড় লোকের বাড়ী কখন কাজ করে নাই, বিশেষতঃ সে অতিশয় ভালমানুষ—গোবেচারা ; বাবুর আস্ফালন ও চীৎকার দেখিয়া সে মনে করিল—না জানি কি কুকাজই করিয়াছি, ষাঁড়ের পা কাটিয়া বোধ হয় কতই অপরাধ করিয়াছি. অতএব এখানে আর থাকিলে পাছে চাকরের দ্বারা অপমানিত হইতে হয়—এই ভয়ে সে দে দৌড়, টাকা আর লওয়া হইল না। মহিমচন্দ্রও "হিন্দুর বাড়ী ষাঁড় কাটা, বেটা গোহত্যা" এই বলিয়া পিছু পিছু দৌড়াইতে লাগিল। দুই একজন চাকর আসিয়া পড়িল, পাড়ার লোকজন বাহির হইল, চারি দিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, মিস্ত্রী ত' দে দৌড়, এতক্ষণ গঙ্গার পার। তারপর মহিমের কাণ্ড দেখিয়া, মিস্ত্রীকে ফাঁকি দিবার কৌশল শুনিয়া সকলে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। রামেশ্বর গোলমাল শুনিয়া বাহির হইয়াছিলেন, মহিমের ব্যাপার দেখিয়া তিনিও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। শুনা যায়—এইরূপে মিস্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া সে দিদির

নিকট খুব সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ভগ্নীপতি সর্ব্বেশ্বরও শ্যালকের উপস্থিত বুদ্ধির খুব তারিফ করিয়াছিলেন। হায়! যে দেবীপুরে দেবানন্দের ভক্তি-প্রাবল্যে মাতৃপূজার বিশেষত্ব দেখিবার জন্য এক সময় বহু দূর-দূরান্তর হইতে লোকজনের শুভাগমন হইত, তাঁহার সেই প্রাণপোরা মাতৃনামের আকুলি-বিকুলি চীৎকার শুনিয়া দর্শকগণও ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইত, আর আজ তাঁহারই বাটীতে সেই দেবীপূজায় লোকজনের ত' সমাগম হয়ই না, তাহার উপর কারীকরকে ফাঁকি দিয়া প্রতিমা গড়াইয়া লইবার কেমন পন্থা অবলম্বন করা হইল, পাঠক! একবার তাহা দেখিলেন কি? আমরা ত চিরকাল সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবে পূজার ব্যবস্থা দেখিয়া আসিতেছি; সর্ব্বেশ্বরের এ পূজা যে কোন ভাবের, তাহা খুঁজিয়া পাই না। ইহাদের পূজায় যে কিরূপ আন্তরিকতা, কিরূপ ভক্তি প্রবণতা—তাহা সহজেই বিবেচ্য।

পূজার তিন দিন খেম্‌টা নাচ, বাইনাচ প্রভৃতিতেই কাটিল। কলিকাতা হইতে সর্ব্বেশ্বরের বন্ধুবান্ধব যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই শুনিলেন এবং এই তিন দিন সুখে আহারাদি করিলেন। পূজার মণ্ডপে ছিলেন—কেবল কুলপুরোহিত শিরোমণি ঠাকুর আর প্রাণের আবেগ লইয়া মাতৃ-চরণে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন—আমাদের পরম মাতৃভক্ত রামেশ্বর। তিনিই দেবীকে প্রাণের আবেদন-নিবেদন জানাইয়া হৃদয়ের ভক্তি-প্রাবল্যে এ তিন দিন পূজা করিয়াছিলেন। তার পর "কা কস্য পরিবেদনা" প্রতিবাসীদের কেহ একদিনও এ বাটীতে পদার্পণ করে নাই।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইল। দুর্গোৎসবে এবার কেলেঙ্কারীর একশেষ হইল—পাড়া শুদ্ধ লোক ছি ছি করিতে লাগিল।

রামেশ্বর পূজার পূর্ব্বেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিতেন, কিন্তু পিসী-মাতার একান্ত অনুরোধে এই কয় দিন কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছায় ছিলেন; তবে এবার পূজায় দাদা যেরূপ খোস্‌নাম কিনিলেন—কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোকে যেরূপ তাঁহার মুখ পুড়াইয়া দিতে লাগিল—বংশের দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি আর তিলার্দ্ধ তথায় অবস্থান করিলেন না। ইহার পর আরও কত কি হইবে—মূর্খ মহিমচন্দ্র যখন কর্ত্তা—তখন আরও কত কেচ্ছা শুনিতে হইবে ভাবিয়া তিনি মাতৃ-প্রতিমা নদীতে বিসর্জ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূজনীয় পিসীমাতার পদধূলি লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পিসীমাতা সত্বর ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৌদিদি ও দাদাকে একবার শেষ বিদায়ের সময় প্রণাম করিবার ইচ্ছা ছিল। বিশেষতঃ আজ বিজয়া, গুরুজনকে প্রণাম করাটা হিন্দুর রীতি, কিন্তু দাদার বাটীতে এখন যেরূপ বীভৎসকাণ্ড চলিয়াছে, বিজয়ায় তাঁহারা যেরূপ আমোদ উল্লাসে মাতিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেখানে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

স্বাস্থ্য ভাল হইলেই পিসীমাতা তাহাকে সত্বর গৃহে ফিরিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আর এ গৃহে ফিরিবার তত ইচ্ছা নাই। যদি কোন সাধুপুরুষের কৃপালাভ করিতে পারেন—তাহা হইলে সেইখানেই বসিয়া পড়িবেন, পরকালের পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিবেন—ইহাই তাঁহার মনের প্রবল বাসনা, এখন জগদম্বা যাহা করেন—তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ত' সকল বিষয়েই বর্ত্তমান—মানুষ স্বেচ্ছায় আর কবে কি করিতে পারিয়াছে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যতীত জগতের একটী সামান্য কার্য্যও কি সম্পাদিত হয়?

প্রাণে যাহার ধর্ম্মভাব বদ্ধ, জগতে তাহার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। ভয় পাপীর—পুণ্যাত্মার ভয় কোথায়? ভয়ের ভয় যাহাকে অভয় দিয়াছে, এ জগতে সে আর কাহাকে ডরায়? নির্ভীকচিত্ত রামেশ্বর মাতৃমন্ত্রে রক্ষা-কবচ আঁটিয়া প্রফুল্ল মনে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুই তিন দিন পরে রামেশ্বরের গৃহত্যাগ বার্ত্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। পাড়ার সকলে রামেশ্বরের গৃহত্যাগে অত্যন্ত দুঃখিত হইল; ভট্টাচার্য্য-গৃহ এইবার প্রকৃত শ্মশানে পরিণত হইল ভাবিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কর্ত্তা-গিন্নী কাশী যাইবার পর এ পবিত্র বংশের পরিণতি ত' একপ্রকার অধর্ম্মেই স্থাপিত হইয়াছিল, যাহা কিছু টানিয়া রাখিয়াছিলেন—ধার্ম্মিকপ্রবর, পিতৃপথানুবর্ত্তী রামেশ্বর; যখন তিনিও চলিয়া গেলেন, তখন আর ও বংশের শ্রেয়ঃ নাই, এইবার পুরাদমে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইবে, আর ত বলিবার বা আপত্তি করিবার কেহ রহিল না, এখন যাহা করেন গোঁয়ার গোবিন্দ—মহিমচন্দ্র!

রামেশ্বরের জন্য পাড়ার লোক কাঁদিল, হায় হায় করিল, তাহার গুণের কথা স্মরণ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভাবিয়া আকুল হইল, কিন্তু যার

মার পেটের ভাই, সেই সর্ব্বেশ্বরের কিছুমাত্র দুঃখ হইল না বরং রামেশ্বরের গৃহত্যাগে তিনি মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—অমন অকম্মণ্য একটা সংসারের ভার বৃদ্ধি করবার চেয়ে চক্ষের আড়ালে চলে যাওয়াই ভাল, সামনে থাক্‌লে কেবল রাগ বাড়ে বইত নয়? বুড়ো মিন্সে কিছু কর্ব্বে না, কেবল বসে বসে খাবে, আর অকর্ম্মণ্যের ঝুড়ি খুলিয়া কেবল ধর্ম্ম-ধর্ম্ম কর্ব্বে; অত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেই ত' দেশটা একেবারে এত উৎসন্ন গেছে? আঃ মর, এত ধর্ম্ম-ধর্ম্ম কেন, ধর্ম্ম কি তোকে খেতে দেবে? কাজ কর্ম্ম না ক'ল্লে কে কবে সুখে কাল কাটাতে পেরেছে? বাবা যা ক'র্ত্তেন—ছোঁড়াটা তাও ক'র্ত্তো না, কেবল বসে বসে সমস্ত দিন পূজা আহ্নিক আর সাধুসন্ন্যাসী নিয়ে ধর্ম্মের বকামী ক'র্ত্তো; এ বয়সে কি ঐ কাজ? কোথায় কাজ কর্ম্ম করে পাহাড় ডুলিয়ে ফেল্‌বে তা নয় কেবল বচন, ওর দেখে শুনে ছেলে-মেয়েটাও মাটী হচ্ছিল, কাকার কাছ ছাড়তো না, এইবার তাদের পড়া-শুনার একটা বন্দোবস্ত ক'র্ত্তে হবে।

সর্ব্বেশ্বর মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতেছেন। আপনাকে এখন এই অতুল সম্পত্তির সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইতেছেন। বিষয়-আশয় বিরোধ-শূন্য হইল, ছোঁড়াটা আর না আসে, কোন গতিকে মারা টারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার এ আনন্দ চিরস্থায়ী হয়—এই জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময় তাহার প্রিয় শ্যালক, প্রমোদার প্রাণের সোদর মহিমচন্দ্র তথায় হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—দাদাবাবু! যা শত্রু পরে পরে, ছোটকর্ত্তা ত' দুই তিন দিন বাড়ী ছাড়া, বোধ হয় আর এ মুখো হবেন না; এইবার ঠাকুর-বাড়ীর বন্দোবস্তটা ভাল করে ক'ল্লে হয় না?

সর্ব্বেশ্বর। আরে রসো ভাই! সবুরেই কি হলো, আবার যদি আসে! নূতন বন্দোবস্ত করে শেষে কি টাকাগুলো নষ্ট কর্ব্বো, এখন

দুচার মাস দেখতে হবে, বল্লেইত টাকা খরচ করা হয় না! এখন সে কি মতলবে বাড়ী ছেড়েছে, তাই বা কে জানে?

মহিম।—হাঁ মুরাদ ত' ভারি, তা আবার মতলব ভাঁজবে! সে জন্য ভেবোনা দাদা তুমি; যা করে তখন দেখা যাবে, আমি ত' ওকে থোড়াই জ্ঞান করি—কেবল তুমিই ভয় পাও।

সর্ব্বেশ্বর।—বাপের বেটা, বিষয়ের নেয্য অংশীদার—উড়িয়ে দিলে চল্‌বে কেন?

মহিম।—সে রকমে নয়, তবে কলে-কৌশলে।

সর্ব্বেশ্বর।—আচ্ছা। আরও কিছুদিন যাক, ভাত ত' আর ছড়ান নাই? খেতে না পেলে—দুপাঁচ দিন বাদে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, ভাত কেউ দেবে না দাদা! যেরূপ সময় পড়ছে, নিজের ছেলেই পর হয়, তা অন্যের কথা কি? এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর অফিসের বেলা হইল দেখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। চাটুকার মহিমচন্দ্র ভগ্নীপতির তোষামোদ করিতে করিতে পালিত সারমেয়ের ন্যায় পাছু পাছু চলিলেন।

মদের নেশায় মানুষকে অধঃপাতে দেয় সত্য কিন্তু অর্থের নেশায় যত দেয়, তত আর কিছুতেই দেয় না। মনের গতি ফিরিলে বরং মদ ছাড়িতে পারা যায়, কিন্তু অর্থের নেশা ছাড়া সহজ-সাধ্য নহে। যিনি স্বার্থের সহিত মাখামাখি হইয়া অর্থের নেশায় মত্ত হইয়াছেন, জগতে তাহার অকরণীয় কিছুই নাই, অধঃপতন তাহার যেরূপ হয়, তেমন আর কাহারও হয় না; পাঠক! সর্ব্বেশ্বরের চরিত্রে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ত'? ছোট ভাইটি কোথায় গেল—কি হইল, কেন গৃহত্যাগ করিল—সে চিন্তা তাঁহার নাই। এখন বিষয়-আশয় নিষ্কণ্টকে ভোগ-দখল করিতে পারিবেন, আর কেহ অংশীদার রহিল না, এই চিন্তাতেই বাবু বিভোর—আনন্দে আত্মহারা। তবে এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন

নাই, কারণ যদি সে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে। এই জন্য পতিপত্নীতে ঠাকুরের নিকট মনে মনে মানসিক করিতেছেন—মহিমও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ফাঁকি দিবার মতলব ভাঁজিতেছেন; কিন্তু লোকের সহিত দেখা হইলে মৌখিক দুঃখ করিতেও ছাড়িতেছেন না, পাছে লোকে কোনও দোষ দেয়। 'বিষকুম্ভং পয়োমুখম্' কিনা, পাপীর স্বভাবই কিনা ঐরূপ! নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অর্থলোভে মানুষ করিতে পারে না—এমন কাজ নাই এবং অর্থের জন্য তাহাকে যতই গর্হিত কার্য্য করিতে হউক, সে তাহাতে পশ্চাৎপদ নহে, অর্থের লোভ এমন মোহকরী; পশুত্বপ্রদানে তাহার এমত মহীয়সী শক্তি! এই জন্য সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বলেন—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" কিন্তু সাধারণ মানবের কি তাহা ভাবিবার শক্তি আছে?

যে যাহাই ভাবুক, ফাঁকি দিবার জন্য যাহা করুক, যাহার মন ঈশ্বরমুখী হইয়াছে—সে আর এ সকল অসার চিন্তায় ব্যস্ত নয়। বিষয়-আশয় কি হইবে, আমি না থাকিলে হয়ত' লোকে তাহা ফাঁকি দিবে, এ চিন্তা ঈশ্বরপরায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রাণে জাগে না, রামেশ্বরেরও জাগিল না। মৃত্যু-ভয় তাঁহার নাই; তিনি মনে করিলেন—নিঃসম্বলে চলিয়াছি, যদি একান্তই না ফিরি, মায়ের যদি সেই ইচ্ছাই থাকে, তাহা হইলে বংশের দুলাল ভ্রাতুষ্পুত্র রহিয়াছে, সেই তাহার বিষয় দখল করিবে, কাকার বিষয় ভাইপো পাবে, এর আর বিচিত্র কি? অথবা এ সকল চিন্তা তাঁহার মনে একেবারে স্থান পায় নাই, তিনি ত' আর একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য বাটীর বাহির হন নাই? ভাইয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া কিছুদিন জুড়াইবার জন্য, সাধুসঙ্গে মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য যাইতেছেন। পিসীমা যে তাহাকে সত্বর গৃহে ফিরিতে বলিয়াছেন, বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে দেখিলে যে তিনি অতীব সুখী

হইবেন, নতুবা হিন্দুর বাল বিধবা, এ সংসারে আজীবন খাটিয়া শরীর নষ্ট করাই যে তাঁহার সার হইবে। পিসীমার মনোবাসনা কি তিনি অপূর্ণ রাখিতে পারেন? ধর্ম্ম-কর্ম্মে এতদিন তিনি তাঁহার সহায় না হইলে যে রামেশ্বর পিতার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেন না। যিনি এত হিতৈষিণী, তাঁহার কথা অবহেলা কি সহজে করা যায়?

রামেশ্বর ধর্ম্মকে একমাত্র সহায় করিয়া চলিয়াছেন, পথে তাঁহার বাধা-বিঘ্ন কিছুই হইতেছে না। সেই কমনীয়-কলেবর ধার্ম্মিক যুবক যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই তাঁহার আদর-আপ্যায়ন, সেইখানেই তাঁহার দৈনিক ভোজনের সুচারু ব্যবস্থা হইতেছে, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মভাবপূর্ণ কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইতেছেন, তাঁহার ধর্ম্মজ্যোতিঃপূর্ণ বদনকান্তি দেখিয়া সমাদরে স্থান দিতেছেন; রামেশ্বর দুই একদিন তথায় থাকিয়া আবার অন্য স্থানে গমন করিতেছেন। মাতৃমন্ত্রে একাগ্রচিত্ত, মাময়-জীবন সন্তানের, মায়ের এতবড় বিশাল রাজত্বে থাকিবার-খাইবার ভাবনা কি? যেদিন তাহা হইবে, সেদিন হিন্দু নাম জগৎ হইতে লোপ হইয়া যাইবে, ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থই থাকিবে না।

রামেশ্বর কতক পদব্রজে, কতক যানারোহণে গমন করিয়া পাঁচ ছয় মাসের পর হরিদ্বারের পথে এক জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। আহা! কি মনোহর স্থান, পর্ব্বত-গাত্র হইতে ঝর ঝর স্বরে নির্ঝরিণী ঝরিয়া পড়িতেছে; ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জল কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন কাক চক্ষু; কূলে তাহার মৃগ শিশু জননীর সহিত খেলিয়া বেড়াইতেছে; কাননচারী কোকিল-কোলিকা আনন্দে পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে; আবার ও কি ও, বহুদূরে নরখাদক ব্যাঘ্র হিংসা ভুলিয়া জল পান করিয়া চলিয়া গেল, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ যাহার প্রতি, তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। প্রকৃতির এমন হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত

স্থানে বাস না করিয়া, এমন প্রাণারাম পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান না করিয়া আমরা জ্বালামালাময় সংসারের সেই ঘোর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করি কেন? মরি মরি কি শান্তিময় স্থান, এখানে আসিলে আর সংসার বলিয়া কিছুই মনে থাকে না, ভগবানের মহিমা মনে হইয়া যেন স্বতঃই মনকে উদাস করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইয়া রামেশ্বর এদিক ওদিক করিতে করিতে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই গিরি-গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন—জনৈক সন্ন্যাসী ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে ভগবানের আরাধনায় রত; রামেশ্বর আর কোথাও যাইলেন না, সেই স্থানেই অবস্থান করিবার মানস করিলেন। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তাঁহার মনের বাসনা জানাইলে নিশ্চয়ই ভাল হইবে ভাবিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার কিছুই রহিল না।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর কৃপা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর নির্ভয়-হৃদয়ে সেই গিরিগুহার মধ্যে বসিয়া রহিলেন। সেই মহাপুরুষের কৃপালাভই এখন তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা; ধ্যান ভাঙ্গিলে তাঁহার সাধ্য-সাধনা করিবেন, তাঁহার নিকট মনোবেদনা জানাইবেন। এখন বিরক্ত করিলে পাছে হিতে বিপরীত হয়, এইজন্য অতি সন্তর্পণে পাষাণগাত্রে পৃষ্ঠদেশ অর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আজ দুইদিন বনে বনে আসিয়া তাঁহার কোন প্রকার আহার হয় নাই, ক্ষুধাও পাইয়াছিল কিন্তু এস্থানে কে তাঁহাকে আহার দিবে, সন্ন্যাসীও ত' ধ্যানস্থ। রামেশ্বরের সহ্যগুণ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সেই শান্তিময় স্থানে বসিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—আবশ্যক হইলে মা-ই খেতে দেন, সন্তান-বৎসলা সন্তানকে কখনও উপবাসী রাখেন না। এ জগতে পাছে কেহ উপবাসী যায় বলিয়া তিনি নদীতে জল, বৃক্ষে ফল দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন, সন্তান মাত্রেই এই স্থানে আসিয়া তাহা উপভোগ করিতে পারে—এ স্থানে কাহারও একাধিপত্য নাই।

অন্ধকারময় নির্জ্জন গিরিগুহায় কোন উপদ্রব নাই; হিংস্রক জন্তুগণ এখানে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া বিচরণ করিতেছে। রামেশ্বর যেখানে বসিয়া আছেন—তাহার অনতিদূরেই সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন, মধ্যস্থানে একখানি বৃহৎ পাষাণ মাত্র ব্যবধান রহিয়াছে। একটী ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ মিটি মিটি

করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহারই বা আবশ্যক কি? ব্রহ্মসাধন নিরত সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিয়া আছেন, তাঁহার রূপ-প্রভায় যেন সে স্থান আলোকিত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মৃদু বাতাস লাগিয়া প্রদীপ নিভিয়া গেল, তথাপি যেন তথায় কোন অন্ধকার নাই—এমনি সাধন-প্রভাব।

রামেশ্বর পশ্চাতে বসিয়াছিলেন—সন্ন্যাসী পূর্ব্বমুখে ব্রহ্ম-আরাধনায় নিরত; মধ্যে পাষাণ-খণ্ড ব্যবধান, তাহার ইচ্ছা যে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু উঠিয়া সম্মুখে যাইতে সাহস হইল না, পাছে মহাপুরুষের সাধনকার্য্যে কোন ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাঁহার রোষ-নয়নে পড়িতে হয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল; "ব্রহ্মময়ী তারা" বলিয়া তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, পশ্চাতে না চাহিয়াই বলিলেন—অভুক্ত ব্রাহ্মণ-যুবক অতিথি, এই দুইটী মূল গ্রহণ কর, একটী অদ্য ভক্ষণ করিয়া বিশ্রাম কর—রাত্রি অনেক হইয়াছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা উহাতেই নিবৃত্ত হইবে, দুই চারি দিন পরে আবার অপরটী ভক্ষণ করিও।

রামেশ্বর বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তেমন সুরস-সুস্বাদু মূল তিনি জীবনে কখনও ভক্ষণ করেন নাই। ওষ্ঠাগতপ্রাণ বাস্তবিক শীতল হইল—ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে পালাইল। সন্ন্যাসীর আদেশমত দ্বিতীয়টী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিলেন। তারপর শিলাতলে শয়ন করিলেন; কি এক অপূর্ব্ব শান্তিময় ভাবে শরীর স্নিগ্ধ হইল। সেই অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—পূর্ব্বে কখন কাহার সহিত চেনা পরিচয় ছিল না তথাপি সন্ন্যাসী যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রামেশ্বর! এত অল্প বয়সে সংসারে বিতৃষ্ণা কেন? দূরদেশের নির্জ্জন গিরি-গুহায় আসিবার কারণ আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু বৎস! এখনও ত' তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হয় নাই। পিতামাতা জীবিত থাকিতে

সন্ন্যাস গ্রহণ সন্তানের বিধেয় নহে, তাহাতে কোন ফল হয় না। সাক্ষাৎ দেবদেবী যখন জীবিত তখন কৃচ্ছ্রসাধ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার নূতন ভাবে অন্যের সাধনার আবশ্যক কি? পিতা-মাতাই ত' সন্তানের পরম দেবতা—মোক্ষফলদাতা, তুমি বৃথা এতদূর আসিয়াছ কেন? আর এক কথা—তোমার বিবাহ হয় নাই—আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করাও তোমার মনোগত ইচ্ছা নহে, তাহা হইলে তোমার সাধু পিতামাতার কীর্ত্তি-কলাপ লোপ পাইয়া যাইবে। সংসারে থাকিয়া তোমার পিতাও একজন মহাপুরুষ, তাঁহার সৎকার্য্য সকল বজায় রাখা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সকল রক্ষা করিতে হইলে তোমার বিবাহ করা একান্ত আবশ্যক, বিবাহ না করিলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয় না—সামান্য দাম্পত্য প্রণয়ের আস্বাদ যে বুঝে না—স্বর্গীয় প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করা—তাহার পক্ষে বামনের চাঁদ ধরিবার আশার ন্যায় বিফল! দাম্পত্য প্রেমই স্বর্গীয় প্রেমের সোপান স্বরূপ; অতএব সিঁড়ি অতিবাহিত না করিয়া কিরূপে তথায় উত্তীর্ণ হইবে। যাও, বিবাহ কর, পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া বংশের শ্রীবৃদ্ধি কর—তারপর সময় হইলে এখানে আসিও, ইহাই আমার আশ্রম। আমি এখানে বেশীদিন থাকিব না—রাত্রি প্রভাতে দেশ ভ্রমণে যাইব। সম্প্রতি আর আমার দেখা পাইবে না, সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। রামেশ্বর মহাপুরুষের যোগবল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; যাঁহার সহিত কখনও দেখা নাই—এখানে আসিয়াও যাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই—তিনি কোন্ অমানুষিক শক্তিবলে আমার মনোগত ইচ্ছা, আমার নামধাম, প্রভৃতি সমস্ত বলিয়া দিলেন। মানুষ হইয়া যদি এরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলাম—তবে আর মনুষ্য জন্মের সার্থকতা কি? এরূপ ক্ষমতা লাভ করিলে মানুষই ত' দেবত্ব লাভ করিতে পারে।

সন্ন্যাসী এত কথা বলিলেন—তাঁহার কথার উত্তর দিয়া, তাঁহার সহিত

বাক্যালাপ করিয়া মানব জন্ম সার্থক করা ত' উচিত, বিবেচনা করিয়া রামেশ্বর বলিলেন—প্রভু! আমি বহু কষ্টে সংসার ত্যাগ করিয়াছি—ঠিক যে বৈরাগ্য হইয়াছে—তাহা নহে, তবে সংসারে আমার থাকা দায় হইয়াছে, তাহা বোধ হয়—অন্তর্যামী-আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছেন, এক্ষণে তাহার উপায় কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন—বৎস! মায়ের এত ছেলে—সকলেই এক রকম হয় না। চিন্তা করো না—কালে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে—তোমার দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে—যাও বৎস! সংসারে ফিরিয়া গিয়া সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপা সহধর্ম্মিণী গ্রহণ কর। ভবিষ্যজ্জীবন তাঁহার শক্তিতেই শক্তিময় হইবে।

রামেশ্বর।—প্রভু! বাল্যকাল হইতেই আমার মনের বাসনা যে আমি কোনও বড়লোকের সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিব।

সন্ন্যাসী!—তাহার কারণ কি, দরিদ্র কি এতই ঘৃণ্য?

রামেশ্বর।—প্রভু! ঘৃণার ভাব আমার মনোমধ্যে আদৌ নাই, জগতে ঘৃণার পাত্র কে আছে? তবে বড়লোকের কন্যা হইলে, তাহার প্রবৃত্তির অনেক নিবৃত্তি হয়ে যায়, অনবরত "দেহি দেহি" ভাব তাহার থাকে না; এইজন্য বড়লোকের ধার্ম্মিকা সুন্দরী কন্যা আবশ্যক। পিতা আমার দাদার বিবাহে দরিদ্রের দায়োদ্ধার করিতে গিয়া সংসারে অশান্তি আনিয়া ফেলিয়াছেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ বড়ই মুখরা, তাঁহার জন্য আমাদের সোণার সংসার ছারখার হইতে বসিয়াছে। এইজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যদি বড়লোকের ধার্ম্মিকা সুন্দরী কন্যা পাই, তবেই বিবাহ করিব—নতুবা নয়।

সন্ন্যাসী রামেশ্বরের হৃদয়-ভাব অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন তজ্জন্য বলিলেন—আচ্ছা বৎস! তাহাই হইবে।

প্রভো! বহু কষ্টে সংসার ত্যাগ করিয়াছি, ঠিক যে বৈরাগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তবে সংসারে আমার থাকা দায় হইয়াছে তাহা বোধ হয় অন্তর্যামী আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছেন। (ভক্তি-মালা। ৬২ পৃষ্ঠা।)

সন্ন্যাসী আর কোনও কথা কহিলেন না। চুপটী করিয়া ক্ষুদ্র শিশুটীর মত জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। রামেশ্বর প্রাণে অতুলানন্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন সৌভাগ্যোদয় তাঁহার জীবনে কখনও হইবার আশা ছিল না। এইরূপ দেবকল্প মহাত্মার আশ্রয় লাভ সামান্য সংসারী মানবের ভাগ্যে ঘটে না। ইঁহাকে ছাড়িয়া আবার সংসার-মরুতে প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে, কিন্তু উপায় কি, সন্ন্যাসী ত' এখানে থাকিবেন না, প্রভাত হইলেই তীর্থভ্রমণে যাইবেন—থাকিলেও বা হাতে-পায়ে ধরিয়া এখানে থাকিবার অনুমতি চাহিতাম। তবে তিনি সংসারের সাধ মিটিলে পুনরায় আসিতে আশা দিয়াছেন. তবে আর ভাবনা কি? তাঁহার আদেশমত কিছুদিন সংসার করিয়া আবার পাদপদ্মে আশ্রয় লইব। এই সকল নানাবিধ সংচিন্তা করিতে করিতে রামেশ্বর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলেন—সন্ন্যাসী তথায় নাই। ভোর হইতে না হইতেই তিনি গিরি-গুহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রামেশ্বর অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, যাইবার সময় দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে না পারিয়া তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে গিরিগাত্র হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছেন—বৎস! তোমার দ্বারা জগতের অনেক উপকার হইবে, জানি না আমা হেন সংসারাসক্ত মুগ্ধ জীবের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে, তবে ব্রহ্মবাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। মা জগদীশ্বরি! আমি তোমার অতি অধম সন্তান, সংসারে প্রতিপদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, দেখো মা! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মহাপুরুষের বাক্যানুসারে আমি এবার সংসারী হইতে চলিলাম। যদি প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া তোমার এই চিরানুগত সন্তানকে

রক্ষা ক'রো। রামেশ্বর মাতৃভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, পথের এ দারুণ কষ্টও তাঁহার এই ঐকান্তিকতাকে নষ্ট করিতে পারিতেছে না। প্রাণ ভগবদ্ভাব-সাগরে ডুবিয়া পড়িলে পার্থিব দুঃখ কষ্ট কখনও সাধকের চিত্ত-চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে না, তিনি তখন অটল অচল ভাবে লক্ষ্য স্থির করিয়া আপনার গন্তব্য-পথে ধাবিত হন।

ক্রমাগত কয়েক মাস পথ অতিবাহিত করিয়া রামেশ্বর প্রয়াগে আসিয় উপস্থিত হইলেন। জঙ্গলাকীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার সময় মধ্য-পথে তিনি একদিন সন্ন্যাসী প্রদত্ত সেই মূলটী আহার করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত এড়াইয়াছিলেন। এখন জনপদে আসিয়া তাঁহার আর কোনও ভাবনা রহিল না, মনের আনন্দে ত্রিবেণী তীর্থে স্নান করিয়া ধন্য হইলেন। আশা, আরও কিছুদিন পথ চলিয়া বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বদেবময় জনকজননীর পাদপদ্ম দর্শন করিবেন। রামেশ্বর যে এ পাদপদ্মের চির ভিখারী, একদণ্ডের জন্য যে তিনি ইহা ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, আজ কতদিন হইল সেই আরাধ্য পদ দর্শনে যে তিনি বঞ্চিত আছেন, তবে এতদূর আসিয়া এ লোভ কি ধার্ম্মিক রামেশ্বর ছাড়িতে পারেন? পিতার পদ যে তাঁহার নিকট ব্রহ্মপদ; জননী পদ যে তাঁহার নিকট সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা। রামেশ্বর বাধ্য হইয়া আজ বহুদিন যে এ পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত, এখন এ লোভ সম্বরণ করার সাধ্য তাঁহার কোথায়? ইহাতে তাঁহার প্রাণান্ত হয় হউক।

গুণশালী ব্যক্তির দৈহিক সৌন্দর্য্য আপনি বাহির হয়—পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর করিতে হয় না। রামেশ্বর সন্ন্যাসীর বেশে বাড়ীর বাহির হইয়াছেন, এ বেশ তাঁহার আশ্রমোচিত না হইলেও পথ-ভ্রমণ সময়ে ইহার অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া একখানি গৈরিকরঞ্জিত বসন, একখানি উত্তরীয় লইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার রূপের উজ্জ্বলতা এত

যে তাঁহাকে দেখিলে প্রাণে স্বতঃই কিরূপ একটা
ব হইত, তাহার সহিত কথা কহিতে যেন সকলেরই

নই তিনি যাইতে লাগিলেন, সকলেই তাঁহাকে গুরুর
লাগিল; তাহার মুখে ধর্ম্ম-কথা শুনিবার জন্য সকলেই
রিতে লাগিল। রামেশ্বর শাস্ত্রপাঠী সুপণ্ডিত, তাহার
জ্ঞান-প্রদীপ বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সরলভাবে ধর্ম্মের
যশ লোক মুগ্ধ করিতে পারেন; ভিতর হইতে মা
...ম গুছা যোগাইয়া দিতেছেন, তাঁহার লোক-সমাজে ধর্ম্মোপদেশ
দিবার ভাবনা কি?

রামেশ্বর প্রয়াগে আসিয়া খুব সুখেই কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং
তন্ন তন্ন করিয়া হিন্দুর প্রধান তীর্থ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য
জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন। আগামী কুম্ভমেলার উদ্দেশে
সমাগত অনেক সাধু-সন্ন্যাসীও তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাহবা দিতে
লাগিলেন।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধু-সঙ্গের ফল।

এলাহাবাদে তখন কয়েক জন খুব ধনী হিন্দু জায়গীরদার বাস করিতেন। তাঁহাদের উদ্যোগেই কুম্ভ-মেলায় দেশদেশান্তর হইতে সন্ন্যাসী সমাগম হইত, তাঁহাদেরই ব্যয় বাহুল্যে এই সকল মহাত্মাগণের আহার ও বাসস্থানের কোন প্রকার কষ্ট হইত না। এইরূপ সদ্ব্যয় করিয়া জমীদারগণ অর্থের সার্থকতা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। এই সকল সাধু-ভক্ত জায়গীরদারগণের মধ্যে মহানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; সদাব্রতে তিনি এক প্রকার মুক্তহস্ত বলিলেও হয়। ইনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, বাণিজ্য ব্যপদেশে এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। অপরাপর সকলে অন্য দেশবাসী।

ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে বিমল সুখ উপভোগ হয় না—অর্থ উপার্জ্জন যে সার্থক হয় না, মহানন্দ তাহা বুঝিতেন। এইজন্য সঞ্চয় অপেক্ষা ধনের সদ্ব্যয় করাই তাঁহার উপার্জ্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সাত্বিক কি তামসিক ভাবে তিনি এ কার্য্য করিতেন—নামের জন্য তাঁহার এই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত কি না—তাহা অন্তর্যামীই জানেন তবে এ কার্য্যে যে তিনি কৃপণতা করিতেন না—তাহা তাঁহার খরচের মাত্রা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত।

ব্রাহ্মণ খুব সাধু-প্রকৃতির—সর্ব্বদা সদানুষ্ঠান—শাস্ত্রালাপ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। পুত্রটী উপযুক্ত হইয়াছেন, তিনি বিষয় আশয় দেখেন, মহানন্দ জীবনের বেলা ভূমিতে আসিয়া এখন আর ওদিকে তত মন

দেন না, পুত্র অপারক হইয়া কোন কিছু পরামর্শ চাহিলে—তাহাই প্রদান করেন মাত্র।

জমীদারী ও কারবারের আয় বার্ষিক প্রায় দশ সহস্র টাকা হইলেও ব্রাহ্মণের চালচলন তেমন দুরস্ত ছিল না। সেই সে কেলে ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। পুত্র কমলাকান্ত কিন্তু ফিট্ বাবু! তবে অর্থের মোহে পড়িয়া চরিত্র-দোষ যে কিছু জন্মাইয়াছিল—তাহা কেহ কখনও শুনে নাই বা দেখে নাই; গৃহে যাহার মনোরমা পত্নী বর্ত্তমান—এ দোষ তাহার প্রায়ই ঘটে না। যাহার ঘটে, জগতীতলে সে অধম হইতেও অধম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

কমলাকান্ত পিতামাতার একমাত্র সন্তান—এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী—তাই বড় আদরের, বড় মুখ চাওয়া ধন। যে ফুলটী যত্নে সংরক্ষিত—বিধাতার রাজত্বে তাহাই বুঝি সত্বর কীটদষ্ট হইয়া থাকে? কমলাকান্ত পিতামাতার বড় আদরের বলিয়া দিন দিন যেন তালপাতার সিপাই হইতেছেন; এত আহার-বিহার সত্ত্বেও গায়ে এক কড়ার মাংস নাই, যেন ফু দিলে উড়িয়া যান।

দেহ স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিতে হইলে জাতীয় আচার ব্যবহারে বিমণ্ডিত হইয়া ধর্ম্মভাবে থাকিতে হয়; নতুবা যতই ভাল খাও, ভাল পরো, শরীর বেশ কান্তিপুষ্ট হয় না। যদিও সামান্য হয়, তাহা দুই এক দিনের জন্য—কোনও প্রকার একটা সামান্য পীড়ার বাতাস লাগিলেই—তাহা ধসিয়া পড়ে। শরীর রক্ষা করিতে হইলে জাতীয় ভাবে বিভোর হওয়া কর্ত্তব্য, বিদেশীয় ভাবে বিভোর হইলে তাহা অচিরে মাটী হইয়া যাইবে।

চরিত্র নির্ম্মল হইলেও কমলেশ্বর বিদেশীয় হাবভাবে মণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া সদাসর্ব্বদা প্যাণ্ট-কোট পরিধান করিতেন; আহারাদিরও কোন বাচ্-বিচার ছিল না। পিতামাতার

ভয়ে বাটীতে না হউক, দারাগঞ্জের কোতয়ালীতে তিনি সাহেবদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া অনেক অখাদ্য কুখাদ্য-খাইতেন। এই জন্য অচিরে শূল-রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যাহার পিতামাতা এত ধর্ম্মভাবাপন্ন, দেবদ্বিজে এত ভক্তি পরায়ণ গোঁড়া হিন্দু; তাহাদের পুত্র যদি এরূপ আচার ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না ত' হইবে কাহার? কমলেশ্বর এখন এক প্রকার অকর্ম্মণ্য; এই অল্প বয়সে শরীরের জন্য তাহাকে কোতয়ালীর কণ্ট্রাক্টের কার্য্য ছাড়িয়া-দিতে হইয়াছে।

কার্য্য যাক আর থাক মহানন্দের সেজন্য কিছুমাত্র ভাবনা নাই—কারণ টাকার ত' অভাব নাই? তবে পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য তিনি বড়ই চিন্তিত, তাহার উপর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র কন্যা নির্ম্মলা বড় হইয়াছে, তাহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে না পারিলে বৃদ্ধের আর খাইয়া-পরিয়া সুখ নাই—নির্ম্মলার বয়স হইয়াছে—প্রায় চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হয়—হিন্দুর হিসাবে অবক্ষণীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নির্ম্মলা নিখুঁত সুন্দরী এবং পিতার অর্থেরও অভাব নাই—তবে বিবাহ হয় না কেন?

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ঠিক পতি-পত্নী-সংযোগ না হইলে বিবাহ দেয় কার সাধ্য। তাই যত পাত্র দেখিতেছেন—একটীও পছন্দ হইতেছে না—এমন স্বর্ণপ্রতিমা ত' ইচ্ছা করিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া যায় না? এমন সুন্দর মুক্তার মালা বানরের গলায় পরাইলে যে পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইবে। কাজেই বৃদ্ধ বয়সের এ স্বর্ণ লতিকা-টীকে উপযুক্ত সহকার ভিন্ন যথায় তথায় মিলাইয়া দিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই—ইহাতে যদি কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকে- তাহাও ভাল।

নির্ম্মলার বিবাহে জননী সৌদামিনীর তত কিছু ইচ্ছা নাই—কর্ত্তা যাহা করিবেন—তাহাই হইবে কিন্তু তাহার দিদিমার আর পছন্দ হয় না। দোহিত্রীকে তিনি একটী রূপ-গুণযুক্ত সুপাত্র না পাইলে কিছুতেই সম্প্রদান করিতে মত দিবেন না, নির্ম্মলাকেও তিনি সেইরূপ বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। পিতা সুপাত্র ঠিক করিলে—কন্যা চুপে চুপে একবার দিদিমাকে দেখিয়া আসিতে বলেন। দিদিমাও আদরের নাতিনীর জন্য দূতী সাজিয়া দেখিতে যান—জনে জনে জিজ্ঞাসা করেন,—পাত্র উপযুক্ত কি না?

নির্ম্মলা বেশ লেখাপড়া জানেন, এখনকার মেয়েদের মত নাটক নভেলেই তাঁহার জ্ঞানের মাপকাটী কাটা যায় না। কমলেশ্বরকে বি এ পড়াইবার সময় যে পণ্ডিত তাহাকে সংস্কৃত পড়াইত, নির্ম্মলা তাঁহার নিকট হইতে অনেক সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর ভাল ভাল ধর্ম্মগ্রন্থও তাঁহার বেশ আয়ত্ত হইয়া জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করিত, কাজেই এমন বিদুষী কন্যাকে কি যা—তা একটা পাত্রে বিবাহ দেওয়া যায়? কেন, কন্যার বিবাহ ত' আর তাঁহাদের পক্ষে দায় নয়, যখনই মনোমত পাত্র জুটিবে—যত টাকা লাগে—তখনই তাহা দিবেন; তবে পাত্র ভাল পাওয়া যাইতেছে না—এই দুঃখ।

টাকা যত উপার্জ্জন হউক, আর না হউক, পুত্র কমলেশ্বরকে বিদেশীর সংসর্গে যাইতে দেওয়া হইবে না। সংসর্গে পড়িয়াই এত অল্পবয়সে ছেলেটা মাটী হইয়া গেল, বামুনের ছেলের এত অনাচার সহ্য হইবে কেন? কমলেশ্বর এখন বাটীতেই থাকেন, লোকজনের দ্বারা যেটুকু কাজ চালান যায়—তাহাই চালান। তিনি এখন বুঝিয়াছেন—এতটা বাড়াবাড়ী ভাল হয় নাই। সে বিষয়ে পিতামাতা এবং তাঁহার সুরূপা সহধর্ম্মিণী

যে অনবরত টিক্ টিক্ করিতেন, তাহার ভালোর জন্য যে তাঁহারা এ৩ বলিতেন, কমলেশ্বর এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইতেছেন, তবে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, দৈব সানুকুল না হইলে এখন আর উপায় নাই।

জমীদার মহানন্দের বাটী দারাগঞ্জে কোতয়ালীর উত্তরে খুব বড় অট্টালিকা। রাজবাটীর মত সুরম্য হর্ম্ম্য, সাজ-সজ্জা দেখিলে তাক্ লাগিয়া যায়—দুদণ্ড চাহিয়া থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণ মহানন্দকে দেখিলে এ বাটীর মালিক বলিয়া বোধ হইবে না, তিনি এমনি সেকালের সাদাসিদা প্রকৃতির লোক। সদাই ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা মুখে, এত বয়সে সাংসারিক এত চিন্তা থাকিলেও ব্রাহ্মণ সদাই আনন্দময়, এ সকল বিষয় চিন্তাও তাঁহাকে একেবারে মুহ্যমান করিতে পারিত না। যা করেন ভগবান— তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন ত' কিছু হইবার উপায় নাই? ব্রাহ্মণ প্রত্যহ বৈকালে ত্রিবেণী তীর্থে বেড়াইতে যাইতেন, বেড়াইবার উদ্দেশ্য মহাত্মা রামেশ্বরের বাসায় যাইয়া, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করা। বৈকালে এই গীতার পাঠ শুনিতে রামেশ্বরের বাসায় বহুদূর হইতে বহু লোক সমাগম হইত। তিনি প্রায় চারিঘণ্টা কাল অক্লান্ত ভাবে গীতার এমনি মনোরম ব্যাখা করিতেন যে সমাগত জনমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। এই গুণে মহানন্দ রামেশ্বরের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পুত্র কমলেশ্বরের মতি পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি দু একদিন রামেশ্বরকে তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অন্য অভিসন্ধিও তাঁহার ছিল কিন্তু তাহা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। রামেশ্বর তাহাতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিলেন না। বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষার জন্য বলিলেন—তাহাতে আর ক্ষতি কি? আপনার পুত্র

যদি গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমি যাইব। যখন কুম্ভমেলা না দেখিয়া প্রয়াগ ত্যাগ করা হইবে না, তখন এরূপ সৎসঙ্গে সৎ বিষয়ের আলোচনায় সময়ক্ষেপ করাই ত' বিধেয়।

পরদিবস হইতে রামেশ্বর দারাগঞ্জে মহানন্দের বাটীতে গীতা পাঠ আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিতে জমীদার ভবনে সমাগত হইতেন এবং যুবকের এই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাব পূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেন। মহানন্দের পুত্র কমলেশ্বর প্রথমতঃ দুই এক দিন অগ্রাহ্য করিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন নাই; পরে পিতার অনুরোধে দুই এক দিন অনিচ্ছায় আসিয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আর তিনি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সে মধুময় ভগবদ্বাক্য চিরজীবন তাঁহার অন্তরে গাঁথা থাকিবে।

কমলেশ্বর দুই এক দিনের মধ্যে রামেশ্বরের গোঁড়া হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে আর স্থানান্তরের বাসায় যাইতে না দিয়া নিজের অট্টালিকায় স্থান দান করিলেন। তাঁহার সুচারুরূপে আহারাদির ব্যবস্থাও সেই দিন হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে হইতে আরম্ভ হইল। রামেশ্বর প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু বাটীর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল।

একত্র সহবাসে ঘনিষ্ঠতা আপনিই জন্মাইয়া থাকে। বিশেষতঃ রামেশ্বরের ন্যায় সাধু-প্রকৃতি, সুরূপ-দর্শন যুবকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিছুদিনের মধ্যেই কমলেশ্বর রামেশ্বরের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরাও সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবকের রূপগুণে এবং ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। দৈব সানুকূল—

তাই অল্প দিনের মধ্যে কমলেশ্বরের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তিনি এখন ঠিক ব্রাহ্মণের মত আচার-ব্যবহার করেন, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। একজন প্রগাঢ় বিদেশী ভাবাপন্ন যুবা যে এত অল্প-দিনের মধ্যে এমন ভাবে ফিরিয়া পড়িবে—তাহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না কিন্তু ধর্ম্মের এমনি আকর্ষণ, শাস্ত্রপাঠের এমনি মহিমা যে কমলেশ্বর হেন যুবকও এখন গোঁড়া হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের সুখ্যাতি করিতে, দেব-দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে তাঁহার চক্ষু এখন আর্দ্র হইয়া উঠে।

কুম্ভমেলার আর বেশীদিন বিলম্ব নাই—মাঘমাস সমাগত। মেলা শেষ হইলেই রামেশ্বর এলাহাবাদ ত্যাগ করিবেন কিন্তু কমলেশ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবেন—এখন হইতে ইহাই তাঁহার মহাভাবনা হইয়াছে।

রামেশ্বর সন্ন্যাসী নহেন—গৃহী। তাঁহার পিতা মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান। দেবীপুরের একজন খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের পুত্র। সম্পূর্ণ রূপে যোগ্য পাত্র—অতএব একদিন রামেশ্বরের অসাক্ষাতে সকলে পরামর্শ করিলেন—যে নির্ম্মলার বিবাহ এই যুবকের সহিতই ধার্য্য করা যাক। ইহাতে কাহারও অমত হইল না; প্রকারান্তরে দিদিমা নির্ম্মলাকে বর পছন্দ হয় কি না, তামাসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নির্ম্মলা বলিলেন—তোদের এক কথা, অমন মহাপুরুষ আমার মত নির্গুণা স্ত্রীলোককে কি দাসী করিবেন?

কথা শুনিয়া পিতামাতাও বুঝিলেন—কন্যা এরূপ সুপাত্রে পড়িলে
আ...
...ই সুখী হইবে। সে ত' আর এখন ছেলে মানুষ নয়, সব ত' বুঝিতে
নাই।
...ছে? বাস্তবিক এরূপ স্বামীর স্ত্রী হইতে পারিলে; এরূপ রূপগুণ
অনুরোধ
...বিযুক্ত যুবককে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলে কোন্ স্ত্রীলোক

না আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করে? রামেশ্বরের সহিত বিবাহ দিবার জল্পনা-কল্পনা শুনিয়া নির্ম্মলার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনিও দেবতার স্থানে ভক্তি-গদ-চিত্তে আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বন্ধনে।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে রামেশ্বরের দেহ জ্যোতির্ম্ময়—তপ্ত কাঞ্চনের মঃ
বর্ণ ধারণ করিয়াছে। শুক্র ধারণে দেহ সুপুষ্ট-বলিষ্ঠ-গোলগাল, নাতিস্থূ
নাতি কৃশ, রামেশ্বরের দৈহিক সৌন্দর্য্য অতি কমনীয় ভাবে গঠিত
স্ত্রীজাতি স্বভাবতই রূপের পক্ষপাতী, রূপ দেখিলে তাহারা পতঙ্গে
মত আগুনেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, তার উপর সেই রূপের মধ্যে যদি
আবার ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত দেখে; তাহা হইলে হিন্দু স্ত্রীলোক
ত' সহজেই মজিয়া যায়! যদি উনি সন্ন্যাসীই হন, তাহা হইলে আমিও
সন্ন্যাসিনী হইব; প্রত্যহ ধার্ম্মিক সহবাসে থাকিয়া নারী-জন্ম সফল
করিব! নির্ম্মলা ত' দরিদ্রের কন্যা নহেন, পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদি
পরিয়া বড়মানুষী দেখাইবার, ভোগসুখে মত্ত হইয়া অট্টালিকা বাসে
আকাঙ্ক্ষা ত' তাঁর আর নাই? অতি বাল্যকাল হইতে পিতৃগৃহে তাঁহার
সে আশা সমস্ত মিটিয়া গিয়াছে। কেবল ভোগের জন্য তিনি আ
এখন একটা যে-সে পাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনটা মাটী করিতে
রাজী নহেন। এখন রামেশ্বরের ন্যায় পবিত্রচেতা, সাধু-প্রকৃতি, সুঠাম
গঠন যুবকের করে আপনার জীবন-যৌবন-প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে
পারিলেই জীবন ধন্য জ্ঞান করেন। এমন স্বামীর সহিত বৃক্ষতলায় বাস
করিয়াও অতুল আনন্দ লাভ হইতে পারে।

মহানন্দ কুম্ভমেলার আয়োজন করিতেছেন। দেশদেশান্তর হইতে
কত লোক সমাগম হইবে—তাহার জন্য স্থানে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ
আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতেছেন। প্রতি বৎসর অনেক ভাগ্যবান

ব্যক্তি ইহার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করেন। মহানন্দও সে বিষয়ে ত্রুটী করেন না। এ বৎসর পিতাপুত্রে মিলিয়া কাজ করিতেছেন; কমলেশ্বর এখন ধর্ম্মপথগামী, কাজেই এ সকল কার্য্যে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ দেখাইতেছেন। সময় পাইলে পিতার সহিত নির্ম্মলার বিবাহ বিষয় লইয়া—কি করিলে কি হয়, কেমন করিয়া রামেশ্বরকে রাজী করা যায়—তাহার পরামর্শ করিতেছেন। আর ত' দিন নাই—কোন্ দিন হয় ত' রামেশ্বর হঠাৎ বাড়ী চলিয়া যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কল্প মনেই মিলাইয়া যাইবে—অতএব "শুভস্য শীঘ্রং।" মহানন্দ বলিলেন—আজই রাত্রে আহারাদির পর কথা পাড়া যাইবে এবং আগামী শুভলগ্নেই কার্য্য সমাধা করা হইবে। রামেশ্বর যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে আমার কথা বোধ হয় ঠেলিতে পারিবেন না, দেখা যাক—ভগবান কি করেন? নির্ম্মলা যখন রামেশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছে, তখন আর বিলম্ব কেন? পিতাপুত্রে সান্ধ্যভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিলেন। রামেশ্বর সেই মাত্র গৃহে ফিরিয়া সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া ভগবতীর শতনাম স্তোত্র সুর করিয়া পাঠ করিতেছেন, সে স্তবপাঠ কি মধুর, শুনিলে প্রাণ গলিয়া যায়, হৃদয় ভক্তি-রসে আর্দ্র হইয়া স্বতই তাহার সহিত সুর মিলাইয়া গাইতে ইচ্ছা করে—"ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকর্ত্রী।" বুঝি বা নির্ম্মলা দ্বিতলের বাতায়ন হইতে ভাবী ভর্ত্তার সেই সুললিত ভগবতীর স্তব পাঠ শুনিয়া আপনাপনি মুগ্ধ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন।

মহানন্দ ও কমলেশ্বর যথারীতি সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করিলে আহারের স্থান হইল। অত বড় লোকের বাড়ী দাস-দাসীর অভাব নাই, সরকার গোমস্তার বাড়ীতেই একটী ছোট খাট অফিস, সকলেই আহার করে, তথাপি মহানন্দের বাটীতে রন্ধন-কার্য্যের জন্য পাচক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা নাই।

শক্তি সাধনা।

অন্ন ভোজনেই হিন্দুর জাতীয়তা। ইহা যার তার হাতে করা যুক্তি সঙ্গত নহে—রুচিও হয় না। মহানন্দ কখনও বাটীতে পাচক রাখেন নাই, বাটীর কর্ত্রীরাই এ সকল কার্য্য সমাধা করিতেন, বড়লোকের স্ত্রী বা বধূ বলিয়া এমন একটা মহৎ-কর্ম্মে তাঁহারা অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন না। হিন্দু-স্ত্রীর এই কার্য্য মহাকার্য্য, অন্নপূর্ণার জাতি রমণীগণ যদি এ সকল কার্য্যে অবহেলা করিবেন, তবে ক্ষুধিতকে অন্ন দিবে কে, কেই বা হিন্দুর পবিত্র সংসার উজ্জ্বল করিয়া এমন মাতৃত্বে আপনার মহত্ত্ব বিস্তার করিবে? অত বড় ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও মহানন্দের গৃহে স্ত্রীলোকদের এ সকল শিক্ষা ছিল, এ সকল বিষয়ে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোককে তিনি গৃহে স্থান দিতেন না। কাজেই স্ত্রী কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ সকলেই একযোগে দৈনন্দিন এই যজ্ঞ-কার্য্য সমাধা করিতেন। এক দিনের জন্যও ঔদাস্য বোধ করিতেন না।

রাত্রে পুরুষেরা একত্র আহার করিয়া বহির্বাটীর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, অপরাপর সকলের ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইল। তখনও বৈঠকখানায় ধর্ম্মালাপ হইতেছে—রামেশ্বর এ কার্য্যে কখনই বিরত নহেন। নানাবিধ কথা-বার্ত্তার পর বৃদ্ধ মহানন্দ বলিলেন—বাবা রামেশ্বর! বহুদিন তোমাকে একটী কথা বলিব বলিব করিয়া বলিতে সাহস করি নাই কিন্তু আর না বলিলেও নয়, তুমি আমার কথাটী রক্ষা করিবে কি?

রামেশ্বর।—আপনি আমার পিতার বয়সী, এমন কি কথা যে আপনি আমাকে বলিতে সঙ্কোচ বোধ কচ্ছেন? উহা যদি আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া মহানন্দ মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—বাবা! তোমার মত সাধু-প্রকৃতি যুবককে

পাইয়া আমাদের মহা উপকার হইয়াছে, আমার পুত্রটিকে তুমি নিজ শক্তিবলে ধর্ম্মপথগামী করিয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণে আর একটী জীবকে উদ্ধার করিবে কি?

রামেশ্বর।—মানুষের শক্তি কতটুকু মুখুজ্যে মশাই! যে সে কাহাকেও নিজ শক্তিবলে উদ্ধার করিতে পারে, সমস্তই সেই মহাশক্তির শক্তি, তবে মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র; এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বলুন, ক্ষমতায় কুলায় ত' অবশ্যই করিব।

মহানন্দ।—বাবা! বহুদিন হইতে আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, কোনও স্থানে মনের মত পাত্র পাইতেছি না, আর যেখানে সেখানে আমার ঐ একমাত্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে মনও যায় না, এইজন্য কোথাও স্থির করি নাই। কন্যাটীও বড় হইয়াছে—আর রাখা যায় না, এক্ষণে বাড়ীর সকলেরই মত যদি তুমি দয়া করিয়া উহাকে গ্রহণ কর।

রামেশ্বর।—মহাশয়! ইহাতে দয়ার কি আছে, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এ রত্ন যখন দুষ্কুল হইতেও লইতে পারা যায়, তখন আপনি ত' মহদ্বংশীয়, আপনার কন্যার পাণি গ্রহণ করিব—তাহার আর বিচিত্র কি? যখন আমি সংসারী, বিবাহ আমাকে করিতেই হইবে, তখন এ বিষয়ে আমার অমত নাই। তবে আমি দরিদ্র—আপনার ন্যায় ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিলে কি সুখী করিতে পারিব?

মহানন্দ।—নির্ম্মলা আমার বড়লোকের চরিত্রহীন, দাম্ভিক পাত্র পছন্দ করে না, এইজন্য এতদিন বিবাহ হয় নাই, এক্ষণে তোমার প্রতি সে আসক্তা হইয়া পড়িয়াছে।

রামেশ্বর আজ প্রায় একমাস হইল—এবাটীর স্ত্রীলোকদের চালচলন দেখিতেছেন, বড়লোক বলিয়া ইঁহাদের কোন অহঙ্কার নাই, পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ত' নাই-ই, অথচ ইঁহারা গৃহ-কর্ম্ম করিতে, ধর্ম্ম-

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেও অনভ্যস্থা নহেন। যখন বিবাহ করিতেই হইবে, না করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না, যখন বড় লোকের মেয়ে বিবাহ করাই আমার প্রতিজ্ঞা আর মহাপুরুষ যখন এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, তখন অন্য মত করা উচিত নয়—রামেশ্বর আর কোনও কথা বলিলেন না। "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" মনে করিয়া মহানন্দ তখন পুলকিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। রামেশ্বর শয্যায় শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—তারপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

মহানন্দ বাড়ীর সকলকে রামেশ্বরের অভিমত জানাইয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। বড় বাড়ীতে বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। নির্ম্মলার এত দিনের শিবারাধনার ফল ফলিল, সাক্ষাৎ শিবতুল্য পতি প্রাপ্তির আশায় হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে খুব সমারোহে রামেশ্বরের সহিত নির্ম্মলার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নির্ম্মলার সহিত রামেশ্বরের মিলন সকলেই ঠিক শিব দুর্গার মিলন বলিয়া কত সুখ্যাতি করিতে লাগিল। যে দেখিল সেই বলিল—মেয়েটিও যেমন মোমের পুতুল—গুণের আধার, ছেলেটিও ঠিক অনুরূপ হইয়াছে—বিধাতার এ মিলন বিধির বলিহারী যাই, এমন না হইলে বিয়ে। মহানন্দ কন্যার এ বিবাহে খুব ব্যয়-বাহুল্য করিয়াছিলেন, অনেক দিন ধরিয়া এ উৎসব কার্য্যের জের মেটে নাই; কমলেশ্বর মহানন্দিত—আত্মীয়রূপে রামেশ্বরকে পাইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। নির্ম্মলা যথার্থই সৌভাগ্যবতী, নতুবা বিনা আয়াসে এমন সুন্দর পাত্র ঘরে বসিয়া পাওয়া যাইবে কেন?

আমাদের পাঠিকাগণ হয়ত' নির্ম্মলার সৌভাগ্য বিবেচনা না করিয়া দুর্ভাগ্যই মনে করিবেন, কারণ এমন অতুলনীয় রূপ, এমন সোনার যৌবন কিনা একটা বিদ্‌ঘুটে স্বভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অনভ্যস্ত,

বাবুয়ানা-বিমুখ, ইংরাজী-না-জানা. কিম্ভূতকিমাকার যুবকের করে সমর্পণ কবিল ? তার রূপই না হয় কিছু আছে কিন্তু পিতলের কাটারী - ধার কই, চাকুরি-বাকুরি করিবার মত যে লেখা-পড়া জানে না, তাহাকেও কি অমন সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করে ? বুড়ো হলে যে লোক পাগল হয়—মুখুয্যে মহাশয়ের তাই হয়েছে, এতদিন রেখে রেখে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলে গা ? কিন্তু বড়লোকের কার্য্যে ত' আর বাদ-প্রতিবাদ চলে না, কাজেই সকলে কানাঘুষা করিয়াই এ আন্দোলন পরিত্যাগ করিল। এদিকে প্রয়াগে কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে, এলাহাবাদবাসী তাহার আনন্দেই মগ্ন হইল, পরনিন্দা-পরচর্চ্চার আর সময় নষ্ট করিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রয়াগের কুম্ভমেলা অতি প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিবার সাধ কাহার না হয়? এ মেলা আরম্ভ হইতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে, জীবনে আর ঘটিবে কিনা, এত কাছে থাকিয়া এ মনোরম দৃশ্য দেখিবার আশা রামেশ্বর ছাড়িতে পারিলেন না। এ সময় এ স্থানে ত' সকল সাধু লোকেরই শুভাগমন হয়, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উদ্বোধন কর্ত্তা, প্রাণের আরাধ্য দেবতা, হরিদ্বারের সেই মহাপুরুষও বোধ হয় আসিবেন। সেদিন হাতে পাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন নাই, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুন্দর উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, নির্জ্জন গিরিগুহার সেই অন্ধকারে ভাল করিয়া সে পাদপদ্ম দেখাও হয় নাই, এখানে প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিবেন, সেবা করিয়া জনম সার্থক করিবেন, এই আশাতেই রামেশ্বর মেলার কয়দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কেবল সন্ন্যাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু কই তিনি, কোথায় তাঁহার জীবনের জীবন অবধূত প্রধান? অথবা তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষকে চিনিয়া লওয়া রামেশ্বরের ন্যায় সংসারী জীবের সাধ্য নয়— তিনি ধরা না দিলে তাঁহাকে ধরা যায় না, সেই শিবস্বরূপ অবধূত যে সাক্ষাৎ ভগবান, পুনর্দর্শন আর কি ভাগ্যে ঘটিবে?

রামেশ্বর মেলা শেষ হইবার পর মনঃমরা হইয়া দারাগঞ্জে তাঁহার শ্বশুরালয়ে ফিরিলেন। মহানন্দ বলিলেন—বাবা! মেলা দেখিতে এতই বিব্রত যে নাওয়া-খাওয়ার সময় নাই?

রামেশ্বর বলিলেন—গুরুদেবের দর্শন জন্ম যথায়-তথায় ঘুরিয়াছি, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু তাহার দর্শন পাই নাই, হয়ত' তিনি আসেন নাই ; নয়ত' আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এত লোক সমাগমের মধ্যে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় নাই।

মহানন্দ।—তা হতে পারে, এত লোকের মধ্যে একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাঁর জন্ম আর চিন্তা কি। সময় হইলেই তিনি দর্শন দানে চরিতার্থ করিবেন। মহানন্দ মনে করিলেন—এ গুরু বোধহয়—বাৎসরিক প্রণামী আদায়ের গুরু ; তাই বলিলেন—সময় হইলে দর্শন দিবেন। সাক্ষাৎ শিবতুল্য এ অবধূত যে কাণে মন্ত্র ফুঁকিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান না, তাহা মহানন্দ কেমন করিয়া জানিবেন ? গুরু সম্বন্ধে তাঁহার যেটুকু মোটামুটী জ্ঞান ছিল - তাহাই বিবৃত করিলেন। অথবা এ ব্রহ্মবাক্য, মহানন্দের ন্যায় ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের বাক্য কখনও নিষ্ফল হইবার নহে, তিনিও যে আশা দিয়াছেন—সময়ে দেখা হইবে ; ব্রহ্মবাক্য সফল করিবার জন্ম ঘরে বসিয়াও যে দেব-দর্শন হইতে পারে, ভাগ্যের কথা ত' বলিতে পারা যায় না।

লোকারণ্য মেলাস্থান ক্রমশঃ লোকশূন্য হইতে লাগিল। রামেশ্বর এইবার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবদেবী পিতামাতার দর্শনে কাশী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এতদিন শুধু পরিজনসহ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন, দারাগঞ্জবাসী সকলেই রামেশ্বরের সহবাসে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল ; এক্ষণে তাঁহার স্থান ত্যাগের কথা শুনিয়া সকলেই হৃদয়ে ব্যথা পাইল। কিন্তু পরের ছেলে ঘরে যাইবে ইহাতে বাধা দিলে শুনিবেই বা কে ? একটা অন্তরীয়তার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ত' আর তিনি এখানে চিরস্থায়ী হইবেন না, তাঁহার

ত' ঘর বাড়ী আছে; বাপ-মা ভাই-বন্ধু আছে, এতদিন রহিলেন আর কি থাকিতে পারেন? রামেশ্বরের স্থান ত্যাগের কথা শুনিয়া আর যাহার যত দুঃখ হউক, আর নাই হউক, কমলেশ্বর প্রাণে বড়ই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যে রামেশ্বরের কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পথ এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা-শুন হয় নাই, ইহার মধ্যে পথপ্রদর্শক চলিয়া গেলে তিনি যে পথহারা পথিকের মত অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন—গন্তব্য স্থানে যাওয়া যে তাঁহার ভার হইবে। এইজন্য তিনি ভগ্নীপতিকে আরও কিছুদিন তথায় থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন—ভাই! তোমাদের এখানে থাকিব তাহাতে আর এত অনুরোধ-উপরোধ কেন? তোমার পিতার নিকট আমি অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞ, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিকের সহবাসে কাল যাপন করা সৌভাগ্যের বিষয়। তবে কি জান—পিতা মাতা আমার কাশীবাসী, বহুদিন তাঁহাদের পাদপদ্ম দেখি নাই, এত নিকটে থাকিয়া যদি তাঁহা-দিগকে দর্শন না করি, তাহা হইলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে, আর তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের কাছে থাকাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ জীবনের ত' স্থিরতা নাই, আমি এই জন্যই ত' বিবাহ করিলাম। তোমার ভগ্নীকে তথায় রাখিয়া, আমাকে একবার দেশে যাইতে হইবে, তথায় দেব-সেবা অতিথি-সেবা কেমন চলিতেছে, না দেখিয়া আসিলে প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধা পিসীমাতা আর কতদিন সে ভার বহন করিবেন? শরীর অসুস্থ হইবার অছিলায় তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, আর কত দিন থাকিব? প্রায় এক বৎসর হইল তিনিও আমাকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আমার বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াও যে তাঁর অভিপ্রেত—

এক্ষণে তাঁকে সংবাদ দিয়া সুখী করাও ত' উচিত ? তুমি ভেবোনা—সময় পাইলে আবার আসিব, যে সকল উপদেশ পাইয়াছ, তাহার মত কাজ কর, জীবনে কোন ভাবনা থাকিবে না, ভগবান সকল দিক মুক্ত করিয়া দিবেন। ধর্ম্মপথগামী ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করেন—এ চিন্তা যেন সদা সর্ব্বদা মনে থাকে, তাহা হইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

বাড়ীর গৃহিণী নির্ম্মলার জননী সৌদামিনী এ কথা শুনিলেন, মন একটু খারাপ হইল বটে, মেয়েটা অনেকদিন আপনার হইয়াছিল—এইবার পরের হইল—পরের ঘর উজ্জ্বল করিতে চক্ষের বাহিরে চলিল, তবে সংসার কার্য্যে তাহার যেন খুব সুখ্যাতি লাভ হয়, নির্ম্মলার গুণে যেন সকলে মুগ্ধ হইয়া আশীর্ব্বাদ করে, মাতা কন্যার জন্য দেবতার নিকট মনে মনে এইটুকু প্রার্থনা করিলেন। শ্বশুর বাটীতে মেয়ের খুব সুযশ হ'য়েছে, সকলেই তাহাকে সোণার চক্ষে দেখিতেছে, এইটুকু শুনিলেই মায়ের প্রাণে বড় আনন্দ হয়, তিনি আর কিছু চান না। যখন বিবাহ হ'য়েছে, তখন একদিন না একদিন সে ত' পরের ঘর ক'র্ত্তে যাবেই, ইহাতে আর এত হা-হুতাশ, এত ভাবনা কি? পাত্র যখন অমন মহানুভব, তখন যেখানেই থাক, মেয়ে আমার অসুখী হইবে না। আমিও ত' খুব ছোট বেলায় শ্বশুর-ঘর ক'র্ত্তে এসে'ছিলাম—আর নির্ম্মলা ত' সেয়ানা হয়েছে, নিজের ঘর-কন্না চিনতে পারবে, তবে আর ও সকল বৃথা ভাবনাচিন্তা কেন? অত যত্ন করে—সমস্ত কাজ কর্ম্ম শিখিয়েছি, এখন মেয়ের সুখ্যাতি হ'লেই বাঁচি। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে—এত আর কিছু নূতন নয়; মেয়ে জন্মই যে শ্বশুর ঘর করিবার জন্য, পরকে আপন করিবার জন্য, তাহারাই ত' ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি! সৌদামিনী বেশী কিছু উতলা হইলেন না, কর্ত্তা মহানন্দও নহেন। কমলেশ্বরের স্ত্রী মাধুরী কিন্তু ননদীর শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া প্রাণে একটু দাগা পাইল। সে যে এ সংসারে

আসিয়া অবধি নির্ম্মলার সহবাসে কাল কাটাইতেছে, আহারে-বিহারে নির্ম্মলাই যে তাহার সঙ্গিনী, এতদিন পরে এ সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া দিতে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বহুদিন ধরিয়া যাহার সহবাসে হাসি-তামাসা, আনন্দ-উল্লাসে জীবন কাটে, তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে স্বভাবতই যে চক্ষে জল আসে, মাধুরী না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না, অন্তরালে গিয়া মনের দুঃখে চক্ষের একটু জল ফেলিল। দিদিশাশুড়ী মাতঙ্গিনী দেবী তাহাকে চুপে চুপে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন ছি দিদি! শুভ কাজে কি চক্ষের জল ফেল্‌তে আছে? ও আর যাচ্ছে কোথা, তুই এক মাস পরে আবার আন্‌লেই হবে। তুইও ত' সব ছেড়ে এখানে এসেছিস ভাই, আর ও যাবে বলে তোর এত কান্না?

মাধুরী যে কেন কাঁদিতেছে, মাতঙ্গিনী তাহা জানেন না, শুধু নির্ম্মলার জন্যই যে এ অশ্রুপাত—তাহা নহে, এ কৃতজ্ঞতার অশ্রু রামেশ্বরের জন্য, বালিকা সে অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার গুণময় ঠাকুর-জামাইয়ের জন্যই যে তাহার স্বামী-দেবতা ঘর-মুখী হইয়াছেন, আপন-পর চিনিয়াছেন, মানুষের মত মানুষ হইয়াছেন, প্রত্যহ স্বামীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া মাধুরী যে আজ আনন্দে ভোরপুর। কমলেশ্বর যেরূপ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল—যেরূপ বিজাতীয় ভাবে বিভোর হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় রামেশ্বরের মত তেজস্বী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ আসিয়া উদয় না হইলে কি, অপর কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারিত? তিনি না আসিলে হয়ত' এতদিন তাহার স্বামী বিদেশী হাব-ভাবে মজিয়া মেম বিবাহ করিতেন, কমলেশ্বর সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়া এমনি সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন। রামেশ্বর কৃপা না করিলে, এতদিন মাধুরীর অবস্থা, তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর অবস্থা, তাহাদের বংশের অবস্থা কি হইত তাই ভাবিয়া সে কৃতজ্ঞতার অশ্রুপাত করিয়া।

তাঁহাদের গমন পথ দুর্গম না করিয়া বরং মনে-প্রাণে সুগম করিয়া তুলিতেছে। মাধুরীর প্রাণের কথা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী কি বুঝিবেন? তাই অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া মাধুরীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যখন বিবাহ হইয়াছে—তখন কন্যাকে পাঠাইতেই হইবে, মহানন্দ পাঁজি পুঁথি দেখিয়া দ্বিরাগমনের দিন স্থির করিলেন। একমাত্র কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে, নানাবিধ দ্রব্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু রামেশ্বর বলিলেন—আমি এখন কোথায় থাকি—কোথায় যাই, কাশীতে পিতামাতার নিকট যাইতে হইবে, অতএব অত মহামূল্য দ্রব্যাদি লইয়া রাখিব কোথায়? তাঁহারা বাণপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন—ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত কালযাপন করিতেছেন, ও-সকল লইয়া গিয়া তাঁহাদের বিব্রত করা বইত' নয়? ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট দরিদ্রভাবে যাওয়াই বিধেয় নতুবা অহঙ্কার প্রকাশ হইবে যে। দেবতার নিকট ভক্তের পিতা-মাতার নিকট পুত্রের দীন-নম্র ভাবেই যাওয়া উচিত।

পতিও যেমনি পত্নীও তার তেমনি মেধাবিনী। এই কয়দিনের শিক্ষায় নির্ম্মলাও তদনুরূপা ত্যাগী, কষ্ট-সহনশীলা হইয়াছেন, "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" সংসর্গের দোষগুণ যাইবে কোথায়? রামেশ্বরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক স্বামীর সহবাসে এই কয়দিনের মধ্যে নির্ম্মলা তাঁহার সমস্ত গুণ অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন। নির্ম্মলাও যে বিদুষী, ধনী পিতামাতার অঙ্কে এতদিন প্রতিপালিতা হইয়া তাঁহারও যে ভোগ-বিলাসের সখ মিটিয়া গিয়াছে তবে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না কেন? তিনিও অম্লান বদনে বলিলেন—বাবা! আমাদের যৎসামান্য কিছু দাও, অত আড়ম্বরে আমাদের দরকার কি? মাধুরী অলক্ষ্যে দরজার আড়ালে থাকিয়া ননদীর কথা শুনিয়া আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, ভাবাবেশে বিভোর হইয়া বলিল—ধন্য নির্ম্মলা! স্বামী যে কি ধন, তা তুই

চিনিয়াছিস্, এই কয়দিনে এত জ্ঞান কি কারু হয়? স্বামীর সুখে সুখিনী হইয়া তুইই আদর্শ সংসার পাতিবি।

আগামী কল্য যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। আজ মহানন্দ ও সৌদামিনী প্রাণের জামাতা-দুহিতাকে আর চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেছেন না। কেবল কাছে কাছে থাকিয়া তাহাদের সহিত কত কথা, কত গল্প করিতেছেন, সে কথা - সে গল্প যেন আর ফুরায় না। সৌদামিনী আজ কত প্রকার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, ঠিক মায়ের মত ছেলেটীকে আজ এটী খাও, ওটী খাও বাবা! বলিয়া কত জিদ করিতেছেন। সৌদামিনী রামেশ্বরকে ঠিক কমলেশ্বরের মত দেখিতেন, জামাইয়ের মত লজ্জা করিতেন না। মা যেমন ছেলেকে নানাপ্রকারে উপদেশ দেন—কিসে ভাল হইবে, কিসের অনুষ্ঠান করিলে মন্দ ফল হয়, ঠিক ছেলের মত তাহা শিক্ষা দিতেছেন, রামেশ্বর অবনত মস্তকে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। হাজার শিক্ষিত হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠের বচন অগ্রাহ্য করা মহাপাপ! বয়সে দেখিয়া-শুনিয়া জ্ঞান লাভ করা যে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ঢের বেশী! মায়ে-পোয়ে যেমন কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়, রামেশ্বর বুজিয়া-সুজিয়া সৌদামিনীর একটীর পর আর একটী কথার সময় মত উত্তর দিতেছেন।

দ্বিরাগমনের দিন নিকটবর্ত্তী দেখিয়া কমলেশ্বর হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু পিতামাতা যখন বলিলেন—কমল তোমার শরীরটা কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে, তুমি নির্ম্মলাকে রাখিয়া আইস। তাহাতে কিছুদিনের জন্য তোমার স্থান-পরিবর্ত্তনও হইবে—ভগ্নীটীকে রাখিয়া আসাও হইবে। ইহাতে কমলেশ্বরের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিল, হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তবু আরও কিছুদিন রামেশ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া সংসার-পথে আপনাকে পাকাপোক্ত করিতে পারিবেন, ভাবিয়া

সুখে রজনী যাপন করিবার জন্য সকাল সকাল আপন গৃহে গমন করিলেন।

কল্য প্রাতঃকালেই বারবেলা বাদ দিয়া কন্যাজামাতাকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া আর বেশী রাত্রি করিলেন না, বৃদ্ধা দিদি শাশুড়ী নাতিনী ও জামাতাকে আগ্ বাড়াইয়া শয়ন কক্ষে রাখিয়া আসিলেন। কাল হয় কি না হয়, অদ্য বিদায়কালীন দুই একটা কষ্টি নষ্টি করিতে, নাতিনী-জামাইকে দুই একটা তামাসা করিতে তিনি ছাড়িলেন না। রামেশ্বর যেমন পারিলেন—উত্তর দিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, নির্ম্মলা অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন।

সে রাত্রে আর ঘুম হইল না, রামেশ্বর স্ত্রীকে সমস্ত সাংসারিক কথা, তাঁহার ভাই ও ভাজের কথা, একে একে বলিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা বলিলেন—তোমার সে ভাবনা কিছু ক'র্ত্তে হবে না; সমস্ত সহ্য করে নাচু হয়ে চল্‌লে রাক্ষসেও দয়া করে আর তাঁরা মানুষ হয়ে দয়া করিবেন না! তারপর নিজের কষ্টের কথা, সংসারে পরিশ্রমের কথা বলিলেন। নির্ম্মলা তাহাতেও অচল-অটল, ভয় পাইলেন না, বলিলেন—তুমি সুস্থ দেহে আমার কাছে থাকিলে জগতের কোন কষ্টকেই আমি কষ্ট বলিয়া মানি না। নির্ম্মলার প্রাণের ভাব দেখিয়া রামেশ্বর গলিয়া গেলেন, ভগবান অনুরূপা পত্নী মিলাইয়া দিয়াছেন, ভাবিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সন্ন্যাসীর কথা—দাম্পত্য প্রণয় ভাল করিয়া বুঝিয়া, বংশরক্ষার্থে পুত্র উৎপাদন করিয়া তবে স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী হইতে হয়। নির্ম্মলা! আমি গুরুর আদেশেই বিবাহ করিয়াছি, পুত্রাদি হইলে আমি যোগ শিক্ষার জন্য কিছুদিন গুরুগৃহে যাইব। নির্ম্মলা তথাপি ভীত হইলেন না, শেষ জীবনে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন, নারীজীবনের শেষ প্রার্থনা পুরণ করিবেন, দুইজনে একত্র শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে

পাইলেই আমি সুখী হইব। কেবল দৈহিক সুখ মানবজীবনের সুখ নহে, তাহা আমি তোমার মুখেই শুনিয়া বেশ বুঝিয়াছি; তবে শেষের অনুরোধ রক্ষা করিতে ভুলিও না, এই বলিয়া নির্ম্মলা স্বামীর পদধারণ করিলেন। রামেশ্বর লক্ষ্মীরূপা রমণী-রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, ইঁহার দ্বারা সাধন-ভজনের কোন ব্যাঘাত হইবে না বরং এ শক্তির সাহায্যে প্রভূত শক্তি সঞ্চার হইবে, ভাবিয়া নির্ম্মলাকে বক্ষে ধারণ করত আশ্বস্ত হইলেন।

সে রাত্রি এইরূপ আমোদ-আহ্লাদেই কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে মহানন্দ পূজায় বসিলেন, সৌদামিনী কন্যাজামাতার ও পুত্রের জন্য তাড়াতাড়ি আহারীয় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বেলা আটটার পর মহানন্দ গৃহ-দেবতার নির্ম্মাল্য আনিয়া কন্যাজামাতা ও পুত্রের শিরে অর্পণ করিলেন। তাহারা আহারাদির পর দেবতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শুভযাত্রার জন্য সকলকে যথোচিত প্রণামালিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্বশুর-বাটী যাইবার সময় স্ত্রীলোকমাত্রেই চক্ষের জল ফেলে—কাঁদে, নির্ম্মলাও কাঁদিলেন, পিতামাতা ও দিদিমার পায়ের ধূলা লইলেন। তাঁহারা সকলে সজল-নয়নে চক্ষের জল ফেলিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে করিতে স্নেহাশীষ দান করিলেন। তারপর নির্ম্মলা বৌদিদির কাছে গিয়া আবেগভরে কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ে পড়িলেন। শৈশবের সহচরী, খেলা-ধূলার সঙ্গিনীকে ছাড়িতে হইতেছে, এ সময় কি চক্ষের জল থাকে? মাধুরীও প্রাণ-ফাটা দুঃখের অশ্রু ফেলিয়া ননদিনীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে করিতে বলিল—কান্না কি ভাই! অমন দেব-তুল্য স্বামী পেয়েছ, আজীবন সেবা করিয়া নারী-জন্ম সফল কর। যখনই দেখিবার ইচ্ছা হইবে, তখনই লইয়া আসিব—ভাবনা কি? আর কোনও কথা হইল না, শুভ সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলেন, কমলেশ্বরও ভগ্নীর সঙ্গে রওনা হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতৃ-সন্নিধানে।

দেবানন্দ ও উমাকালী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল—সংসারের ভার পুত্রদ্বয়ের উপর প্রদান করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা সংসারের চিন্তা আর করেন না, সংসারের কোনও ভাবনা আর মনোমধ্যে স্থান দেন না, কেবল একাগ্র চিত্তে পরপার নিস্তারের জন্য বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইয়াছেন। বাল্যে রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ দেবানন্দ গুরুর অনুমতিক্রমে সতী উমাকালীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। সংসার ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে আপন অধীনস্থ জনগণকে প্রতিপালন করিয়া, অকাতরে দীন দরিদ্রগণকে অন্নদান করিয়া এক্ষণে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। পুত্র দুইটী উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার বংশের মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিবে, নিজের মত করিয়া সংসার চালাইতে পারিবে জানিয়া দেবানন্দ পত্নীসহ পরকাল চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন আপনার ইষ্ট চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, এখন তাঁহাদের অন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকও নাই। প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা করিয়া মাসহারা আসিতেছে, তাহাতেই তাহাদের সুখে দিন চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু আজ কয়েক মাস হইল, তাহা আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতেছে না।

ভগ্নী দাক্ষায়ণী পত্র লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেশ্বর বড়ই গোলমাল করিতেছে, আপনারা তীর্থবাসী হইবার পর সে শাশুড়ী-শ্যালক প্রভৃতিকে আনিয়া

ঘরে রাখিয়াছে, রামেশ্বরের সহিত তাহার সদ্ভাব নাই। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্য দেখিয়া আজ কয়েক মাস হইল—কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। সর্ব্বেশ্বর তাহার সমস্ত বিষয়-আশয় ফাঁকি দিয়াছে, দেব-পূজা, অতিথি-সৎকার কিছুই করে না, রামেশ্বর শিষ্য-যজমানের নিকট ভিক্ষা করিয়া এই সকল কার্য্য চালাইতেছিল কিন্তু সে গৃহত্যাগ করায় সমস্ত অচল হইয়াছে, অতিথিশালায় আর কোন অতিথি নাই, বাস্তু দেবতার সেবাও আর তেমন ভাবে হইতেছে না। সর্ব্বেশ্বর এত চাল বাড়াইয়া ফেলিয়াছে, বাজে খরচ এত করিতেছে যে তাহার মাহিনা ও খাজনা-পত্র আদায়ের আয়ে আর চলে না, কেবল দেনা হইতেছে। আমারও অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, রামেশ্বর সত্বর বাটীতে ফিরিয়া না আসিলে আমাকেও উপবাস দিতে হইবে। আপনারা বিদেশে, কয়েক মাস খরচ পত্র কিছু পান নাই শুনিয়া আমার পৈতা বিক্রয়ের এই পনর টাকা আজ পাঠাইয়া দিলাম, আর নিজ খরচের জন্য ৫৲ টাকা রাখিলাম। আপনাদের নিকট রামেশ্বরের যাইবার কথা আছে, যদি সে সেখানে যায়, সত্বর এখানে পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা দেবসেবা, অতিথিসেবা কিছুই থাকিবে না।"

দাক্ষায়ণীর পত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনিয়া দেবানন্দ আজ কয়দিন বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। পুত্রগণের অবস্থা যাহাই হউক, আমি ত' আর তাহাদিগকে পথে বসাইয়া আসি নাই, নিজ দোষে যদি কষ্ট পায়, তাহা হইলে তাহাদের অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ বলিতে হইবে কিন্তু পুত্রগণের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া যে এখন আমার গৃহদেবতার কষ্ট হইতেছে; অতিথি-শালা উঠিয়া যাইতেছে, প্রাণের ভগ্নী খাইতে পাইতেছে না—এখন কি করা যায়? কাছের পথ হইলে না হয় একবার যাইতাম কিন্তু তাহাও ত' নয়, আর হাতে টাকা-কড়িও নাই—এখন উপায় কি?

দেবানন্দের মত লোক এত ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আজ কয়েক দিন হইল—সংসার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। হায় রে মায়া! কি করিবেন, কি না করিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। স্বামীর চাঞ্চল্য দেখিয়া পত্নী কোথায় স্থির থাকিতে পারে? উমাকালীও পুত্রদ্বয়ের বিশেষতঃ সর্ব্বেশ্বরের মস্তিভ্রম দেখিয়া বড়ই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন—পূজাহ্নিকে তাঁহারও চিত্ত আর তত স্থির হইতেছে না। এখন বুঝিতেছেন—সমস্ত ভার সর্ব্বেশ্বরকে না দিয়া কতক ভার রামেশ্বরকে দিলে কখন এমন হইত না কিন্তু এখন আর উপায় কি, আর সেই বা গেল কোথায়? ইত্যাদি চিন্তায় পতিপত্নীর প্রাণ বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। হা বিশ্বেশ্বর! কি করিলে প্রভু! পরকালে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা হইতেও কি আমাদের বিরত করিবে ঠাকুর? এত চেষ্টা করি—আর ও সকল অসার চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিব না—সেখানে যাহা হয় হউক, কিন্তু ঠাকুর তাহাত' হয় না—প্রাণ ত' সে ভাবনা ছাড়িতে চায় না? অন্ন চিন্তায় আমি তত অধীর নই, গৃহদেবতার সেবার চিন্তা আর দাক্ষায়ণী ভগ্নীর চিন্তাই যে এখন আমার বড় হইয়াছে; বিশ্বনাথ! কি করি ঠাকুর---এ চিন্তসাগরে কি আর কূল পাইব না, টাকা কয়টী যাহা আসিয়াছিল—তাহাও ত' ফুরাইতে চলিল। আজ প্রাতঃকালে দেবানন্দ সস্ত্রীক বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার পূজাদি শেষ করিয়া গৃহে আসিয়া কেবল আপনাদের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন, অনবরত আপনাদের পরিণাম ভাবিয়া দুইজনে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন।

এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া তাহাদেরই দরজায় লাগিল। দেবানন্দ মনে করিলেন—কোন ব্যক্তি হয়ত' নূতন কাশীবাস করিবার জন্ম আগমন করিয়াছে। দেবানন্দের বাসা বাঙ্গালীটোলার কোন নিভৃত গলিতে। যে কখনও না আসিয়াছে—তাহার চিনিয়া লইবার কোনও

উপায় নাই—তবে কাশীর শকট চালককে গলির নাম-নম্বর বলিয়া দিলে তাহারা সহজেই লইয়া আসিতে পারে। গাড়ী থামিলে পর একটী গেরুয়াধারী যুবক নামিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল,—একটী লালপাড় গেরুয়া সাড়ী পরিহিতা পরমাসুন্দরী যুবতী তাঁহার পশ্চাতে, পরে একটী পরমসুন্দর সাদা ধুতি-জামা পরিধারী যুবক তাহার অনুগমন করিল।

তখন বেলা প্রায় দশটা। আহারাদির যোগাড়ে মন না দিয়া দেবানন্দ ও উমাকালী মুখোমুখী হইয়া আপনাদের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন। দেবানন্দ বলিতেছেন—উমা! দেখছ অদৃষ্টের হাত কেহ এড়াইতে পারে না? তুমি যে অদৃষ্ট মান্‌তে না; এখন দেখ, ছেলে উপযুক্ত হ'লেই কি হয়, সৎপুত্র ও অসৎপুত্র ত' আছে?

উমাকালী বললেন—সর্ব্বেশ্বর যে দু'ছেলের বাপ হয়ে, শেষে এমন কর্ব্বে তা কে জানে বলো! দুইজনে এইরূপ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে উমাকালী যেমন দ্বারের প্রতি চাহিয়াছেন, অমনি সম্মুখে তিনটী প্রাণী উপস্থিত। বহুদিন না দেখিলেও পুত্রের মুখ জননী কোথায় ভুলিয়া যান? মুখ দেখিয়া শশব্যস্তে বলিলেন—এই যে আমার রামেশ্বর আসিয়াছে, ঠাকুঝী ত' ঠিক লিখেছিলেন। দেবানন্দও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। পিতা-মাতাকে সুস্থদেহে দেখিয়া রামেশ্বরের প্রাণ ভক্তিরসে ভরিয়া গেল—ধূলায় লুটিয়া জনক-জননীর পদবন্দনা করিলেন। তাঁহারা তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। নির্ম্মলাকে আর বলিয়া দিতে হইল না—তিনি সেই দেবকল্প তেজস্বী শ্বশুর শাশুড়ীর পদে মাথা রাখিলেন,—তারপর কমলেশ্বর তাঁহাদের পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন।

দেবানন্দ রামেশ্বরের নিকট কমলেশ্বর ও নির্ম্মলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রামেশ্বর বলিল—ইনি আপনাদের দাসী, আর যুবকটী উহারই

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—বলিয়া পরিচয় দিলেন! উমাকালী সেই চাঁদপারা অনিন্দ্য সুন্দরী বধূকে দেখিয়া আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—বউ-মা আমার, সংসারের লক্ষ্মী আমার, কি আশীর্ব্বাদ করিব মা, তবে আমার চুলের মত তোমাদের পরমায়ু হউক; আজীবন পতি সুখে সুখিনী হও। এই বলিয়া মুখচুম্বন করিলেন। দেবানন্দও বধূর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কন্যার মত সেই নবনীতনিন্দিত কোমল গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারপর কমলেশ্বরকে বসিতে আসন দিলেন। কমলেশ্বর—আহা থাক্ থাক্ আপনি—বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—তারপর দাওয়ার নীচে পা ঝুলাইয়া আসনে বসিলেন।

এত সাধ্য সাধনা করিয়াও যে রামেশ্বর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় নাই, সে আজ স্বইচ্ছায় এমন সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। কোথায়, কাহার কন্যা, কেমন করিয়া বিবাহ হইল—প্রভৃতি সমস্ত প্রশ্ন দেবানন্দ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রামেশ্বর গোঁড়া হিন্দু—ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান—সে যে না বুঝিয়া কোন অঘরে বিবাহ করিয়াছে—তাহা বোধ হয় না। তথাপি তিনি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, রামেশ্বর হরিদ্বারের পথে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

পরে কমলেশ্বর ভাল করিয়া তাহাদের বংশ পরিচয় দিলেন। রামেশ্বরও যাহা জানিতেন—অবস্থাপন্ন মহানন্দের ধর্ম্মভাব ও ন্যায়নিষ্ঠার কথা পিতামাতার নিকট কতক কতক বলিলেন। বৃদ্ধ শুনিয়া আপ্যায়িত হইলেন এবং মনে মনে পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বেলা অনেক হইয়াছে—গাড়ীতে পুত্র, পুত্রবধূ এবং বেহাইপুত্রের ভোজনাদি কিছুই হয় নাই—উমাকালী রন্ধন কার্য্যের জন্য তাহাদের সেই ক্ষুদ্র পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলা যেন এই এক ঘণ্টায় মধ্যে সমস্ত চিনিয়া লইয়াছেন; তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বলি-

লেন—মা! দাসী যখন কাছে এসেছে, তখন ত' আমি আপনাকে রাঁধিতে দিব না। আমি নিজেই রাঁধিব—তবে আপনার পাকা হাতের রান্না আর আমার কাঁচা হাত; ভাল হইবে কি না তাহা বলিতে পারি না।

বড়লোকের মেয়ে বলিয়া প্রথম দিন একেবারেই রন্ধনকার্য্য করিতে দিতে উমাকালী ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কমলেশ্বর দাওয়ায় বসিয়াছিলেন, বলিলেন, মা আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? আমাদের বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণের রান্না চলে না, বাবার সে বিষয় বড় কড়া হুকুম; দিদিমা, না হয় আমার স্ত্রী আর সময় পাইলেই নির্ম্মলাই গৃহের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করে—দাস দাসীরা বাহিরের কাজ করে, রন্ধনশালায় তাহাদের যাইবার অধিকার নাই। ও বেশ রাঁধিতে পারিবে, কেন আপনি ভাবছেন? নির্ম্মলা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঠিক অন্নপূর্ণার ন্যায় হাসিয়ালে উপবেশন করিলেন। উমাকালী মনে করিতে লাগিলেন—মায়ের আমার রূপ যেমনি, গুণ তেমনি—নামটিও কি তেমনি। ভগবান্ যাহাকে ভাল করেন, তাহার কি সব ভাল? বড় বউ এইবার জব্দ হবে, সে আদৌ হাসিয়ালে আসিতে পারে না। এইবার ছোট বউয়ের কাছে নীচু হতে হবে।

সেই কষিত কাঞ্চনের মত বর্ণ, অগ্নির উত্তাপে আরও রক্তবর্ণ ধারণ করিল—বদনে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিতে লাগিল, বাতাসভরে চূর্ণ কুন্তল গুচ্ছগুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া মরি মরি—কি সুন্দর শোভাই ধারণ করিল যেন রক্ত কোকনদে ভ্রমর বসিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতেছে। নির্ম্মলা সেই চুলগুলি এক একবার সরাইয়া দিতেছেন দেখিয়া উমাকালী বলিলেন—বউ মা! কর্ত্তা ছেলেকে ও তোমার ভাইকে নিয়ে বাহিরে গেছেন—এইবার তুমি একটু বাহিরের দাওয়ায় বসো—ঘেমে যে ত্রিখণ্ডি হচ্ছো। একটু বাতাস লাগাও, না হয়—ঐ পাখাখানা আছে—নাও, আমি একটু

দেখি, একি আর ঘর মা, যে সোমত্ত মেয়ে বসে রাঁধতে পারবে—এ চোর কুঠারীর ভেতর ঘেমে ত' উঠবেই ?

নির্ম্মলা বলিলেন—মা! আমাদের ত' এ আরামের বয়স নয়, এখন আমাদের খাটবারই সময়—আপনি বরং একটু বাহিরে গিয়ে আরাম করুন, আমি যখন এত বড় বউ ঝি রয়েছি, তখন আপনাকে কিছুতেই খাটিতে দিব না। নির্ম্মলা সেই দিন হইতে সংসারের সমস্ত ভার লইলেন, বৃদ্ধা শাশুড়ীকে আর কুটা নাড়িতে দিলেন না। বড়লোকের ঘরে এমন কর্ম্মঠ-নিরহঙ্কারী মেয়ে কি থাকে ? উমাকালী অবাক্ হইয়া গেলেন।

এদিকে বাহিরে দেবানন্দ দাক্ষয়ণীর পত্র দেখাইয়া সর্ব্বেশ্বরের গুণের কথা সমস্ত রামেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন। রামেশ্বর সমস্তই জানিতেন, তিনি গৃহত্যাগ করিলে সমস্তই যে ছন্নছাড়া হইয়া যাইবে—তাহা তিনি জানিতেন কিন্তু জ্যেষ্ঠের কুনাম আর বংশের কলঙ্ক তিনি আর শুনিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—তথাপি পিতামাতার কাণে এ সকল কথা তুলিয়া তাঁহাদের তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইবেন না—যাহা হইতেছে হউক ; কিন্তু তাঁহারা যখন পূর্ব্ব হইতেই এ কথা শুনিয়াছেন—তখন আর কি করিবেন। বহুদিনের পর পিসিমাতার পত্রে দাদার দুর্ব্য· বহারের কথা শুনিয়া তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—বাবা! আপনার ও সকল বিষয়ে কাণ দিয়া মন খারাপ করিবার দরকার নাই—আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে - আপনারা যাহা করিতেছেন—নিবিষ্টচিত্তে তাই করুন। আমি যখন আসিয়াছি, তখন আর চিন্তা নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে দেশে যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। মাসিক টাকার জন্য কোন ভাবনা হইবে না, আমি যেখান থেকে পারি—প্রতি মাসে ঠিক সময়ে উহা পাঠাইয়া দিব।

তারপর আহারাদি করিয়া মাতা, বধূ, পিতা, পুত্র ও শ্যালক একত্রে বহু দিনের কত সুখদুঃখের কথা হইতে লাগিল—তাহা বুঝি আর ফুরায় না।

এইরূপে সন্ধ্যা হইল—রামেশ্বর, কমলেশ্বর ও কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার আরতি দেখিতে গেলেন। ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া উমাকালীও প্রাণের বধূর সহিত এ আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ববাসে।

কয়েক দিন পিতামাতার সহিত কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া রামেশ্বর দেশে যাইবার মনস্থ করিলেন। সর্ব্বেশ্বর সেখানে সমস্ত নষ্ট করিতেছেন, অতিরিক্ত খরচ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন—তথাপি চৈতন্য নাই; এইবার দেনার দায়ে কবে সমস্ত বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইবে। সব যাক, সর্ব্বেশ্বর সমস্ত নষ্ট করুন; রামেশ্বর বড় ভ্রাতাকে তাহার জন্য কিছু বলিবেন না,—বলিলে কথাও থাকিবে না, কেবল মনোমালিন্য বাড়ান হইবে মাত্র। তবে পিতার কীর্ত্তি সেই অতিথিশালাটী যাহাতে বন্ধ না হয় এবং পিতামাতা যতদিন জীবিত আছেন, কাশীবাস করিতেছেন—তাঁহাদের মাসহারা বন্ধ না হয়, এইরূপ বন্দোবস্ত তাহাকে করিতেই হইবে। যাহার এত বিষয়—আজীবন যিনি এত টাকা রোজগার করিয়াছেন—শেষদশায় তাঁহাদের জীবিকার জন্য ১৫৲ টী করিয়া টাকা পাইবেন না? রামেশ্বর নিজের জন্য দাদাকে কিছুই বলিবেন না;—তাহাকে বিষয়ের অংশ না দেন বা ফাঁকি দেন—অম্লানবদনে সহ্য করিবেন; কিন্তু পিতামাতার মাসহারা ও অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত তাঁহাকে করিতেই হইবে।

কাশীতে আসিয়া পিতামাতা যদিও ধর্ম্মকর্ম্মে বেশ স্ফূর্ত্তি যুক্ত আছেন তথাপি শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জগতে জন্মাইলে মৃত্যু ত' আছেই—এর হাত ত' কেহ এড়াইতে পারে না; তবে অকালে ইহ-সংসার ত্যাগ করিলে পাপেই তাহার জীবন ক্ষয় হইয়াছে—বুঝিতে হইবে।

শক্তি-সাধনা।

দেবানন্দের বয়স হইয়াছে,—প্রায় শতেকের কাছাকাছি ; উমাকালী তাঁহা হইতে দুই তিন বৎসরের ছোট ; আর কয়েক বৎসর বাঁচিয়া মৃত্যু হইলে—তাহাকে অকালমৃত্যু বলে না, কলিতে ইঁহাদের মত পরমায়ু পায় কে ? ব্রহ্মচর্য্যে ভিত্তি পাকা ছিল বলিয়াই দেহ-হর্ম্ম্য এত সুদৃঢ় ছিল—ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ; সাংসারিক ঝড়-ঝাপটে কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই কিন্তু এইবার যেন মলিন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা সেরূপ কোন কষ্ট প্রকাশ করেন না ; তথাপি ব্যথার ব্যথী পুত্র তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। পিতামাতার নিকট দেশে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন ; তাঁহারা অনুমতি প্রদানে কাতর হইলেন না কিন্তু বলিয়া দিলেন—যত শীঘ্র পার সর্ব্বেশ্বরকে লইয়া একবার এখানে চলিয়া আসিও, আমি তাহাকে সংসার বন্দোবস্তের বিষয় কিছু বলিব বলিয়া মনে করিয়াছি। পিতামাতাকে আর একাকী রাখা ভাল নয় ; সেবার জন্য একজন কাছে কাছে সর্ব্বদা থাকা উচিত, এইজন্য নির্ম্মলাকে রাখিয়া যাইবার জন্য তিনি তাঁহাকে বলিতে গেলেন। কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিতে হইল না—রামেশ্বরকে দেখিবামাত্রই তিনি বলিলেন —দেখ, তুমি দেশে যাইয়া যত শীঘ্র পার বড়ঠাকুরকে লইয়া এস ; আমি বাবা-মার সেবা করি—নতুবা তাঁদের বড় কষ্ট হইবে—এই বৃদ্ধ বয়সে আর হাত পুড়াইয়া খাইতে বা গৃহকর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে না তাহা হইলে আমাদের মহাপাপ হইবে। রামেশ্বর মনে করিয়াছিলেন—নির্ম্মলা হয়ত' এখানে থাকিতে রাজী হইবে না, এক্ষণে স্ত্রীর কথা শুনিয়া তিনি আনন্দে গলিয়া গেলেন—যাহার দেহ-অঙ্গনে এত রূপের রাজত্ব বিস্তার ; ভিতর কি তাহার একেবারে অন্ধকারময় হইতে পারে ? রূপ যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ—বাহ্যিক এত রূপের ছড়াছড়ি করিয়া অন্তর গুণময় না করিলে তাঁহার কারীগরির বাহাদুরী কোথায় ; অল্পবয়সে তাহার

এত ধর্ম্মভাব—বয়স হইলে সে ভাব যে আরও বৰ্দ্ধিত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া, পিতামাতার পদধূলি লইয়া রামেশ্বর সেই দিনই স্বদেশ যাত্রা করিলেন। শীঘ্র যখন চলিয়া আসিবেন —তখন কমলেশ্বরও তাঁহার সহিত গমন করিলেন। হাওড়া জেলায় তাহার ভগ্নীপতির বাড়ীটা একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি; পিতামাতা জিজ্ঞাসা করিলেও ত' বলিতে পারিবেন ?

দেশে যাইবার সময় তাঁহারা এখানকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কমলেশ্বরের পরিচিত একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে তাঁহাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়া গেলেন। কাশী ক্ষেত্র ধর্ম্মেরও যেমন—অধর্ম্মেরও তেমনি; আর স্ত্রীলোকের মোহটাই মানুষের বড় বেশী; বুড়া বুড়ির প্রতি কেহ ফিরিয়াও দেখিবে না কিন্তু মোহময়ী যুবতী নির্ম্মলা যে এখন তাঁহাদের কাছে রহিল—বন্দোবস্ত না করিলে কি হয় ?

রামেশ্বর যাইবার সময় পিতাকে বাসা খরচ দিয়াছিলেন—বৃদ্ধ তাহার দ্বারাই সংসার চালাইতে লাগিলেন—কিন্তু নির্ম্মলার তাহাতে মন উঠিত না, তিনি গোপনে অপর স্ত্রীলোকের দ্বারা ভাল ভাল খাবার আনাইয়া পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিতেন। বধূমাতার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা কৃত্রিম বিরক্তির সুরে বলিতেন—তুই বেটী এবার আমাদের মারবি দেখছি,—এত বয়সে কি এরূপ গুরুপাক খাদ্য সহ্য হয় ? কি সহ্য হয়, কি না হয়—নির্ম্মলা তাহা বুঝিতেন।

দেবানন্দ ও উমাকালী প্রায় সমস্ত দিনই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। ভোর চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর মণিকর্ণিকার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিতেন ; আপনাদের মনের অভিলাষ প্রাণের ভাষায় তাঁহাদের চরণে ব্যক্ত করিয়া ঘরে আসিতেন। দেবানন্দ প্রত্যহ এক এক অধ্যায় গীতা ও চণ্ডীপাঠ

করিতেন, নির্ম্মলা এ সময়ে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে ছাড়িতেন না। স্বামীর নিকট তিনি গীতা ও চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছেন কিন্তু ইহা বুঝি তাহা হইতেও মধুর। তারপর তাঁহাদের জলযোগ করাইয়া রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইতেন। নির্ম্মলা যখন পাক করিতেন—উমাকালী এক একবার বধূর নিকট আসিয়া বসিতেন—এক একবার উঠিয়া যাইয়া স্বামীর নিকট বধূমাতার গুণগান করিয়া চুপে চুপে বলিতেন—যথার্থ ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, এমন বউ না হলে কি বউ, বুকে রাখ্‌লে বুক ঠাণ্ডা হয়। রাম যে এতদিন বিয়ে ক'র্ত্তে চায়নি তা এর জন্তেই বটে, এতদিন থেকে থেকে বাবা আমার বেশ বউ এনেছে, যেন লক্ষ্মী ঠাকুরুণ! দেবানন্দ পত্নীর কথায় হাসিয়া বলিতেন—তোমার বেশ মনে ধরেছে ত'; বড় বউয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে কত কথা বলতে, আমার দোষ দিতে, এবার আর কিছু বল্‌বার নাই ত'? উমাকালী বলিতেন—না গো! তোমার আশীর্ব্বাদে এবার বউয়ের সুখ খুব হয়েছে; ঐ কচি মেয়ের কত জ্ঞান বুদ্ধি দেখেছো,—যেন একটা পাকা গিন্নী, সব দিকেই নজর; কিছু বাদ যায় না।

দেবানন্দ। ঘরোয়ানা ঘরের মেয়ে হইলেই ঐরূপ হয়—বাপ মা ভাল, গোড়া থেকে শিক্ষা ভাল হয়েছে, আর কি? এই জন্ম মেয়ে আন্‌তে হলে, ভাল ঘর থেকেই আনা উচিত, অন্য কিছু হউক আর নাই হউক?

উমাকালী। নাই হক কেন, বেহাই ত' অনেক টাকা দিয়েছেন,—পথে কোন বিপদ হয় বলে, রাম নিয়ে আসে নি?

দেবানন্দ। তোমার রাম ত' আর বোকা ছেলে নয়; রাম জানে ধর্ম্ম আগে তারপর অর্থ! এই জন্য ওর অনাটন কখন হয় না। বড়টা যে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই মানে না, তাই অত টাকা রোজগার করেও হা হা দৈ দৈ আর ঘুচলো না।

উমাকালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—যেমন বরাত; চেষ্টার ত' ক্রটী করো নি; অজস্র টাকা ত' শিক্ষার জন্য খরচ করেছো; এর জন্যে বরং কিছুই করো নি—নিজের কাছে রেখেই যা হ'য়েছে!

দেবানন্দ। উমা, তখন বুঝ্তে পারি নি—মনে করেছিলুম—এখন ইংরেজের রাজত্ব, আর ইংরাজী শিক্ষার একটা হুজুগ উঠেছে, সকলের ছেলেকেই ইংরাজী শেখাচ্ছে—আমিও শিখাই, ব্রাহ্মণের ছেলে যে এতে এত বিগ্ড়ে যায় - তাত জানিতাম না - তা হ'লে রামেশ্বরের মত কাছে রেখে শাস্ত্র শিক্ষাই দিতাম।

উমা। যা হবার তাত' হয়ে গেছে, আর ত' উপায় নাই;—এখন এখানে এলে একবার ভয় মৈত্রতা দেখিয়ে ভাল ক'রে বুঝাও, নতুবা আর ক'দিন বা'চবো; বড় ছেলেটাই ঐ রকম ক'রে নষ্ট হ'য়ে যাবে?

দেবানন্দ। সবই অদৃষ্ট উমা, সবই অদৃষ্ট; তাহার উপর মানুষের কিছুই হাত নেই—এখন এলে ত' হয়—সে কি আস্বে?

উমা। গতিক তাই—রামের কথা শুনে সে যে আস্বে বলে ত' বোধ হয় না—সে যে নিজের মদগর্ব্বেই মত্ত; তার কথা শুনে সে কি আস্বে? দু' ভেয়ে যে সাপে নেউলে।

দেবানন্দ। ছেলেবেলায় ত' অমন ছিল না—রামকে না দিয়ে সে কিছু খেতো না। বড় হ'য়ে বিয়ের পর বউটা হ'তেই সব গোলমাল হ'য়ে গেলো। বংশটা ভাল নয় কিনা—তখন দরিদ্রকে দায় উদ্ধার ক'র্তে গিয়ে অমন হ'লো।

উমা। সবই যে বরাত তাতে আর ভুল নাই—বাবা বিশ্বেশ্বর এখন তাকে সুমতি দিন, দুটী ভায়ে—দুটী বউয়ে মিলে-মিশে ঘরকন্না করুক আমরা দেখে যেতে পার্লেই সুখ।

দেবানন্দ। না পার্‌লেই বা অসুখ কিসের উমা, স্ব স্ব কর্ম্মফল ত' নিজেকেই ভোগ ক'র্‌তে হবে?

উমা। তাতো হবে—সেই জন্তেই ত' এমন হ'চ্ছে; কর্ম্মফলের কি খণ্ডন নাই কর্ত্তা?

দেবানন্দ। নাই বল্‌লেই হয়—কারও হয় নাই—তবে উৎকট তপস্যায় কতকটা শান্তি হয়—অনুতাপ আসলে বন্ধ হ'য়ে যায় আর যোগান দেয় না।

উমা। এবার সর্ব্বেশ্বর এলে তাকে ভাল ক'রে তাই বুজিয়ে-সুজিয়ে বল, নতুবা সে যেরূপ মেতেছে, তাতে ভবিষ্যৎ বড়ই খারাপ।

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উমাকালী ছোট বউয়ের নিকট রন্ধনশালায় গেলেন। মা যে স্নেহময়ী পুত্রের মঙ্গলচেষ্টা যে তাঁহার হাড়ে হাড়ে গাথা—ভাবনা হবে না ত' কি? বৃদ্ধ কিন্তু সার ভাবিয়াছেন—কপাল ছাড়া পথ নাই। তবে সে আসিলে আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইবেন, পিতার কর্ত্তব্য পালন করিবেন—কিন্তু সর্ব্বেশ্বর আসিবে কি? তারপর নির্ম্মলা আহার করিতে ডাকিলে—বৃদ্ধ উঠিয়া গেলেন।

রামেশ্বর শর্মা কেসহ দেশে আসিয়া দেখিলেন সংসারই ছোড ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, বাটীর আর সে শ্রীসৌন্দর্য্য নাই। দাদা এখন প্রায়ই কলিকাতায় থাকেন, পল্লীর জল-হাওয়া এখন আর তাঁকে ভাল লাগে না। গৃহে তড়িৎ ঘোষ আর মহিমের রাজত্ব হইয়াছে, তাহারা যা করে—তাই হয়, যা না করে—কিছুতেই তা হ'তে পারে না। মহিমের সহিত রামেশ্বরের সদ্ভাব নাই, একপ্রকার তাহার প্রভুত্বেই তিনি দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আসিয়া আবার তাহাকেই কর্ত্তারূপে দেখিতে হইল? তড়িৎ ঘোষ তাহার বাপের আমলের গোমস্তা, বহুদিন পরে ছোটবাবুকে দেখিয়া সে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসিয়া পায়ের ধূলা লইল এবং এক পা

হাসিয়া বলিল—কতদূর অবধি বেড়িয়ে এলেন ছোট বাবু—অনেকদিন গেছলেন—শরীর এখন বেশ ভাল হ'য়েছে ত' ?

রামেশ্বর। হাঁ তড়িৎ! শরীর সেরেছে বটে, তবে এখানে এসে যা দেখছি, তাতে বোধ হয় আবার পালাতে হবে ? দাদার গতিক কি ?

তড়িৎ। তিনি এখন কল্‌কাতাতেই থাকেন, সময়ে সময়ে বাড়ী আসেন, এই সপ্তাহে আস্‌বার কথা আছে।

রামেশ্বর। এর কারণ কি, হঠাৎ এ মতি হ'লো কেন ?

তড়িৎ। এখানকার জল হাওয়া সহ্য হয় না; আর প্রত্যহ যাওয়া-আসা ক'র্ত্তেও কষ্ট হয়—এইজন্য এই ব্যবস্থা হ'য়েছে।

রামেশ্বর। নিজে থাক্‌লেই হ'তো, সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী এলেই গোল চুকে যেতো। এমন ত' অনেকেই করে। তা না ক'রে বাপ-পিতামোর বাস্তু অন্ধকার করে—সকলকে নিয়ে যাওয়া, বংশের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ ক'রে দেওয়া কি ভাল হ'য়েছে ?

রামেশ্বরের কথা শুনিয়া মহিম প্রাণে প্রাণে চটিতেছিল কিন্তু এখন ত' আর দিদি কাছে নাই যে, তাঁহার জোরে ছোট বাবুকে দু-কথা শুনাইয়া দিবে, পাছে কোনরূপ অপমান হইতে হয় বলিয়া মহিম সামলাইয়া গেল।

তড়িৎ। তা বটে, তবে তাঁর শরীরটা যে খুবই খারাপ হ'য়েছিল—তা সকলেই জানে, এইবার তিনি এলে আপনি বুঝিয়ে বলুন না।

কমলেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এধার ওধার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ বাড়ীতে না থাকায় গৃহাদি নষ্ট হইয়াছে—তবে ইঁহারা যে পল্লীগ্রামের বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ—তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যথার্থ যে একটা সঙ্গতিপন্ন ধার্ম্মিকের বংশ সে কথা আর কেহ না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। কমলেশ্বর একটু অন্তর হইলে তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল—ও লোকটী কে ছোট বাবু! রামেশ্বর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

তড়িৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—তবে আমরাই বুঝি ফাঁকি প'ড়লাম, মিষ্টিমুখ ত' হ'লোই না, বউদিদিকেও দেখ্‌তে পেলাম না।

রামেশ্বর। কি ক'র্‌ব ভাই! যাঁদের সেবার জন্য বিবাহ করা, তাঁদের কাছে রেখে এসেছি, বাবার মার শরীর বড় খারাপ হ'চ্ছে; দাদা-বউদিত' দেখ্‌লেন না—কাজেই আমি আর কি করি বলো—বাপ মাকে সুখী করাত' দরকার? "তার আর কথা আছে"—বলিয়া তড়িৎ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল, রামেশ্বর পিসীমাতার কাছে আসিয়া বসিলেন।

বহুদিনের পর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাইয়া দাক্ষায়ণী আনন্দে অধীর হইলেন। কি খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, তাহার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর তাঁহার হাড়ির হাল করিয়াছে, খরচপত্র কিছু না দিয়া কষ্টের একশেষ করিয়াছে, তথাপি স্নেহাপ্লুত স্বরে বলিলেন—"বাবা! যতদিন বেঁচে আছি, আর তোরা দুভেয়ে আমার কাছ-ছাড়া হ'স্‌নি, সর্ব্বেশ্বর এলে তাকেও বল্‌বো, আর বিদেশে থাকুতে দিব না।"

আজীবন ভ্রাতার গৃহে প্রতিপালিতা বাল-বিধবা দাক্ষায়ণী সমস্ত প্রাণটুকু দিয়া যে ইহাদের আলয় আশ্রয় দেখে, ইহারা কি তাঁর পর? বহুদিনের পর ভগ্নীপতি গৃহে আসিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত নানা কথা-বার্ত্তায় মত্ত; তাঁহাকে ত' কেহ চিনে না, তাই কমলেশ্বর কোথাও না বসিয়া এখনও বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। দেবানন্দের ভদ্রাসন যে একটা জগৎ জোড়া, এখনকার মত সঙ্কীর্ণ নয় ত'?

অপরিচিত যুবকটীকে দেখাইয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন—যে ছেলেটী তোর সঙ্গে এসেছে, ও কে বাবা?

রামেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোমার কথা ফলেছে পিসী-মা! তোমার কথাই ফলেছে।

দাক্ষায়ণী। তুই কি বল্‌ছিস্ রে—তবে কি তুই বিয়ে ক'রেছিস্—ও কি তবে তারই কেউ হয় ?

রামেশ্বর। হাঁ পিসী! ও আমার শ্যালক।

দাক্ষায়ণী। আহা বাবা! বেশ বেশ, দিব্যি ছেলেটী, বউমাকেও তবে ওরই মত দেখ্‌তে হবে? আহা, কুটুম্বর ছেলে সমস্ত রাত জেগে এসেছে ডাক্, ডাক্, স্নান-আহ্নিক ক'রে, পূজো-টুজো সেরে, খা দা! আচ্ছা রাম! বউমাকে কবে আন্‌বি ?

রামেশ্বর। সঙ্গেই আন্‌ছিলাম, এখন কাশীতে মার কাছে রেখে এসেছি, তাঁদের শরীর দিন দিন বড় খারাপ হ'চ্ছে, আর একলা রাখা ভাল নয়, কাজেই রেখে এলাম, বাবার কাছে তোমার চিঠি পড়ে আরও দৌড়ে আস্‌তে হ'লো, দাদাকে নিয়ে আবার শীগ্‌গীর সেখানে যাব, দাদাকে একবার তাঁরা দেখতে চেয়েছেন।

দাক্ষায়ণী। তবেই হ'য়েছে, সে কি আর সে রকমের ছেলে বাবা। বাপ-মার জন্যে ত' তার ঘুম হয়নি, তবে দেখ্ যদি বলে-কয়ে পারিস্! হ্যাঁরে রাম! তবে দাদা ও বউয়ের অবস্থা খারাপ নাকি? বলিয়া দাক্ষায়ণী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

রামেশ্বর। এখনও সেরূপ হয় নাই, তবে জীবনের কথা ত' বলা যায় না, শরীর ক্রমশঃ খারাপ ত' হ'চ্ছে ?

দাক্ষায়ণী। তাতো বটেই, আমি তাঁর চেয়ে কত ছোট, আমারই প্রায় কুড়ি-একুশ গণ্ডা হ'লো বাবা, তাঁরা এখনও কিছুদিন বেঁচে থাকুন; আমি যেন তাঁদের বলাই নিয়ে শীগ্‌গির যাই, অনেক দিন এয়েছি বাবা, আর বাঁচতে সাধ নেই। সদুঃখে এই কথা বলিয়া তিনি আহারাদির যোগাড় করিতে উঠিয়া গেলেন।

রামেশ্বর। পিসীমা! এত আর তোমায় আমার ঘরের কথা নয়—

যে বল্লেই যাওয়া হবে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হ'লে, আয়ু-বায়ু না ফুরালে কার সাধ্য নিয়ে যায়, আর তোমার এত মরবার সাধ কেন পিসী ? এই বলিয়া রামেশ্বর কমলেশ্বরকে লইয়া নিজের কক্ষে গেলেন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া স্নানাহ্নিক ও পূজাদি সমাপন করিলেন। দাক্ষায়ণী ইতিমধ্যে সমস্ত পাকাদি করিয়া দিলেন—ভোজনের পর দুইজনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা দাক্ষায়ণী ক্ষমতানুসারে বাটীর কিছুই নষ্ট করিতে দেন নাই. গৃহ-শয্যা সমস্তই পূর্ব্বের মত ফিট্‌ফাট্ রাখিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর কমলেশ্বর বলিলেন—ভাই। পল্লীজীবন বেশ সুখকর, তোমরা বেশ সুখে থাক দেখছি। সহরে এমন সুখ মেলা ভার।

রামেশ্বর। ভাই ! যে যেমন বুঝে, বেশী দিন থাক্‌লে আবার কারো কারো বিতৃষ্ণা বোধ হয়, এই আমার দাদারই দেখো না।

কমলেশ্বর। তাইত'! এমন সুখ তাঁর ভাল লাগে না ?

রামেশ্বর। কই আর লাগে, এখন আসুন—দেখি কি বলেন, নতুবা আমাকে অতিথিশালার বন্দোবস্ত ক'রে শীগ্‌গির সেখানে যেতে হবে, এ সময় তাঁদের কাছ ছাড়া হওয়া ভাল নয়।

কমলেশ্বর। নিশ্চয়ই নয়—জীবনের ত' স্থিরতা নাই, তাঁদের শরীর ত' দেখলাম খুব খারাপ হ'য়েছে। এইরূপ নানাপ্রকার কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল, দুইদিন পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সারিয়া শয্যার আশ্রয় লইবেন—এই ইচ্ছা কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সেইদিনই সর্ব্বেশ্বর গৃহে আসিলেন। রামেশ্বর দাদার পদধূলি লইয়া সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার প্রাণের ভাইপো, ভাইঝির কথা অগ্রে তুলিলেন।

সর্ব্বেশ্বর হাত পা ধুইতে ধুইতে বলিলেন—হাঁ সব ভাল, তুই ভাল আছিস্ ত' রামেশ্বর—কতদূর গেছলি ?

রামেশ্বর সমস্ত বলিলেন—তারপর বিবাহের কথা, কাশীতে পিতা-মাতার অবস্থার কথা, তাঁহারা তাঁহাকে দুই একদিনের মধ্যে যাইতে বলিয়াছেন—তাহাও বলিলেন। তাহাতে সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—এখন ত' ছুটীছাটা নেই, যাই কেমন ক'রে ?

রামেশ্বর বলিলেন—দাদা ! চাকুরী ত' তোমার সখের—না ক'র্‌লে কি আর চলে না ?

সর্ব্বেশ্বর। তুই জানিস্ না ভাই ! সখের নয়—এখন খরচ ঢের বেড়েছে—এতেই কুলোয় না।

প্রমোদা না থাকিলে ভায়ে ভায়ে বড় অমিল থাকে না। রামেশ্বর বলিলেন—তা ভাই ! চাকুরী যাক্ আর থাক্, গেলে আবার হবে। কিন্তু পিতামাতা গেলে ত' আর হবে না ; তুমি কাল ছুটি নিয়ে পরশুই চল।

সর্ব্বেশ্বর। এত শীগ্‌গির হবে না—বাড়ীতেও ব্যায়রাম, তবে চেষ্টা ক'র্ব্বো যত শীগ্‌গির পারি। বৌমাকে কি সেখানে রেখে এসেছিস্ ?

রামেশ্বর। হাঁ দাদা ! না রেখে কি করি।

সর্ব্বেশ্বর। তা ভালই হ'য়েছে ; কুটুম্বর ছেলেটীর খাওয়া-দাওয়া কি হ'লো ; ও তড়িৎ বাজার-টাজার করে দাও না।

তড়িৎ প্রভুর কথায় বাজার করিতে গেল। মহিমও কুটুম্বর অছিলায় আজিকার দিনে পেট পূজা খুব ভাল হইবে ভাবিয়া তড়িতের সঙ্গে বাজারে গেল। কমলেশ্বর সর্ব্বেশ্বরের পদধূলি লইয়া ঘরে গিয়া বসিলেন ; তার-পর আলাপ-পরিচয় হইল। দাক্ষায়ণী আজ মনের সাধে রন্ধন করিয়া দিলেন—খাওয়া হইল, তারপর শয়ন—ক্লান্ত শরীরে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদের চক্ষু অবরোধ করিল।

ঠিক প্রাতঃকালে উঠিয়া যে যার কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর কলিকাতায় যাইবেন—দাক্ষায়ণী প্রাতঃকালে রন্ধন করিয়া দিলেন। রামেশ্বর ও কমলেশ্বর মুখ হাত ধুইয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ডাক হরকরা একখানা চিঠি দিয়া গেল; পত্রের উপরের হস্তাক্ষর নির্ম্মলার—দেখিয়া রামেশ্বর খুলিয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা লিখিয়াছেন—"আপনারা যাইবার পর দিন হইতেই বাবার বড় অসুখ বেড়েছে--দেরী না করিয়া পত্র পাঠ চলিয়া আসিবেন। রামেশ্বর বড় চিন্তিত হইলেন—এরই মধ্যে একি হইল? দাদাকে পত্র দেখাইলেন। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—আর বিলম্বে কাজ নাই—তুমি আজই রওনা হও, আর বিলম্ব ক'রো না। আমি আফিসে গিয়া ছুটী লইবার চেষ্টা করি—যত শীগ্‌গির পারি—আমিও যাচ্ছি। বাড়ীর সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইল—পাড়ার লোক বহুদিনের পর রামেশ্বরকে দেখিতে আসিয়া কর্ত্তার বাড়াবাড়ি পীড়ার কথা শ্রবণে দুঃখিত মনে ফিরিয়া গেল।

দাক্ষায়ণী কাঁদিতে লাগিলেন—রামেশ্বর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, সেই দিনই আবার কাশীযাত্রা করিলেন।

— — —

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরলোকে।

কত প্রকার উদ্বেগ-আবেগ, মনের মধ্যে আকুড়িয়া লইয়া রামেশ্বর কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য যে কমলেশ্বরও তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল; শুধু পিতা নহেন—জননীও পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জনে একযোগে এমন ভাবে পীড়িত হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নির্ম্মলা প্রাণপণে সেবা করিতেছেন—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পীড়া হইবার কারণ তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—আমি এই কয়দিন আহারাদির একটু ভাল উদ্যোগ করেছিলাম; বাবার দুই একদিন অরুচি দেখে দুই একটা ভাল আহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। তাহাতেই কি এমন হইল? রাক্ষসী আমি—আস্‌তে না আস্‌তে এই বিপদ; বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। স্থানাভাবশতঃ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শয্যা এক ঘরেই হইয়াছিল এবং তখনও তাঁহাদের বেশ চৈতন্য ছিল, নির্ম্মলার কান্না ও আক্ষেপ শুনিয়া উমাকালী বলিলেন—বউ-মা। ওকি কথা ব'ল্‌ছো? দেহ থাক্‌লেই পীড়া হ'য়ে থাকে, শরীর বার্দ্ধক্যে উপনীত হ'লে পীড়ার আগার হ'য়ে পড়ে, ইহাতে দোষকার মা? তুমি কেন আপনাকে দোষী মনে করে বৃথা আক্ষেপ ক'র্চ্ছো। তুমি এসেছিলে ব'লে আমাদের কোনও কষ্ট হয় নাই, তুমি যদি না আস্‌তে, আর রামেশ্বর যদি দেশে চ'লে যেতো, তাহ'লে কি কষ্ট হ'তো একবার

ভেবে দেখ দেখি ; তুমি বৃথা আপনার নিন্দা আপনি ক'রো না—আত্ম-নিন্দা যে মহাপাপ ! নির্ম্মলা আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে আবার শাশুড়ীর পদতলে গিয়া বসিলেন। রামেশ্বর, কমলেশ্বর দেবানন্দের শয্যায় উপবেশন করিয়া কিরূপ কষ্ট হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কমলেশ্বর যাহাদের তত্ত্বাবধানে ইঁহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা রোগীদ্বয়ের যত্নের ক্রটী করেন নাই, সময়ে চিকিৎসক ডাকিয়া আনা, তাহার ব্যবস্থামতে কার্য্য করা, সমস্তই করিতেছেন—দেখিয়া রামেশ্বর তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। পুত্র কাছে আসিয়াছে দেখিয়া পিতামাতার প্রাণে সাহস হইল ; তাঁহারা বলিলেন—সর্ব্বেশ্বর কই বাবা, সে কি আসিল না ?

রামেশ্বর। তিনি এখন বাড়ী ছাড়িয়া কল্‌কাতায় থাকেন, মাঝে মাঝে বাড়ী যান, আমি যেদিন, গিয়াছি—সেই দিনই তিনি আসিয়া-ছিলেন, পরিবারবর্গ কল্‌কাতাতেই ছিল। পরদিন আপনার পত্র পেয়ে দাদাকে আস্‌বার জন্য বল্‌লাম, তিনি ছুটী নিয়ে আস্‌বেন, আমাকে অগ্রেই পাঠিয়ে দিলেন।

দেবানন্দ আর কিছু বলিলেন না, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। চিকিৎসার আরও কিছু উৎকর্ষ সাধন করা উচিত কিনা, রামেশ্বর কমলেশ্বর সে বিষয়ে যুক্তি করিতে লাগিলেন। কমলেশ্বর বন্ধুটীকে লইয়া চিকিৎসকের বাড়ী গমন করিলেন। তিনি বলিলেন—দেখুন ; বৃদ্ধ বয়সের পীড়া সহজে উপশম হবার নয়—এখনও পীড়া তত কঠিন হয় নাই—কেবল অজীর্ণ, আরও দুই তিন দিন না যাইলে কিছু বলা যায় না। কমলেশ্বর আসিয়া রামেশ্বরকে সমস্ত বলিলেন. দেবানন্দও সে কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—বাবা ! কবিরাজ মহাশয় অতি বিচক্ষণ, তিনি ঠিকই বল্‌ছেন—বৃদ্ধ বয়সের পীড়া তাড়াতাড়িতে কোনও ফল হবে না, রোগের

ভোগ না হ'লে আরাম হয় না, তার জন্ত ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বৈশ্বসঙ্কট ক'রলে হিতে বিপরীতই হয়ে থাকে,বেশী উতলা হ'য়ো না, আমাদের সময় হ'য়েছে। তুমি গৃহী হও নাই বলিয়া আমরা এতদিন সেই আশায় বসেছিলাম, তোমাকে সংসারী দেখবো. তোমার বধূর হাতের অন্নজল গ্রহণ ক'র্ব্বো. এখন আমাদের সে আশা সফল হ'য়েছে, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এনেছো. এখন শিব-শক্তিরূপে ধর্ম্ম সাধনায় সংসার উজ্জ্বল কর,— ইহাই প্রার্থনা· ভোগের অবসান হ'লেই জীবের মৃত্যু হয়, আমাদের তা হ'য়েছে. অতএব এইবার আমরা সত্বর ভবের মায়া কাটাব। বাবা! মৃত্যুরোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসায় মৃত্যুর গতিরোধ করিতে পারে না— তা ত' তুমি জান, তবে কেন সামান্ত মূঢ় ব্যক্তির মত অস্থির হ'চ্ছো, জগতে আসিলে, যাওয়া যে ধ্রুব সত্য, তাহা কি তোমায় বলে দিতে হবে? অতএব শোকে মুহ্যমান হওনা, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়াই ত' আমরা বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার পদতলে আশ্রয় লয়েছি, এখন যত শীঘ্র ঐ পদতলে আশ্রয় পাই, ততই মঙ্গল। আমরা উভয়ে সংসারের কোন বিভীষিকায় কখনও কষ্ট পাই নাই। সোণার সংসারে আজীবন সুখেই কাটিয়ে এসেছি দিন দিন সময় বড় খারাপ প'ড়্ছে, পাপের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্ছে, এই সময় সরে যেতে পারলেই ভাল, পুত্র তুমি আমাদের পরকালের কাজ কর - প্রত্যহ গীতা-চণ্ডী পাঠ কর, শিবদুর্গার চরণামৃত পান করাও, বাবা! উহার তুল্য ভবরোগ নিবারণের ঔষধ কি আর আছে?

পিতার আজ্ঞানুসারে রামেশ্বর তাহাই করিতে লাগিলেন। পিতামাতা যে চিরকালই দৈবানুরাগী, এসময় যে আরও বেশী হইবেন— তাহার আর বিচিত্র কি? এ ত' আর যে সে ব্রাহ্মণ নয়— আজীবন যাঁহারা সকল প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন; ধর্ম্মই যাঁহাদের জীবনের ব্রত— তাঁহাদের এ সময়ে এভাবের উদ্দীপনা বেশী

ভাবে না হইবে কেন? মৃত্যুর সময় অতিরিক্ত যন্ত্রণায় মানুষ সব ভুলিয়া যায়—ধর্ম্মের কথা কিছুতেই মনে আসে না। এই জন্য সময় অসময় চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, মৃত্যু-সময় আর তাহাদের কোনও ভাবনা থাকে না। পীড়ার জন্য দিনে দিনে দিন শেষ হইতেছে দেখিয়া দেবানন্দ ও উমাকালীর কিছুমাত্র ভাবনা নাই—সে প্রশান্ত বদনমণ্ডলে কষ্টের কিছুমাত্র কালিমা পাত হয় নাই—সদাই প্রফুল্ল। এখন যেন বেশী প্রফুল্লতা বদনকমলে প্রতিভাত হইয়া সে মুখচ্ছবির সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিতেছে। উমাকালী অনবরত মালা জপ করিতেছেন; আর এক একবার কেবল তাঁহার হৃদয়-দেবতাকে ডাকিয়া বলিতেছেন—কর্ত্তা! দেখো যেন আমাকে ফেলে যেও না; সেই দশ বৎসর বয়স থেকে তোমার পাদপদ্মে প'ড়ে আছি, দাসী ব'লে অগ্রাহ্য করো না!

দেবানন্দও শয্যান্তর হইতে বলিতেন—না উমা! সে চিন্তা ক'রো না—পরলোকের পথে আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাব—যখন কখনও কাছ-ছাড়া হই নাই—তখন এসময়ই বা হব কেন?

নির্ম্মলা কাছে বসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে কেবল নয়নের জলে ভাসিলেন আর বলিলেন—এতদিন পরে যথার্থ দেব-দম্পতীর পদতলে আশ্রয় পেয়েছিলাম কিন্তু আশা মিটিয়ে বেশী দিন সেবা করতে পেলাম না। উমাকালী বলিতেন—মা! দুঃখ কেন, আপনাকে গড়ে তুলো না—তাহা হ'লে সব সখ মিটে যাবে।

রামেশ্বর মনকে দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া জনক-জননীর আদেশমত প্রত্যহ গীতা-চণ্ডী পাঠ শুনাইতে লাগিলেন, শিব-দুর্গার চরণামৃত পান করাইতেও ভুলিলেন না। মৃত্যুর কোন লক্ষণ নাই; চিকিৎসকও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন—ভয় নাই।

ইচ্ছা না হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না, জীব মাত্রেরই ইচ্ছা মৃত্যু। তবে কৃতান্ত কাহাকেও বিষম কষ্ট দিয়া ইচ্ছা করাইয়া লয়েন, আর কাহার নিকট তাঁহার কর্তৃত্ব খাটে না; নিতান্ত অনুগতের মত সময় অন্বেষণ করেন। পাপীর নিকট তাঁহার জোর-জবরদস্তী বেশী, ধর্মপ্রাণ মহাত্মার নিকট কৃতান্তের ক্ষমতা কোথায়? আজীবন যাঁহারা কৃতান্ত-দলনীকে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়া আসিয়াছেন—কৃতান্ত তাঁহাদের কি করিবেন? যমের যমত্ব এখানে অব্যাহত রহিল না। বিশেষতঃ দেবানন্দ ও উমাকালী মনে-প্রাণে কাশীতে শিবদুর্গার পদতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। পুত্র যেমন পিতামাতার কোলে থাকিলে সদাই নির্ভয়—ইঁহাদেরও সেই অবস্থা; প্রাণে ভয়ের লেশ মাত্র নাই—তাই হৃদয় এত প্রফুল্ল, বদনমণ্ডলে এত প্রফুল্লতার ভাব বিরাজিত। পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে কেবল ধর্মের কথা—পারত্রিক পরিত্রাণের কথা হইতেছে—যে শুনিতেছে সেই মুগ্ধ হইতেছে। কমলেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া বলিতেছেন—মৃত্যুর জন্য এমন প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিতে—আমি আর কাহাকেও দেখি নাই—এমন না হ'লে সাধনা! এরূপ সাধকের ছায়াস্পর্শ ক'রলেও জীবন ধন্য হয় আমরা ধন্য হ'য়েছি।

ঔষধ খাওয়া বন্ধ হইয়াছে। উহাতে কেবল সময় নষ্ট হয় দেখিয়া তাঁহারা আর ঔষধ সেবন করেন না, তবে কবিরাজ মহাশয় এ মহাত্মাদের দর্শন লাভে বঞ্চিত হন নাই—প্রত্যহই আসিয়া তাঁহাদের সেই পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া ধন্য হন। এখন, ঠিক গ্রহণী রোগই দাঁড়াইয়াছে; রামেশ্বর ও নির্ম্মলা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছেন—কমলেশ্বরও বাদ যান নাই,—তিনিও যতদূর সম্ভব—সেবায় রত হইয়াছেন।

দেবানন্দ ও উমাকালী একটু সময় পাইলে সময়ে সময়ে সর্ব্বেশ্বরের

কথা বলেন—কই রাম! সেত' আসিল না; তবে বুঝি তাহার সহিত শেষ-দেখা হ'লো না,—হাঁা রাম! সে কি তবে আস্‌বে না?

রামেশ্বর। কি জানি বাবা! আমার কাছে ত' বেশ সরল ভাবে বল্‌লেন—তুই চল, আমি ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। তার পর তাঁর মনোগত ইচ্ছা কি, তা কেমন করে বুঝ্‌বো, উমাকালী বলিলেন—সর্ব্বো, ত' তেমন ছেলে নয়—কেবল ঐ ছুঁড়িটাই তার মাথা খেলে; সেখানে গিয়ে হয়ত' কাণে কি মন্ত্র দিয়েছে—বাবাও অমনি ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে—তাই পালন ক'রছেন—আর এসকল কথা মনে নাই। কর্ত্তা তার জন্ত আর ভাব্‌বার দরকার নেই; ছেলেমানুষ ত' নয়, যা ভাল বুঝে তাই করুক।

দেবানন্দ বলিলেন—আমার কারো জন্ত কিছু ভাবনা নাই; তবে আস্‌লে একবার দেখা হইত, তার আসার জন্ত ত' আর কাল অপেক্ষা ক'র্ব্বে না, আমরাই বা আর কত দিন আশা-পথ চেয়ে বসে থাক্‌বো, দিন ত' নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে?

যাহারা বুঝে না—তাহারা বুড়া বুড়ির কথা শুনিয়া হাসে আর বলে—মৃত্যুর কোনও লক্ষণ নাই, ওরূপ জ্ঞান, ঐরূপ ঠন্ ঠন্ করে দিব্বি জ্ঞানের কথা ক'চ্ছে, অথচ বলে কি না আর সময় নাই, ওমা একি মরণ! কিন্তু যাহারা সাধকের মৃত্যু দেখিয়াছে, তাহারা আর কোনও কথা বলে না। পথ পরিষ্কার—যখনই ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন, মৃত্যুর কথা তাঁহাদের কাছে ত' কিছু অবিদিত নাই? যতদিন যাইতে লাগিল, রামেশ্বর তত চিন্তিত হইতে লাগিলেন। বুঝি দাদার সহিত দেখা হইল না; অন্তিম সময়ে দেব-দেবীর পদধূলি গ্রহণ করা দাদার ভাগ্যে বুঝি ঘটিল না। রামেশ্বর ত' সমস্ত জানিতে পারিতেছেন কিন্তু কি করিবেন, আর একবার কমলেশ্বরের পরামর্শ-মত একখানি জরুরী টেলিগ্রাম করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর সেদিন অফিসের পর বাসায় আসিয়া তাঁহার শয্যাগুরু প্রমোদাকে সমস্ত বলিলেন। রামেশ্বরের বিবাহের কথা, তারপর পিতার অসুখের কথা সমস্ত বলিলেন কিন্তু প্রমোদার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনে করিলেন—ঠাকুর-পো এইবার বিয়ে ক'রে এসেছে, এত দিন বিষয়-আশয়ের কথা কিছু কয় নাই, এইবার কর্ত্তা-গিন্নীর কাছে গিয়ে দুইজনে একটা পাকাপাকী ক'রে নিবে; সেই এই সকল পরামর্শ ক'রে, ঐ রকম পত্র দিয়েছে; পীড়ার কথা ভাণ মাত্র। তিনি স্বামীকে বলিলেন—দেখ, ও সকল কথায় কাণ দিও না, বুড়ো হাড় এত শীগ্‌গির ম'র্ত্তে পারে না, ছোট ছেলে এত দিন কাছে থেকে কি পরামর্শ ক'রেছে, তাই কর্ত্তা পীড়ার ভাণ ক'রে তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছেন, অসুখ না ব'ললে ত' আর তুমি যাবে না—এই জন্য। এখন সেখানে গেলে একটা পাকা-পাকী লেখা পড়া ক'রে দিবেন, তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল, শেষ কি আসল থেকে টান্ দিবে, এখনও যে তাঁরা বেঁচে রয়েছেন, বিষয় কি এখন তোমাদের অশেছে; এইবার তিনি বন্দোবস্ত ক'রে দিলে, তার পর নিজের নির্ভের হবে—আর তাই কর্‌বার জন্যই পীড়ার ভাণ ক'রে পত্র দেওয়া হ'য়েছে। তুমি বুঝ্‌তে পারনি; তাঁদের কাছে টাকা কড়ি এখনও বেশ আছে, এই যে এতদিন তুমি একটী পয়সাও পাঠাও নি, তাঁদের কি অচল হ'য়েছে; ছোট ছেলেটীর উপর তাঁদের বরাবরই টান বেশী; তা কি তুমি দেখছো না?

সর্ব্বেশ্বর। তাত' দেখছি প্রমোদা, কিন্তু যদি সত্যই হয়—তা হ'লে ত' বড়ই মনঃকষ্ট থেকে যাবে।

প্রমোদা। সত্য কি অসত্য তা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—আজ প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর কাশীবাসী হ'য়েছেন—কখন কি এরূপ পত্র দিয়াছেন? আর ছোট ছেলেটী যাই বিয়ে ক'রে এলো, অমনি এক মাস যেতে না

যেতেই অবস্থা খারাপ, বাঁচবার আশা নেই, এতেই বুঝতে পারছো না ভিতরে কি ?

সর্ব্বেশ্বর মনে মনে চিন্তা ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন—প্রমোদা যা বল্‌ছে তা অসঙ্গত নয়; এর মধ্যে এমন শক্ত পীড়া কি হ'তে পারে ? তা হ'লে ত' রামেশ্বর আসিয়াই বলিত, কিন্তু তা নয়—ও সমস্ত মতলব ভাঁজিয়া একবার দেখা ক'রতে এসেছিল। ওরূপ ভাবে পত্র পূর্ব্ব হ'তেই দিবার সঙ্কল্প ছিল—বাপ্‌মার কাছে গিয়ে এবার চুলচিরে বিষয়ের ভাগ ক'... নিবে। অসুক বিসুক কিছুই নয়—সেখানে আমার এখন যাওয়া উচিত নয়। রামেশ্বর চলে আসুক, তারপর আমি না হয়, একবার দেখা ক'র্ত্তে যাব। কাজকর্ম্ম ক্ষতি ক'রে—সেখানে বসে থাক্‌লে ত' আমার চল্‌বে না, তার কি; চাকুরী ক'রে রোজগার করা কত শক্ত ঘানী, তাত সে জানে না। এই মাত্র বিয়ে ক'রেছে, ছেলে-পিলে হয় নাই, সংসারের ভার পড়ে নাই—সে বসে থাক্‌তে পারে—আমার কি আর ওরূপ চলে ? তার পর প্রমোদাকে বলিলেন—হা প্রমোদা ! তুমি যা বল্‌ছো—আমার এখন তাই ব'লে মনে হ'চ্ছে। ছোট ছেলে কি না—কেঁদে কেটে ধরেছে—বাবা ! তোমরা থাক্‌তে থাক্‌তে বিষয় ভাগ ক'রে দাও—এখন বিয়ে ক'রেছি—আর ত' না হ'লে চল্‌বে না। তিনি ছোট ছেলের কথায় মরেন বাঁচেন, অমনি তাকে পাঠিয়ে দিয়ে এক চিঠি ঝেড়ে দিয়েছেন। ভাগ্যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে যাইনি—তা'হ'লে কোটে পেয়ে সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তো—আমি নিজে যা ক'রেছি—তারও ভাগ নিতো। ভগবান্‌ যা করেন—ভালোর জন্যই করেন—ওঃ খুব বেঁচে গেছি ! সর্ব্বেশ্বর ওকথা আর মুখে আনিলেন না—পিতার পীড়ার চিন্তা তিনি আর মনের মধ্যে স্থান দিলেন না। এ সমস্ত মিথ্যা বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

পুরুষ স্ত্রীলোকের অত্যধিক বশীভূত হইলে যে আপনার অস্তিত্ব

হারাইয়া ফেলে—তাহা আজ চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান। অমন দেবদেবী তুল্য পিতামাতাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও সর্ব্বেশ্বরের জিহ্বায় আটকাইল না। অম্লানবদনে এ সকল মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া তিনি সেদিন আহারাদির পর থিয়েটার দেখিতে গেলেন। প্রমোদাও সঙ্গে যাইতেন কিন্তু সেদিন অফিসের দুই একটী বন্ধু সঙ্গে যাবে বলিয়া রাগে গুমরিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—দেখো, ওদের সঙ্গে যাচ্ছো, যেন বেএক্তার হ'য়ে প'ড়ো না; যদি কিছু খাও টাও ত' কম ক'রে খেও, এসে বমি ক'রলে আমি মোক্ত ক'র্ত্তে পারবো না!

সর্ব্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—না প্রমোদা! সে ভাবনা ক'রো না, মা এসেছেন, তিনি মনে ক'র্‌বেন কি? অন্য সময় হ'লেও বা হ'তো, তুমি আমাকে এমনি আহাম্মক মনে করো নাকি? প্রমোদার জননী দরজার আড়াল থেকে, উপযুক্ত কন্যা ও জামাতার প্রণয়-কন্দল শুনিয়া মুচকী হাসিতেছিলেন। সর্ব্বেশ্বর যখন মা এসেছেন, বল্‌লেন, তখন তিনি আরও একটু গা ঢাকা দিয়া দরজার আড়ালে অদৃশ্য হইলেন।

আর বাহাদুরী ক'র্ত্তে হবে না—যাও, বলিয়া নথ নাড়িয়া প্রমোদা স্বামীকে কটাক্ষ হানিয়া বিদায় দিলেন। সর্ব্বেশ্বর পান চিবাইতে চিবাইতে দরজার বাহির হইয়া গেলেন। পিতামাতার কথা আর মনে উদয়ও হইল না। ভোরের সময় থিয়েটার দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর টলিতে টলিতে বাড়ী আসিলেন। গাড়ীর শব্দ কাণে পৌছিলে প্রমোদা জাগিয়া উঠিলেন, স্বামীর সাড়া পাইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। সর্ব্বেশ্বর এলাইত ভাবে উঠি-পড়ি করিয়া টলিতে টলিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রাতঃকাল কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাঁহার চৈতন্য নাই। এমন সময় একজন টেলিগ্রাফ পিয়ন ডাকাডাকি আরম্ভ করিল; সর্ব্বেশ্বর অগত্যা উঠিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং পড়িয়া দেখিলেন—তাহাতে

লেখা আছে, "দুই এক দিনের মধ্যে না আসিলে, আর দেখা হইবে না।" টেলিগ্রাম শুনিবার জন্য প্রমোদাও কাছে আসিয়াছিলেন, সর্ব্বেশ্বর নেশার ঝোঁকে বলিলেন—বাবা! যতই চালাকী কর, সর্ব্বেশ্বর ভুলবার ছেলে নয়। আমি এখন কিছুতেই যাচ্ছি না। প্রমোদা শুনিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে দুই একটা কড়া কথা বলিতেও ছাড়িলেন না। কাজেই টেলিগ্রামের অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায় হইল—কোন আমলেই আসিল না।

এদিকে রামেশ্বর কেবল দাদার আশা-পথ চাহিয়া আছেন। টেলি-গ্রামের পর পাঁচ ছয় দিন অতীত হইল, দাদার দেখা নাই, সরল প্রাণে তিনি কেবল হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন, তবে আর দাদার সহিত দেখা হ'লো না। মৃত্যু ত' আর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবে না?

একদিন রাত্রে আহারাদির পর সকলে মুখামুখী করিয়া বসিয়া আছেন—আজ পিতামাতার পীড়া কিছু বাড়িয়াছে—শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে; তথাপি তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা লক্ষিত হইতেছে না—ঠিক সহজ মানুষের মত কথা কহিতেছেন—তবে অন্য দিন অপেক্ষা কিছু মৃদু মৃদু এবং ধীরে ধীরে।

দেবানন্দ শেষ রাত্রে আর বেশী কথা কহিলেন না—যোগে আপনার চিত্ত স্থির করিলেন। রামেশ্বর বুঝিলেন—আর বেশী বিলম্ব নাই—পিতা এইবার ভবের সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন করিতেছেন—তথাপি কাঁদিলেন না—পাছে জননীর কোনও কষ্ট হয়। রামেশ্বর ও কমলেশ্বর তপঃশৌর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কাণে, তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন।

দেবানন্দের ন্যায় আজীবন ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মণকে ভবাব্ধি পারের জন্য কাহারও সাহায্য লইবার আবশ্যক হইবে না—তথাপি পুত্রের কাজ করিতে রামেশ্বর ছাড়িবেন কেন? ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যখন বিহগকুল—সমস্ত রজনী কুলায় আবদ্ধ থাকিয়া এখন—প্রাতঃকালে ভগবানের নাম

গান করিতে শাখীশাখে বসিয়াছে; কাশীর যোগী, দণ্ডীগণ যখন "শিব শম্ভো" রবে দিক্‌-দেশ মাতাইয়া পবিত্র মণিকর্ণিকার দিকে চলিয়াছেন—সূর্য্যদেব যখন লোহিত-রাগ-রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছেন—ঠিক সেই মঙ্গলময় সময়ে দেবানন্দ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া "মা শিবসুন্দরী—বাবা বিশ্বনাথ" বলিয়া দুই একবার প্রাণের ডাক ডাকিলেন—তারপর আর কোন কথা কহিলেন না—ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে শিব সন্নিধানে—শিবানীর ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করিলেন। রামেশ্বর কাঁদিয়া গিয়া জননীর বুকে পড়িবেন বলিয়া ছুটিলেন—কিন্তু একি! তিনিও ত' নাই—পিতার পূর্ব্বেই যে তিনি নিঃশব্দে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। নির্ম্মলা বুক-ফাটা স্বরে কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। যে আসিয়া দেখিল—সেই বলিল—এমন মৃত্যুই ত' প্রার্থনীয়! ইহাই যথার্থ কাশীবাসীর মৃত্যু; শিব-শিবার বড় আদরের তপঃপরায়ণ ছেলে না হ'লে কি এরূপ সৌভাগ্য হয়? আর কি হইবে—শব যতক্ষণ নিকটে রাখা যায়—ততক্ষণই শোক। যাহাকে ডাকা হইল—সেই আসিয়া এই সাক্ষাৎ শিবদুর্গার মূর্ত্তি স্কন্ধে বহন করিয়া ধন্য হইল। কাশীতে ত' শব অস্পৃশ্য হয় না। এযে শিবস্বরূপ—যে স্পর্শ করিবে—তাহারই ত' সৌভাগ্যোদয়—কাজেই লোকের অভাব হইল না—এক খাটে দুইটী পবিত্র মূর্ত্তি একত্র করিয়া শ্মশান-ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। তখনও মূর্ত্তিদ্বয় যেন মধুর হাসি হাসিয়া জগদ্বাসীকে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে বলিতেছেন। উমাকালী কখনও স্বামী ছাড়া হয়েন নাই—এখনও হইলেন না, বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য নড়িল না—তিনি পার্থিব রাজ্যের মত সস্ত্রীক পর-পারে শিবনিবাসে গমন করিলেন।

রামেশ্বর পিতামাতার যুগলমূর্ত্তি দাহ করিয়া শূন্য-প্রাণে ঘরে ফিরিলেন। নির্ম্মলা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—আমি কি রাক্ষসী গো, আসিতে না আসিতেই এমন দেবদেবীকে গিলিয়া ফেলিলাম।

গবাক্ষ-প্রবিষ্ট বাতাস ঠিক উমাকালীর স্বরে যেন সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিল—কি কর বউমা! আত্মনিন্দা কর কেন! মৃত্যুর কি আবার সময় অসময় আছে? যাহারা এই দেব-দম্পতীকে জানিত—যাহারা একদিনও ইঁহাদের সহিত মিলিয়াছিল—তাহারা সকলেই তাঁহাদের জন্য হায় হায় করিতে লাগিল। পর আপনার জনের মত কাঁদিয়া আকুল হইল, হইল না কেবল - তাঁহাদের প্রাণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা—কলিকাতা-সহরে বসিয়া "চিরদিন এমনি যাইবে" ভাবিয়া বিলাসিতার ক্রোড়ে সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। পিতামাতার মহাপ্রস্থানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হওয়া—তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আদ্যকৃত্য।

কাশীতে যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, রামেশ্বর সকলকে মিটাইয়া দিয়া তৎপরদিবস দেবীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একস্থানে বসিয়া সময়ক্ষেপ করা কোনও ক্রমেই উচিত নয়, দশ দিন পরেই ক্ষমতানুসারে পিতামাতার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে হইবে—দাদা পত্র দিয়াছেন, তিনি কি করিবেন না করিবেন তাহারও স্থিরতা নাই। তিনি এক খাম-খেয়ালী লোক, বৌদিদির কলের পুতুল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁহার জ্ঞান নাই, নতুবা এত বড় একটা মহৎ কার্য্য তিনি এইরূপ ভাবে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া চিরকালের জন্য অপরাধী হইলেন? এ অপরাধ যে আর জীবনে খণ্ডন হইবার নহে, মরিলেও এ মর্ম্মপীড়ার হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

দেশে আসিয়া রামেশ্বর কলিকাতায় দাদাকে তড়িতের দ্বারা এই চরম শোকবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে পাঠাইলেন। তড়িৎ কর্ত্তার হাতে-গড়া মানুষ করা গোমস্তা, তিনি তাহাকে প্রাণপণে গোমস্তাগিরি শিখাইয়াছিলেন। তড়িৎ কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তার মৃত্যু-সংবাদ লইয়া কলিকাতায় ছুটিল। দাক্ষায়ণী প্রাণের দাদা ও বৌদিদির মৃত্যুতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা নববধূটীর মত নীরব রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। দাদার কর্ত্তব্য যাহা, তাহা করিবেন কিন্তু রামেশ্বর এক্ষণে কমলেশ্বরের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কমলেশ্বর বলিলেন—শ্রাদ্ধ খুব ভাল ক'রেই করা উচিত—একান্তপক্ষে বৃষোৎসর্গ ত' ক'রতেই হবে। রামেশ্বর বলিলেন—ভাই!

দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, তাঁহার ব্যবহার ত' দেখিলে ; তিনি যে কিছু করিবেন বলিয়া ত' বোধ হয় না কিন্তু আমি আজ বহুদিন দেশছাড়া—টাকা-কড়ি হাতে কিছুই নাই—ইহার মধ্যে দূর-দূরান্তরে শিষ্যবর্গের বাটী যাওয়াও অসম্ভব—বড় শ্রাদ্ধ ক'রতে গেলে ত' টাকা চাই—এখন তাহার উপায় কি ?

কমলেশ্বর বলিলেন—টাকার জন্য আট্‌কাইবে না—তুমি ধীরে ধীরে অন্য ব্যবস্থা কর—আমি বাবাকে পত্র লিখিতেছি—তারপর তোমার দাদা আসিয়া যদি যোগদান করেন—"অধিকন্তু ন দোষায়"।

তাহাই হইল—কমলেশ্বর পিতার নিকট পত্র লিখিবামাত্র দুই তিন দিনের মধ্যে দুই সহস্র মুদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। রামেশ্বর শ্বশুরকে পায়ের ধূলা দিতে লিখিয়াছিলেন। তিনি বেহাই ও বেহান ঠাকুরাণীর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—বাবা! "আমারও শরীর আজ কয়দিন তেমন ভাল নয়, যাইবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হইল না বলিয়া কিছু মনে করিও না—তাঁহাদের ন্যায় পবিত্র-চিত্ত মহাত্মার আত্মকৃত্য সুশৃঙ্খলায় সমাহিত হইবে—তজ্জন্য চিন্তা করিও না। তোমাদের সাংসারিক গোলযোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার মনোমালিন্য করিও না—শ্রাদ্ধ-কার্য্যে ব্যয়-কুণ্ঠ হইবার আবশ্যক নাই ; প্রাণ যাহাতে সন্তুষ্ট হয়—তাহা করিও—আরও যদি কিছু আবশ্যক হয়—লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। কার্য্য শেষ হইলে কমলেশ্বরকে পাঠাইয়া দিও—এখানে কাজ-কর্ম্মের বড় বিশৃঙ্খলা হইতেছে—একাকী সমস্ত দেখিতে পারিতেছি না।"

টাকা ও পত্র পাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। দাদা আসিলেই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া উচিত-অনুচিত একটা স্থির করিবেন। সর্ব্বেশ্বর তড়িতের মুখে পিতামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

রামেশ্বর দেশে আসিয়াছে, এ সময় না যাইলেও নয়। বড় ছেলে ভবানী কন্যা হেমলতা ও পত্নীর পীড়ার ভাণ দেখাইয়া তিনি অগত্যা দেশে আসিলেন। দাদাকে দেখিয়া রামেশ্বর প্রাণের ডাকে ঠিক কচি ছেলের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা মায়া-কান্না জুড়িয়া দিল। দেবানন্দ ও উমাকালীকে না—ভালবাসিত ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিত কে? তেমন পরোপকারী, শাস্ত্রপাঠী, ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কি আর হইবে? তাঁহাদের গুণের কথা স্মরণ করিয়া পাড়া শুদ্ধ লোক কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। যাহাদের জন্য পরও আপনার মত দুঃখ করে—কাঁদে, এ জগতে তাঁহাদের জন্মই সার্থক। দেবানন্দ যে আজীবন পরকে আপনার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের পরলোকগমনে ক্রন্দনের উচ্চ রোল উঠিবে না ত কি?

সর্ব্বেশ্বরের এইরূপ গর্হিতাচরণ শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। যাহা করিয়াছেন—তাহার ত' কোন উপায় নাই, তিনি বাড়ীশুদ্ধ সকলের পীড়ার ভাণ করিয়া একপ্রকার কাটাইয়া পরে পুরোহিতের ব্যবস্থানুসারে অশৌচ গ্রহণ করিলেন—পিতামাতার কার্য্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের যে সকল প্রকার অধিকার! জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের যে কোন অধিকারই নাই—সর্ব্বেশ্বর ক্ষণিকের জন্য তাহা বুঝিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। এরূপ চৈতন্য ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হয়—পত্নীর পরামর্শে প্রত্যেক কাজে তিনি পদে পদে লোকের নিকট নিন্দাভাজন হন কিন্তু এমনি মোহিনী মায়া যে সে ভাব বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না—কিছুক্ষণ পরে আবার মায়াচ্ছন্ন হইয়া সব ভুলিয়া যান।

আর দিন নাই—বসিয়া থাকিলে চলিবে না, রামেশ্বর বলিলেন—দাদা! যা হবার তাতো হ'য়ে গেছে। এখন শ্রাদ্ধের দিন ত' নিকট-বর্ত্তী; কিরূপ করিবে না করিবে তাহার একটা স্থির কর। "হাঁ

আজ ছুটী লইয়া আসি—কল্য আহারাদির পর সমস্ত ঠিক করা হইবে।” এই বলিয়া তিনি অফিসে বাহির হইয়া গেলেন। সর্ব্বেশ্বরের পূর্ব্বে তাঁহাদের বংশে আর কেহ পরের দাসত্ব করে নাই, ব্রাহ্মণ-জাতি দাসত্ব করিলে পতিত হয়। এ কার্য্যে কেবল তিনিই স্বকৃতভঙ্গ—এই জন্য চাকুরীতে তাঁহার এত মায়া।

এ কয়দিন সকলকেই একত্র হবিষ্য করিতে হইতেছে, কোনও প্রকার মনোমালিন্য দেখা দেয় নাই! নির্ম্মলা নিজগুণে প্রমোদাকে বড়দিদির মত মান্য করিয়া তাঁহার হুকুমে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে-ছেন। দাক্ষায়ণী কেবল স্বতন্ত্র স্থানে বাস্তুদেবতার ভোগ রন্ধন করিতেছেন—তাহাতেই কমলেশ্বর ও তাঁহার চলিয়া যাইতেছে।

রূপের পক্ষপাতী জগতে নয় কে? নববধূ নির্ম্মলার রূপ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিল—এমন নিখুঁত সুন্দরী রমণী দেবীপুরে মুখুর্য্যেদের বউ ছাড়া আর কেহ আসে নাই। তবে তার কেবল রূপই আছে; এর দুইই আছে; এক সঙ্গে এইরূপ রূপ-গুণের শুভ সংযোগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই প্রমোদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—ওলো বড় বউ! আর ভাই! তুই এখান ওখান করিস্‌নি; আর ত' কর্ত্তা-গিন্নি নাই; এবার ছোট জা'টীকে আপনার মত করে ঘর-সংসার কর—মেয়েটী যথার্থ ভাল ঘরের বটে; এমন না হ'লে বউ! রামেশ্বর এই জন্যই এতদিন বিয়ে করেনি কিন্তু যাই হউক, তার পছন্দ আছে বটে। ইত্যাদি প্রকারে সকলে ছোট বউয়ের তারিফ করিতে লাগিল। প্রমোদা অন্তরে গুমরিয়া মরিলেও মনের দুঃখ মনে চাপিয়া কেবল সরোষ কটাক্ষে এক একবার তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিলেন—এ কয়দিন ঝগড়া-ঝাঁটী বা মনোমালিন্য করিলে লোকের নিকট তিনিই নিন্দনীয় হইবেন—এই জন্য পাড়ার মাগীদের কথায়

গায়ে বিষ ছড়াইয়া দিলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

"আপনি ভাল ত' জগৎ ভাল" নির্ম্মলা বড় জায়ের কোনও দোষ না দেখিয়া সসম্মানে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঝগড়া কলহ তিনি জীবনে কাহার সহিত কখন করেন নাই—কেহ কিছু বলিলে তিনি আপনাপনি সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেন—মানীর মান কখনও নষ্ট করিতেন না—ইহাতে তিনি জগতে কাহার অপ্রিয় হইবেন?

সর্ব্বেশ্বর ছুটি লইয়া আসিয়াছেন—অগ্র স্ত্রী, শাশুড়ী ও শ্যালকের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে কল্য সকলের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে, আর ত' চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। সন্ধ্যার পর পাড়ার সকলে আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঠাকুর-বাটীতে সমবেত হইলেন, রামেশ্বরের মুখে দেবানন্দ ও উমাকালীর সেই আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিষয় শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন; রামেশ্বরকে সকলেই ভালবাসিত—এতদিন পরে তিনি দেশে আসিয়াছেন -বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই সুখী। কিছু দিন পূর্ব্বে রামেশ্বর সংসারে যেরূপ বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন—তাহাতে সকলেই মনে করিয়াছিল—রামেশ্বর আর সংসার পাতিবেন না—তাহা হইলেই এত বড় একটা মহৎ বংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। সর্ব্বেশ্বর যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই—এখন তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ অনেকেই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাটীতে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন—রামেশ্বর তাঁহাদের আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর আসিলেই শ্রাদ্ধের কতদূর কি হইবে, জিজ্ঞাসা করিবেন—কারণ পাড়ার এমন একটা ভাল লোকের যখন সস্ত্রীক এমন পবিত্রভাবে কাশী-মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাঁহাদের শ্রাদ্ধ খুব ভাল

করিয়াই সম্পন্ন হওয়া উচিত, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সেদিন একবার অতি দীন ভাবে দর্শন দিয়া বলিলেন—কল্য প্রাতঃকালে সমস্ত কথা হইবে। যেন তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে—এইরূপ ভাব দেখাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া সেদিন আর কেহ অপেক্ষা করিল না। রামেশ্বর ও কমলেশ্বর দাদার ভাব দেখিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে "তিনি যে কিছু করিবেন বলিয়া বোধ হয় না" ইত্যাদি বলিতে বলিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিন আহারাদির পর পাড়ার কয়েকজন গণ্যমান্য সমাজপতি সর্ব্বেশ্বরের বহির্ব্বাটীতে আবার সমবেত হইল; আজ তাহাদের দ্বারা দেবানন্দ ও উমাকালীর আদ্যকৃত্য কিরূপ ভাবে সমাহিত করা উচিত—তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

রামেশ্বর বহু পূর্ব্ব হইতে আসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন—পিতার বন্ধু তাঁহারা—তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা না করিলে—তাঁহারা মনে করিবেন কি? বাস্তবিক এই সকল মহারথী কুলীনগণ ত' আর তাহাদের বাটী এক সাঁজ উদর পূরণের আশায় আসেন নাই? কোনও একটা বৃহৎ সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে গেলেই অভিজ্ঞ লোকের সৎপরামর্শ গ্রহণ করা উচিত—নতুবা পদে পদে ঠকিতে হইবে! বিশেষতঃ পিতৃমাতৃ-দায়ে নম্রতা প্রকাশ শিষ্টাচারের লক্ষণ। রামেশ্বর তাহা বুঝেন, তাঁহার প্রকৃতি চিরকালই অতি নম্র, বিনয় তাঁহার অঙ্গের ভূষণ—তাই তিনি পিতৃমাতৃকার্য্যে পাড়ার সকলের মত গ্রহণ করিতেছেন।

সর্ব্বেশ্বর কিন্তু এ সকল বিষয়ে নারাজ! তিনি কাহার নিকট পরামর্শ লইয়া নীচু হইয়া কার্য্য করিতে রাজী নহেন। আমি আবার পরামর্শ লইব কাহার? ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি? পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে লুচী ভাজিতে পরিলে খাইবার লোকের আবার ভাবনা!

সর্ব্বেশ্বর এমনি দর্পী—এমনি হাম-বড়। এ হেন দায়ে ঠেকিয়াও তিনি কাহার নিকট মাথা হেঁট করিতে রাজী নহেন—পাছে জমীদারের মান যায়—পাছে লোকে তাঁহাকে অবুঝ—অনভিজ্ঞ মনে করে। আর তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে বেশী কিছু করিবার ইচ্ছাও নাই। পূর্ব্বদিন রজনী-যোগে প্রমোদা মাতা ও ভ্রাতাসহ তাঁহার কাণে মন্তর পড়িয়া দিয়াছেন—ওর কি? ও ত এই সবে মাত্র বিয়ে ক'রেছে—ছেলে পিলে হয় নাই—খরচ ত' নাই বল্লে হয়, ও পরের স্কন্ধে কিছু খরচ করাইয়া বাহাদুরী লইতে পারিলে—আপনাকে ধন্য মনে ক'র্ব্বে। তুমি ত' আর সে রকম নয়। হাজার হউক, দুইটী ছেলে হ'য়েছে, কিছু দিন পরে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—তার পর সংসারের খরচ কত—তা ঠাকুরপো কি জানবে, কখন ত' আর সংসার করে-নি—তুমি ওর কথায় নেচো না, যৎসামান্য কিছু খরচ ক'রে দায় উদ্ধার হও। প্রমোদার জননী ও ভ্রাতা মহিমচন্দ্রও ইহাতে সায় দিলেন, তাঁহারাও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে বেশী খরচ করার পক্ষপাতী নহেন। শাশুড়ী বলিলেন—বাবা! পেমা আমার কত বুদ্ধি ধরে, তবে তোমার সংসার বজায় রেখেছে, তুমি ত' আর কিছু দেখো না, যে যা বলে তার কথাতেই মেতে উঠ। অত কি ভাল বাবা! কত গায়ের রক্ত জল কল্লে তবে টাকা রোজগার হয়, সেই টাকা কি খই-কলার মত খরচ ক'রতে আছে? আর বাপমায়ের কাজ এই হ'লেই ত' হ'লো না—অন্য সময়ে করো না, সেদিন এত টাকা ডাক্তার ও কল্‌কাতার বাসায় খরচ করেছো—এখন আর বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না; এর পর তখন ক'রো।

মহিমচন্দ্র বেশী লোকের সমাগম দেখিতে পারে না, কারণ লেখা-পড়ায় মা সরস্বতীর সহিত ত' তাহার চির-বিবাদ, কি জানি যদি কথা-বার্ত্তা কইতে ভুল হয়—তাহা হইলে ত' অপমানের একশেষ—লোকে

ব'ল্বে জমীদার সর্ব্বেশ্বরের শালাটা নিরেট মূর্খ! কাজেই সে ভদ্র সমাজে কাহারও নিকট বসে-দাঁড়ায় না, খায়-দায় আর ছোটলোক পল্লীতে ইয়ারকী দেয়, পাঁচ জন ভদ্রলোকের সমাগম হইবে, নানা স্থান হইতে ভাল ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিবে—শুনিলেই তাহার ভয় হয়। সে বলিল—ভটচার্জ্জি মশায়! দিদির কথাই ঠিক—তুমি অত গোল-মালে যেও না, যা রয়-সয় তাই করো! এতগুলি গুরুর মন্ত্র কি সর্ব্বেশ্বর অবহেলা ক'র্তে পারেন?

দুই তিন ঘণ্টা সর্ব্বেশ্বরের অপেক্ষায় থাকিয়া, যখন সকলে উঠি উঠি করিতেছেন—সর্ব্বেশ্বর আর আসিবে না, তাহার বুঝি জাঁকাইয়া শ্রাদ্ধ করিবার মত নাই, তাই লজ্জায় আসিতেছে না। অতএব আর কেন, চল সকলে বাড়ী যাই! এই বলিয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন—ধূমপান করিয়া এইবার সকলে উঠিবেন—এমন সময় সর্ব্বেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পাড়ার সমাজপতি মধু মুখুজ্যে মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন—এস বাবা সর্ব্বেশ্বর! আমরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছি; এতদিন এ বাটীতে আসি নাই—আজ দেখছি দাদা ও বউয়ের বিহনে বাস্তবিক ভট্টাচার্য্যের গৃহ অন্ধকার হ'য়েছে, আর সে শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। অপর একজন বলিল—তাত' হবেই, তেমন মহাত্মার স্বর্গ-গমনে গৃহ ত' অন্ধকারময় হবেই—যত দিন থেকে তিনি পাড়া ছেড়ে কাশী গিয়েছেন—ততদিন পাড়ারই বা কি শ্রীসৌন্দর্য্য আছে? তাঁহার অবস্থান সময়ে পাড়ায় যে একটা গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান ছিল, দায়-দফায়, উৎসব আমোদে যে একটা সজীবতা দেখা দিত, তাহা কি আর এখন আছে? আর কাহারও দ্বারা যে থাকিবে বলিয়াও বোধ হয় না। অপর একজন বলিলেন—তাহা না থাকাই সম্ভব—তিনি সকল বিষয়ে সমজ্‌দার ছিলেন—কত? দেব দাদার কাছে যেন অজানা

কিছুই ছিল না, সকল বিষয়েই দাদার আমার অভিজ্ঞতা ছিল, মরি মরি তেমন লোক কি আর হবে ?

তাঁহাদের কথা শুনিয়া আন্তরিক না হউক, বাহ্যিক সর্ব্বেশ্বরের চক্ষু একটু ছল ছল করিতে লাগিল—মধু মুখুজ্যে মশাই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বাবা! কান্না কি, তিনি ত' বেশ গেছেন ; তোমাদের দুইটী উপযুক্ত ভাইকে রেখে গেছেন— আর কি, মানুষ ত' আর চিরদিন বাঁচতে আসেনি বাবা ? যেতেই হবে—তবে ছেলে-মেয়ের প্রাণে আর সে শোক না লেগে থাকে কি ক'রে। যাহ'ক বাবা! শান্ত হও ; এখন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাধা ক'রে তাঁদের পরকালের পথ মুক্ত কর—ছেলের উপযুক্ত কাজ কর !

সর্ব্বেশ্বর এইবার ঈষৎ ধরাগলায় বলিলেন—জেঠামশাই ! আপনি বলিলেন বটে, আর করাও উচিত, কিন্তু আমার এই কয় বৎসর কিরূপ দুঃসময় যাচ্ছে—তা ত' দেখছেন ; সপরিবারে রোগ ভোগ, এখানে কিছু হ'লো না, তারপর কল্‌কাতাতে থেকে অজস্র টাকা খরচ ক'রে তবে এখন একটু মন্দের ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে ; এ অবস্থায় আমি কি করি বলুন ; দেনাপত্তর ক'রে কি কাজ ক'র্ত্তে আপনি পরামর্শ দেন ?

মধু। না না বাবা! সে পরামর্শ আমি দিতে পারি না ; কারণ এ ত' আর কন্যে-দায় নয়—যে বরের বাপের খাঁড়ার ঘা সহ্য কর্‌বার ভয় আছে। এতে তুমি যেমন পারবে, তেমনি ক'র্ব্বে।

সর্ব্বেশ্বর। তাই ব'লছি, জেঠামশাই ! আমার এখন বড় অসময়, হাতে একটী পয়সাও নাই।

মধু। বাবা! দুঃসময়েই বাপ মা মরেন,—তার আর ভাবনা কি, তুমি যা পারবে—তাই কর। তবে আমরা তাকে বড় ভাইয়ের

মত দেখ্‌তুম—তাঁর কাজে কোনরূপ দুর্নাম না হয়, এই আমাদের স্বতঃপরতঃ চেষ্টা।

সর্ব্বেশ্বর। তা'ত' বটেই; আমি দুই তিন শত টাকার বেশী এখন খরচ ক'র্ত্তে পারি না।

মধু। দুই তিন শত টাকায় বৈদিক কার্য্য কিছুই হবে না, তবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হ'তে পারে।

মধু মুখুজ্যে রামেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—রাম! তোমার মত কি?

রামেশ্বর বলিলেন—জেঠামশাই! যখন তাঁহাদের সজ্ঞানে ঐরূপ কাশীলাভ হ'য়েছে, তখন বৈদিক কার্য্য বৃষোৎসর্গ হওয়াই উচিত, দাদা যাহা পারেন দিন, আমিও ক্ষমতানুসারে কিছু দিব। আপানারা তাঁহারই অনুষ্ঠান করুন।

দুই ভাইয়ের মতামত লইয়া বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধেরই ব্যবস্থা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে খুব সমারোহে দেবানন্দ ও উমাকালীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইল। দাদা ও বড়বউয়ের শ্রাদ্ধে দাক্ষায়ণীও তাঁহার কাট্‌না কাটা ধন কিছু বাহির করিয়া সাহায্য করিলেন; পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবারা চরকায় সুতা কাটিয়া তাহার আয় হইতে অনেক ছোট-খাটো ধর্ম্মকর্ম্মে বেশ দুপয়সা খরচ করিতেন—এ সব অতি অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া আমাদের সংসার হইতে এখন এরূপ অনেক গৃহ-শিল্প একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে।

রামেশ্বর দুই হাজার টাকা, সর্ব্বেশ্বর বহু কষ্টে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন—আর দাক্ষায়ণী দুই শত, এই প্রায় তিন হাজার টাকায় তখনকার সস্তাগণ্ডার দিনে পাড়াগাঁয়ে কিরূপ সমারোহে স্বর্গীয় দেবানন্দ ও উমাকালীর আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল—তাহা সকলেই অনুমান

করিতে পারিতেছেন। শ্রাদ্ধে খুবই ঘটা হইয়াছিল; অধ্যাপক বিদায়—আর পাঁচ ছয় খানি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্র ভোজন ত' আছেই, তাহার উপর অতিথিভোজন ও কাঙ্গালীবিদায়ে একহাড়ি করিয়া চিড়ামুড়কী, নারিকেল নাড়ু ও দুই আনা করিয়া পয়সা দিয়া সর্ব্বেশ্বর ও রামেশ্বর পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেবানন্দের শ্রাদ্ধ শুনিয়া দেশবিদেশ হইতে বহু অতিথি আসিয়াছিল—তাহারা কেহই বিমুখ হয় নাই—সকলকেই গুরুর আদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিদায়ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব্বেশ্বরের কাছে যত না হউক, ধর্ম্মভীরু রামেশ্বরের বিনম্র বচনে ও করযোড় আহ্বানে সকলেই কায়মনে দেবানন্দ ও উমাকালীর স্বর্গ কামনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরে কমলেশ্বর ভগ্নীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ পিতৃ অনুমতিক্রমে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। কমলেশ্বরের সরল প্রকৃতি ও সুমিষ্ট ভাষে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল, অত অর্থের মালিক হইয়া তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সুখ্যাতি কে না করিবে? কমলেশ্বর চলিয়া গেলে সকলেই "খুব সদ্‌বংশের ছেলে বটে" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিল। ছোট বউমা তারই ভাই; ওর দ্বারা এ সংসারে আবার সুখের হাওয়া বহিবে বলিয়া সকলেই স্থির বিশ্বাস করিল।

এখন হইতে আর ভাই ভাইয়ে তত মনোমালিন্য নাই। সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে পারিয়াছেন—রামেশ্বর খুব বড়লোকের বাড়ী বিয়ে ক'রেছে—তাহাদের দৌলতে উহার আর কোন অভাব হইবে না। দেখিয়া শুনিয়া প্রমোদার মনে একটু হিংসা হইল। ছোট বউয়ের এত রূপ, এত গুণ, বাপের একমাত্র মেয়ে—এত টাকা, তথাপি তাহার চালচলন কিছু নাই—যা পায় তাই খায়—যা পায় তাই পরে। হেমলতা ও

ভবানী এখন খুড়ীমার গলার হার হইয়াছে; তাহারা আর মা দিদিমা বা মামার কাছে যায় না, সদাসর্ব্বদাই খুড়ীমার আচল ধরিয়া কাকার অপরিমিত আদর-যত্নেই প্রতিপালিত হয়। যেখানে আদর-যত্ন বেশী, ছোট ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠতা সেখানে তত অধিক; দেবতার হৃদয় যে সদাই ভক্তিশ্রদ্ধার পরম প্রিয়; শিশু-হৃদয়ও তাই—দেবভাবে গঠিত; যেখানে আদর ভালবাসা পাইবে, সেইখানে তাহারা আত্মভোলা হইয়া পরকে আপনার করিয়া লইবে। ভালবাসা পাইলে পরকে যখন তাঁহারা আপনার করিয়া লইতে পারে—তখন এ ত' খুড়াখুড়ী, পিতামাতার সমস্থানীয়, তাঁহাদের আপনার করিয়া লইবে এর আর আশ্চর্য্য কি?

রামেশ্বর বহুদিনের পর বংশের দুলাল ভবানীকে বুকে লইয়া জুড়াইলেন। হেমলতা খুড়ীমার আঁচলে আঁচলে ঘুরিতে লাগিল, ঠাকুরমা দাক্ষায়ণী ডাকিলে বরং কাছে যাইত কিন্তু দিদিমা বা মামা ডাকিলে তাহারা ঘৃণার হাসি হাসিয়া পলায়ন করিত। প্রমোদা নিজের হাবভাব লইয়াই ব্যস্ত—এত বয়স হইয়াছে, তথাপি সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার লইয়াই ব্যস্ত। ছেলেপিলেকে কোলে-কাঁকে করিতে তিনি কখনই পারিতেন না, এখন তাহারা নির্ম্মলা ও রামেশ্বরের নিকট বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করায়, তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন বেশ-বিন্যাসের খুব সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। এত ঘসামাজা, এত কাপড় গহনা, তথাপি রূপের বাহার ত' কই হয় না? মাজিলে ঘসিলেই যদি তাহা হইত—তাহা হইলে জগতে কুরূপা আর কেহ থাকিত না। রূপ যে ভগবান প্রদত্ত, তাঁহার আশীর্ব্বাদ না হইলে হওয়া অসম্ভব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একান্নবর্ত্তিতা।

সংযমী না হইলে সংসারে সুখী হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের দ্বারা আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করিতাম; ভোগ-বিলাসের মোহজাল ছিন্ন করিয়া প্রথমেই আমরা কষ্ট-সহিষ্ণু হইতে, আহার নিদ্রায় মিতাচারী হইতে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতিমান হইতে শিক্ষা করিতাম বলিয়া সংসার-আশ্রমের কঠোরতা, তাহার আপদ-বিপদ, সুখ দুঃখ আমাদিগকে কোনও প্রকার বান্-চাল্ করিতে পারিত না। পাকা মাঝীর ন্যায় এই ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল মহা আবর্ত্তময় সংসার সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা অনায়াসেই বাণপ্রস্থের তট-সন্নিধানে আসিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিবার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রমে ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে পারিতাম। এই আশ্রম চতুষ্টয়ে উত্তীর্ণ হইতে হইলে যে পাকা ব্রহ্মচারী, পাকা সংযমী হওয়া আবশ্যক- তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, এই সংযম শিক্ষা ছিল বলিয়াই তখন আমাদের সংসার এত সুখের হইত।

আমাদের রামেশ্বর আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিশেষরূপে পালন করিয়া, সংযমের হাল দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ আজ সংসার-পথে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন। অতএব তাঁহার সংসার যে সমুজ্জ্বল হইবে—এ আশ্রমে যে তিনি চির-সুখী হইবেন—ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতিমান হইয়া যে আদর্শ গৃহী হইতে পারিবেন—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আদর্শ সংসার স্থাপন করিতে হইলে গৃহীকে মনোরমা ভার্য্যা গ্রহণ

করিতে হয়, সংসারের একমাত্র সহায়রূপিণী পতিব্রতা পত্নী না হইলে সংসার-কার্য্য সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয় না; এইজন্য সংসারী মাত্রেরই মনোরমা পত্নীর আবশ্যক; ইহাই সংসারের সার-রত্ন। এই রত্ন লাভের জন্যও আমরা দেবী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করি—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি"।

দেবীর কৃপায় রামেশ্বরের সে রত্ন লাভ হইয়াছে, তবে আর তাঁহার সংসার প্রবেশের পথে বাধা-বিঘ্ন কি? যিনি আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া অশেষবিধ শাস্ত্রপাঠ, ব্রাহ্মণের নিত্য আবশ্যকীয় সন্ধ্যাবন্দনাদিতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইয়া নির্ম্মলার ন্যায় পরম পতিব্রতা সংযমশালিনী বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী লইয়া সংসার-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন— তাঁহার সে আশ্রমে শ্রেয়োলাভ হইবে না ত কি?

পিতৃশ্রাদ্ধের পর উভয় ভ্রাতায় একান্নবর্ত্তী হইয়াই বাস করিতে লাগিলেন। একান্নবর্ত্তিতা যে সংসার-আশ্রমের পক্ষে অত্যন্ত শুভ-জনক, রামেশ্বর তাহা বুঝিতেন। এইজন্য তিনি তাহাতে কিছুমাত্র অমত না করিয়া দাদার সহিত একত্র সংসার-আশ্রমে আবার মজিয়া পড়িলেন। বৌদিদি একটু প্রখরা—কলহপ্রিয়া কিন্তু নির্ম্মলা যে সদ্‌-গুণের আকর, সে যে বড় জায়ের মান বুঝে, তাই তাহার কর্ত্তৃত্ব মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়া লইবে। পুত্র-কন্যার সমস্ত ভার নিজে বহন করিবে— তবে আর কলহ হইবে কেমন করিয়া, কেমন করিয়াই বা বড় জায়ের নিকট সে অপ্রিয় হইবে? সকলে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খাওয়ার তুল্য কি আর সুখ আছে? নির্ম্মলা তাহা বুঝেন, তিনি কখন পৃথকান্ন হইয়া থাকিব বলিয়া স্বামীকে মন্ত্রণা দেন নাই; এ প্রবৃত্তি তাঁহার মনের কোণে একদিনও স্থান পায় নাই; আর রামেশ্বরের ত' কথাই নাই! বরং তিনি দাদাকে ইহার জন্য বার বার নিষেধ করিতেন, বলিতেন—

"দাদা! দশের লাঠী একের বোঝা" সকলে মিলে-মিশে দুঃখ-বিপদ ভোগ করিলে তত কষ্ট হয় না—যত কষ্ট একাকী সহ্য করিতে হয়। একা-ভেকা, একটা সামান্য বিপৎপাত হইলে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকে কিন্তু পাঁচ জন একত্র তাহা ভোগ করিলে হৃদয় স্বভাবতঃই সাহস-বদ্ধ হইয়া থাকে; সে দুঃখ-কষ্ট আর তেমন করিয়া একার মনপ্রাণ পুড়াইয়া খাক্ করিতে পারে না। সংসারে আপদ্ বিপদ্, দুঃখ—কষ্ট ত' আছেই—ইহার হাত ত' কেহ এড়াইতে পারে না! এই জন্য সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাল কাটান একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বেশ্বর যে তাহা না বুঝেন—তাহা নহে। তবে তাঁহার মন্ত্রিগণ সময়ে সময়ে কুমন্ত্রণার দ্বারা ভিন্ন পথে চালিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করেন। এই যে এত বড় একটা বিষম দায়িত্ব-ঝড় মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—সর্ব্বেশ্বর এত টাকার মালিক হইয়া, ভোগ-বিলাসে এত টাকা নষ্ট করিয়া এই কর্ত্তব্য-পালনের সময় যে এইরূপ অবহেলা প্রকাশ করিলেন—তাহা তাঁহার মন্ত্রণাদাতাদের গুণে নয় কি? সে দায়িত্ব রামেশ্বর সাম্‌লাইয়া লইলেন—তাই; নতুবা দেবীপুরের ক্রিয়াবান্ ভট্টাচার্য্য-বংশে কিরূপ একটা ভীষণ কলঙ্ক ঘোষণা হইত? বাস্তবিক কি সর্ব্বেশ্বর পিতামাতার শ্রাদ্ধে কিছু খরচ করিতে পারিতেন না? স্ত্রৈণতাই যে তাঁহার মনুষ্যত্বের হানি করিতেছে—মাথা তুলিবেন কেমন করিয়া?

ছোট হইয়া বড়র দোষ দেখা উচিত নয়। রামেশ্বর দাদার দোষই দেখিলেন না, কার্য্য ত, একপ্রকার সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—তা দাদাই করুন, আর আমিই করি—পিতার কাজ ত' বটে; দাদা আর আমি কি ভিন্ন? রামেশ্বরের উদার চিত্তে এ সকল ভিন্ন ভাব মোটেই উদয় হইল না। যাহারা না জানে, তাহারা বুঝিল—সর্ব্বেশ্বরই

সমস্ত খরচ করিয়াছে। রামেশ্বর সদানন্দময় পুরুষ—হাসি-খেলায়, শাস্ত্র-পাঠে, পূজাহ্নিকে পূর্ব্বের ন্যায় দিন কাটাইতে লাগিলেন—সংসার তাপ তাঁহার গায়ে লাগিতে পায় না; যাহা লাগে তাহা নির্ম্মলার গায়ে। এত বড়লোকের মেয়ে হইয়াও তিনি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করেন—স্বামীর গায়ে একটু আঁচ পর্য্যন্ত লাগিতে দেন না। তাহা হইলে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নামে কলঙ্কপাত যে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে! যেমনি স্বামী, তার তেমনি স্ত্রী না হইলে কি সংসারে ধর্ম্মের আসন সুদৃঢ় হয়?

কলিকাতার বাসা এখন বন্ধ—সর্ব্বেশ্বর এখন বাটী হইতেই যাওয়া আসা করেন। চাকুরীর মায়াত' তিনি ছাড়িতে পারিবেন না—ইংরাজী শিখিয়া যে তাহা হাড়ে হাড়ে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। আর কলিকাতায় না আসিলে তার রং-বিরঙ্গের বাবুয়ানাই বা কে দেখিবে; আর কাহার জন্যই বা করিবে—দেশে তাহা দেখিবার লোক কোথায়. সবই অশিক্ষিত, চাষা-ভূষার দল বই ত' নয়? ছোট ভাই রামেশ্বরের এক কাপড়, এক চাদর- পা প্রায়ই খালি থাকে—তবে বেশী দূরে যাইতে হইলে, কখন কখন একজোড়া চটী জুতা ব্যবহার করেন; কাপড় চাদর কখন গৈরিক রঞ্জিত, কখন সাদা—তাহার ঠিক কিছু নাই। নির্ম্মলা একখানি গৈরিক-রঞ্জিত লাল পাড় কাপড় ও মণিবন্ধে এওতের চিহ্নস্বরূপ দুই গাছি বলয় পরিয়া গৃহকর্ম্ম, ঠাকুর-সেবা প্রভৃতি কার্য্য করেন, পোষাকের পারিপাট্য তাঁহারও কিছু নাই। ঐ পোষাকেই তাঁহার সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি হয় যে, যে দেখে সেই সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া অনুমান করে—ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়, মা সম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারে না। ভগবান প্রদত্ত রূপের জ্যোতিঃ লইয়া যে জন্মিয়াছে, কৃত্রিম সাজ-সজ্জায় তাহার অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না;

অলঙ্কার বা পরিচ্ছেদের আবরণে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট ব্যতীত রক্ষা হয় না। প্রমোদা সৌন্দর্য্যশালিনী হইবার জন্য শরীরের খুব মাজা ঘষা করেন, আশা—খুব রূপসী হইবেন, সকলে তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্যের তারিফ করিবে কিন্তু তাহা হয় না বরং ক্রমশঃ যেন আরও মলিন হইয়া যাইতেছে; হৃদয়ে পর-হিংসার বিষ যত প্রবল হইতেছে—তত যেন আরও কালিমাময় হইতেছে—পূর্ব্বে যাহা ছিল—এখন তাহাও নাই। "যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা" অতি কুরূপাও যৌবনে সুন্দরী হয়। এখন যৌবনে ভাটা পড়িতেছে, কাজেই রূপের মালিন্য এ সময় অনিবার্য্য, তবে যদি প্রাণটা সাদা হইত, অত খল কপটতার আলয় না হইত, তাহা হইলেও পুণ্যের জ্যোতিতে সৌন্দর্য্যের একটা আভাস থাকিতই। প্রমোদা এখন অনুপম সৌর্য্যময়ী নির্ম্মলাকে দেখিয়া মনে মনে ফাটিয়া মরিতেছেন, মুখ ফুটিয়া যে কিছু বলেন নাই, এইটুকুই ঘোর সহিষ্ণুতা।

রামেশ্বর পিসীমার উত্তেজনায় আবার পিতৃ-কীর্ত্তি চতুষ্পাঠী স্থাপন ও অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। নির্ম্মলার উত্তেজনাও তাহাতে কম নহে। তিনি বলেন—যখন আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি, তখন এ সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইবে কেন? নির্ম্মলা প্রতি মাসে বাপের বাড়ী হইতে পঞ্চাশ টাকা মাসহারা পান, তাহা ত' এই কার্য্যে ব্যয় করিবেনই—দাক্ষায়ণী চরকা কাটীয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাও এই সৎকার্য্যে তিনি অকাতরে ব্যয় করিতে রাজী আছেন। তাহাতেও যদি কিছু কম পড়ে—এই জন্য রামেশ্বর শিষ্যবর্গের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছেন। দাদা ও বৌদিদিকে বলিলে ত' এ সকল বিষয়ে কোন সাহায্য হইবে না; তাঁহারা এতাবৎকাল যখন ঠাকুর বাড়ীতে পদার্পণই করেন না, মাটীর ঘরের কালী-ঝুলী গায়ে লাগিবে বলিয়া যখন সেখানে একবার উঁকিও

মারেন না, তখন এ বিষয়ে সাহায্য করা কি তাঁহাদের অভিপ্রেত হইবে?

তথাপি চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালার পুনঃ সংস্কার করিবার জন্য রামেশ্বর একদিন প্রকারান্তরে সর্ব্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—ভাই! ও সকল বাজে কাজে আর সময় নষ্ট ক'রো না, উহাতে আর্থিক উন্নতি কিছুই হইবে না—যেরূপ সময় পাড়িয়েছে, তাহাতে টাকা-কড়ির দরকার, নতুবা মান-সম্ভ্রম কিছুই বজায় রাখিতে পারিবে না। দাদার মুখে এই উত্তর শুনিবার পর রামেশ্বর আর তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন—ভাই! চতুষ্পাঠী না হইলে আমি কিছুতেই দেশে থাকিতে পারিব না, অধ্যাপনা না করিলে আমি সমস্তই ভুলিয়া যাইব, এজন্য দেখি যদি শিষ্যবর্গ কিছু সাহায্য করে। এ সমস্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে হইল না দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

স্বামী আহারাদির পর দূরদেশে কয়েক জন বিশিষ্ট শিষ্যের বাড়ী তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়াছেন; আসিতে রাত্রি হইবে। এইজন্য নির্ম্মলা সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, সকলকে আহারাদি করাইয়া দিদি যখন উপরে উঠিলেন এবং চঞ্চলা তাঁহার সেবা করিতে যখন উপরে গেল; মহিম ও তড়িৎ যখন আহার করিয়া চলিয়া গেল, দিদির জননীও যখন কন্যার সহিত গল্প করিতে তদনুবর্ত্তিনী হইল, তখন নির্ম্মলা ভবানী ও হেমলতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সেই ঠাকুর-বাড়ীর সংলগ্ন মেটে ঘরে আসিয়া পিসীমার চারকা কাটার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সর্ব্বেশ্বর নিজের বাসোপযোগী পাকা বাড়ী স্বতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন—পূর্ব্বের কাঁচা ঘরে তাঁহারা বাস করিতেন না। রামেশ্বর এই সকল কাঁচা ঘর দখল করিয়াছেন—তাঁহার এই সকল

খড়ের ঘর বড় ভাল লাগে। অনেক পাকা ঘরও ইহার মত আরামপ্রদ নহে। সৌন্দর্য্যে যে পাকা ঘর অপেক্ষা ইহা কম নয়ন-মনোহর তাহাও নহে। ইহার চালের ছিমুটী, নানাপ্রকার কারুকার্য্য এবং দেওয়াল গাত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল কোন অংশেই অট্টালিকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তবে লোকের কেমন একটা চালচলন বাড়িয়া গিয়াছে—কেমন একটা বড়মানুষী ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাই এ সকল গৃহ এখন তাহাদের ভাল লাগে না। রামেশ্বরের চালচলন পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, কাজেই তাঁহার নিকট এ সকল গৃহের সৌন্দর্য্য সর্ব্বতোভাবে মনোহর, এই জন্য তিনি ইহাতেই বাস করেন। নির্ম্মলা চিরদিন অট্টালিকাবাসিনী হইলেও, প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় আজীবন প্রতিপালিতা হইলেও এ সকল গৃহে বাস করিতে তাঁহার যেন আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। স্বামীসহ কুটীরে বাস যখন স্ত্রীলোকের স্বর্গবাস অপেক্ষাও প্রীতিপ্রদ, তখন এমন তরুচ্ছায়া-শীতল মনোরম গৃহে তাঁহার সুখ হইবে না কেন?

আহারাদির পর দুপুরবেলা দাক্ষায়ণী চরকায় সূতা কাটিতেছেন; নির্ম্মলা তুলার পাঁজ প্যাকাইয়া দিতেছেন। ভবানী ও হেমলতা তরু-সমাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছে। আজ কাকা বাড়ীতে নাই—কাজেই পড়া ত' ভাল হইবে না; বালকদ্বয় খেলিতে মত্ত দেখিয়া নির্ম্মলা বলিলেন—কি গো! মা বাবা, আজ কি আর বই ছুঁবে না?

বালক ভবানী বলিল—খুড়ী-মা! তুমি একটু থামো, ঠাকুরমার কাজ করো; আমি হেমার খেলাঘর সাজিয়ে দিতে যাচ্ছি।

কচি কচি ছেলেকে পাঠাভ্যাসের জন্য অতিরিক্ত জেদ্ করা উচিত নয়। এই সকালে তারা কাকার কাছে প্রায় দুই ঘণ্টা পড়িয়াছে, এখন খাওয়া দাওয়ার পর একটু খেলা করুক—নির্ম্মলা তাহাদের আর কিছু না বলিয়া শাশুড়ীর কাজে মন দিলেন। শাশুড়ীর তুলা পিঁজিতে পিঁজিতে

বলিলেন—পিসী মা। এই বুড়ো বয়সে তুমি এতও পারো বাবু! দাক্ষায়ণী বলিলেন—বউ-মা! তুমি এসে ত' আমার পরিশ্রম অনেক কমে গেছে; ঘরের পাট ত' কিছুই ক'র্তে হয় না। যখন তুমি ছিলে না, তখন আমি এই হাতীর মত সংসার চালিয়ে কত সুতা কেটেছি; এখনকার মেয়েদের মত ঘুমানো বা বই পড়া আমাদের অভ্যাস ছিল না, যদিও বা কখন পড়িতাম—"রামায়ণ মহাভারত" আর পড়া না হ'লে, এই কাজেই মন দিতাম—দাদার কত সাহায্য হ'তো; ঘরের পৈতা ত' কিন্‌তেই হ'তো না—বার-ব্রতে কত পৈতা দিতাম, তার পর বেশী সুতা হ'লে তাঁতি-বাড়ী দিয়া কাপড় তৈয়ারী হ'তো, এ সকল কাপড় আমরা প'রতাম—এখনকার বৌ ঝিয়েরা আর এ মোটা কাপড় প'র্‌তে পারে না।

নির্ম্মলা। আচ্ছা পিসী-মা, সূতা ত' বিক্রী হয়?

দাক্ষায়ণী। কেন হবে না মা, যখন তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কাশী গেলেন—কিছুদিন পরে রামেশ্বরও যখন শরীর খারাপ হ'য়েছে ব'লে পশ্চিম চ'লে গেল, সর্ব্বেশ্বর এক পয়সাও কাশীতে তাঁদের খোরাকী দিলে না, মাগ-ছেলে নিয়ে কল্‌কাতায় রইলো, তখন এই সূতা বেচেই ত' আমি পেট চালিয়েছি, পূজা খরচ দিয়েছি, আর দাদাকে দশ পনর টাকা ক'রে সেখানে পাঠিয়েছি। পাছে বড় বউ মা জান্‌তে পারে 'পাছে তাদের চক্ষু টাটায়, এই জন্য ধার ক'রে দিচ্ছি ব'লে পাঠাতুম। মা, বামুনের বিধবার এই চরকাই ত' সব। এই জন্যই গিন্নিরা বল্‌তেন—

> চরকা আমার সোয়ামী পুত
> চরকা আমার নাতি;
> চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী॥

এখনকার মেয়েরা করে না তাই—নতুবা ছোট ছোট গৃহশিল্পতে যে বেশ দু পয়সা আছে। এই ক'রেই ত' আমার মা দাদাকে মানুষ

ক'রেছিলেন, তারপর নয় দাদা পণ্ডিত হ'য়ে এই সব ক'রেছেন। বাপ মারা যাবার পর মাই আমার বিয়ে দিয়েছেন, দাদাকে মানুষ ক'রেছেন— এই চরকা সম্বল ক'রে। মা, তখন কি আর এত বড়মানুষী ছিল, না এত কাপড় জামা ছিল! এই মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে আমরা মানুষ হ'য়েছি; এর তুল্য কি আর সুখ আছে মা! এ সকল শিল্প তখন ঘরে ঘরে ছিল—এখন ত' প্রায় উঠে যাচ্ছে। নির্ম্মলা অবাক্ হইয়া দাক্ষায়ণীর কথা শুনিতে লাগিলেন এবং পাঁজ পাকাইতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার বাস্তবিকই তখন অতীব সুখের ছিল, কেহ কাহার মুখাপেক্ষী হইত না। সকলে পরস্পর সাহায্য করিয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চেষ্টা করিত। যখন তাঁহারা প্রাঙ্গণের বিল্ববৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া এই কার্য্যে রত থাকিতেন—তখন তাঁহাদিগকে যথার্থ হিন্দু সংসারের লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী কর্ম্মযোগিনী বলিয়া অনুমান হইত।

প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা এ সকল শিল্পকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া দাক্ষায়ণী গৃহদেবতার আরতির উদ্যোগ করিতেন, নির্ম্মলা সংসারকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। ভবানী ও হেমলতা কিছু জলযোগ করিয়া পাঠাভ্যাসে রত হইত। আর প্রমোদা আরসী-চিরুণী-সাবান-তোয়ালে লইয়া চঞ্চলার দ্বারা কেশ বিন্যাস করিতে বসিতেন। প্রমোদা ও নির্ম্মলা দুইটী স্বতন্ত্র জীব—একটী রূপের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিতেন—তাহার গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেন অথচ তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না বরং কৃত্রিম উপায়ে ভগবদ্দত্ত রূপের বাহার নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। আর একজন রূপ-যৌবন নিশার স্বপন মনে করিয়া, তাহার সেই ঈশ্বরদত্ত অতুলনীয় বাহ্যিক রূপের দিকে দৃক্পাত না করিয়া, ভিতরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। তাহাতে যেন তাঁহার বহিঃ সৌন্দর্য্য নষ্ট না হইয়া বরং ভিতরের রূপ বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইয়া সে কমনীয় জ্যোতিঃ লোকের

মন ধাঁধিয়া দিত। সকলেই ভক্তির সহিত সম্মান করিয়া বলিত—ভট্টচার্য্যি মহাশয়ের ছোট বউটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এমন না হ'লে কি বউ? প্রমোদা সে সুখ্যাতি শুনিয়া ফাটিয়া মরিত; কোনও রূপ ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সহিত কলহ করিবার জন্য ছিদ্রান্বেষণ করিত, কিন্তু ছিদ্র কোথায়? নির্ম্মলার যে সমস্তই গুণ, তাহাতেই যে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই রূপ-গুণের জন্য সকলেই তাঁহাকে মাতৃ রূপে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত—প্রীতির পুষ্পাঞ্জলীতে তাঁহার পূজা করিত। কেবল বড় জায়ের ও তাঁহার মায়ের নিকট তিনি আদরের পাত্রী হইতে পারেন নাই; মুখে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে তাঁহারা হিংসায় ফাটিয়া মরিতেন। সর্ব্বেশ্বর ছোট বউয়ের সুখ্যাতি করিতেন বলিয়া তাঁহারা রাগে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া দুই তিন দিন কথা কহিতেন না। নির্ম্মলাকে সুনজরে সকলেই দেখিত—সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত, কেবল সুনজরে দেখিত না, ভক্তি করিত না একজন—সে মহিমচন্দ্র। যেদিন হইতে নির্ম্মলার রূপ তাহার নয়নপথে পতিত হইয়াছে—যেদিন হইতে এ অপরূপা সৌন্দর্য্যময়ী রমণীকে সে প্রথম দর্শন করিয়াছে—সেইদিন হইতেই তাহার অন্তরে কি একটা উৎকট ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সে মনে করে—এমন রূপ, এমন গড়ন কি মানুষের থাকে? আগুণের তেজে পিপীলিকা যেমন ঝলসিয়া যায় অথচ কাছে আসিতে পারে না—মহিমও সেইরূপ হইত; আপশোষে গুমরিয়া মরিত—তবু কাছে ঘেঁসিতে পারিত না—পাছে তেজোময়ীর তেজে সে পুড়িয়া মরে। আশার আশ্বাসে সে সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল কিন্তু বৃথা। চাঞ্চল্য না পাইলে ত' ব্যাঘ্র ঘাড়ে পড়িতে পারে না, এ যে চিরস্থিরা, চাঞ্চল্য-বিহীনা, নতাননে চির কমনীয়তাময়ী। স্ত্রীলোকের চাঞ্চল্য না দেখিলে কাহার সাধ্য ওৎ করিয়া ঘাড়ে পড়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ সংযমী,ধর্ম্মবিশ্বাসী পুরুষ কখন পরের মুখাপেক্ষী হয় না। আত্মনির্ভরশীল না হইলে, আপনি দাঁড়াইতে না পারিলে কে কবে উন্নত হইতে পারিয়াছে? ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ ব্যক্তি চির তেজস্বী; কোন প্রকার দুর্ব্বলতা সহজে আশ্রয় করিয়া এ পুরুষ-সিংহকে কখননিরুৎসাহিত করিতে পারে না—ব্রহ্মচর্য্যের তেজ এমনি প্রখর—এমনি পরাক্রান্ত! সে বিলাসিতার ধার দিয়াও যায় না; নিজের জন্ম দু'দশ সের মোট বহন করিতেও সে লজ্জা বোধ করে না। শারীরিক পরিশ্রমে সে সতত অভ্যস্ত, তাই তাঁহার দেহ কখন রোগজীর্ণ হয় না, জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এখনকার মত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে জীবলীলা সাঙ্গ করিতে হয় না; কাজের খতম হইতে তাহার অনেক দেরী লাগে, ভবিষ্যতে কলির পূর্ণ পরমায়ু লাভে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকে।

রামেশ্বর সংযমী যোগী, এতদিন নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া এই তাঁহার সংসারপথে প্রথম প্রবেশ। তাহার উপর মনোরমা পত্নী, প্রবেশের পথে সহধর্ম্মিণীরূপে সাহায্য তৎপরা, কাজেই রামেশ্বরের হৃদয়ে উৎসাহের নূতন বাণ ডাকিয়াছে—কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই সুসম্পন্ন করিতে হইবে—"শরীরং পাতয়েয়ং বা মন্ত্রং সাধয়েয়ং।" চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে কোনও প্রকার উৎসাহ প্রদান না করিলেও, পুত্র হইয়া পিতামাতার সৎকীর্ত্তি বজায় রাখিব এইরূপ প্রতীজ্ঞা করিয়া রামেশ্বর বাটীর বাহির হইলেন। কয়েকজন

বিশিষ্ট শিষ্যের নিকট আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন! রামেশ্বরের ধর্ম্ম-প্রাণতায় শিষ্যবর্গ বহু দিবস হইতে মুগ্ধ ছিল—তাঁহার সদ্বিষয়ে মতিগতি দেখিয়া খুব আনন্দের সহিত তাহারা সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। দাক্ষায়ণীও বলিয়া দিয়াছেন—তুমি দাদার কীর্ত্তি বজায় রাখ—আমি তোমায় সাহায্য করিব। তারপর শ্বশুর ও শ্যালককে পত্র দ্বারা জানাইলে তাঁহারাও পরম উৎসাহিত করিলেন।

রামেশ্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় জীর্ণ ভূপতিত গৃহ সকল সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। দাদার কাছে সমস্ত বলিলেন—কিছুই গোপন রাখিলেন না। বড় ভাই পূজনীয় তাঁহার অমতে কি কোন কাজ করিতে আছে? সর্ব্বেশ্বর—পাগলামী বলিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কারণ এখন ত' সে কিছু কিছু সংসারে সাহায্য করিতেছে; পুত্র ও কন্যাটীর সমস্ত ভার ত' সে বহন করিতেছে; কাকা ও কাকী না হইলে যে ভবানী ও হেমলতা একদণ্ড থাকিতে পারে না। এ ভারটা লওয়াতেও তাঁহাদের অনেকটা আসান হইয়াছে—নতুবা যে পাজি ছেলেমেয়ে—যে আব্দার ধরিবে, তাহা না করিলে কি আর রক্ষা আছে? সে বিদ্‌ঘুটে আব্দার সহ্য করা যে তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত। বার মাসে তের পার্ব্বণ কর—গরীব দুঃখীকে ডাকিয়া খাওয়াও—তাহারা মাঝে মাঝে এইরূপ গরীবলোক ডাকিয়া আনিয়া বড়ই অস্থির করে। এখন সে সখ রামেশ্বর ও নির্ম্মলার উপর দিয়াই তাহারা মিটাইতেছে, বাপ মাকে আর কিছু বলে না। খুড়াখুড়ী তরলমতি বালক-বালিকার এই সময় হইতে ধর্ম্মে এত অচলা ভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান, মুখচুম্বন করিয়া বলেন—বাবা! বড় হ'লেও তোরা এই সকল কাজ ক'র্ত্তে পার্‌'ব ত'? ভবানী ও হেমলতা সমস্বরে বলে—হাঁ কাকা! এখন থেকে শিখ্‌লে পার্‌বো বই কি, খুব পার্‌'বো! পুত্র ও কন্যাটী ঠিক পিতৃকুলের

ধাতই পাইয়াছিল—মাতুলকুলের ধার দিয়াও তাহারা যায় নাই—এই রক্ষা।

অনেকে বলেন :—ধর্ম্মকর্ম্ম ছেলেবেলা থেকে করা কেন ? বড় হ'লে—বেশী বয়স হ'লে, জীবনের বেলাভূমিতে উহা করণীয় কার্য্য। এখন হইতে ও সমস্ত শিক্ষা করিলে—ছেলেপিলে অধঃপাতে যাইবে ; এখনকার মহা পুরুষদের ধারণা এইরূপ। ধর্ম্ম করিলে ছেলে অধঃপাতে যায় বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা করিলেই যে উত্তর কালে বালকবালিকারা উন্নতির চরমসীমায় উত্তীর্ণ হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, এ ধারণা তাঁহাদের নাই।

ধার্ম্মিকবংশের ছেলে হইয়া, পরম ধার্ম্মিক দেবানন্দ ও উমাকালীর বংশধর হইয়া সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, তাই এত ধনের অধিপতি হইয়াও তাঁহারা একদিনের জন্য অন্তরে বিমল সুখানুভব করিতে পারেন না। বয়স বেশী নয়—তথাপি একটা ব্যাধি প্রত্যহ তাঁহাদের দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াই আছে। আমরা একদিনও তাহাদিগকে হাসিমুখে কথা কহিতে দেখি নাই—সদাই যেন বিমর্ষ, কি যেন একটা আন্তরিক অশান্তিতে তাঁহাদের হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। আর রামেশ্বর ও নির্ম্মলার প্রাণে অসুখের লেশমাত্র নাই, সদাসর্ব্বদা মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, প্রাণ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল,—দুঃখ যেন তাঁহাদের দিক দিয়াও যাইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যে দেহ সুপুষ্ট, সবল ;—কাজেই কোনও প্রকার ব্যাধি তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে পারে না।

পুরাতন গৃহ সমস্ত সংস্কৃত হইলে তাহাতে একে একে অতিথি সমাগম হইতে লাগিল। গৃহদেবতা দামোদরের ও দেবী ভবানীর ভোগাদিরও সুবন্দোবস্ত হইল। দেবানন্দের পুরাতন ভদ্রাসন বাটী প্রায় পাঁচ সাত বিঘা জমির উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহা সেকালের প্রচলিত

মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ, খড়ের ছাউনি। তবে তাহা কোনও অংশে কোঠা ঘরের অপেক্ষা হীন নহে। দুইখানি বড় বড় শয্যা-গৃহ, একখানি ভাণ্ডারগৃহ, একখানি গৃহদেবতা দামোদরের ও ভবানীর পূজা-গৃহ; তাহার পার্শ্বেই সুবৃহৎ রন্ধনশালা, ইহাই হইল অন্দর-মহল—চারিদিক সুউচ্চ মৃৎ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাঙ্গণে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দানে জনমণ্ডলীকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে একটী বিল্ববৃক্ষ, তাহার চারি ধারে ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী—এই স্থানে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণাদি অধিবাস কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। বাহির মহলে চণ্ডীমণ্ডপ অ[illegible] থিশালার জন্য একখানি বৃহৎ আটচালা—তাহার তিন দিক চাঁচের বেড়া ঘেরা, সম্মুখই চতুষ্পাঠীর বালকদিগের একটী বৃহৎ শয়ন-ঘর, ছা[illegible]গণ কখন সেই ঘরের দাওয়ায়—অথবা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাঠাভ্যাস [illegible]। তাহার উত্তর ধারে মরাই ও ধান্যের গোলা, তাহার পার্শ্বে ঢেঁকীশালা ও গোশালা অবস্থিত—ইহারও চারি ধার মৃৎ-প্রাচীর-বেষ্টিত [illegible] রের ও বাহিরের দিকে, প্রাচীরের ভিতরে দুই ধারে দুইটী [illegible] রোবর—গৃহবাসীর ও প্রতিবাসীর পানীয় জল প্রদান করে, [illegible] ত' গেল দেবানন্দের পিতার আমলের ঘর বাড়ী দেবানন্দ পুত্রের জন্য এই গৃহের অব্যবহিত ব্যবধানে চারি খানি ইষ্টক-নির্ম্মিত কুঠারী করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর সস্ত্রীক সর্ব্বদা তথায় বাস করিতেন। [illegible] সর্ব্বেশ্বর নিজে তাহাকে বাড়াইয়া দ্বিতল গৃহে পর্য্য-বসিত করিয়া[illegible] [illegible]া-পুত্র লইয়া তিনি সেই অট্টালিকাতেই অবস্থান করেন—পুরাতন বাটীর দিক দিয়াও পদার্পণ করেন না। এ সকল রামেশ্বরের অধিকারভুক্ত। তাহা হইলে দেবানন্দের ভদ্রাসন-বাটী কিরূপ ধরণে নির্ম্মিত [illegible] তাহা বুঝিতে পারিলেন কি? পল্লীগ্রামে

একজন খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হইলে, তাঁহার এরূপ সমাবেশ থাকা কখনই সম্ভব নয়।

নূতন বন্দোবস্তানুসারে সংসারের কাজ-কর্ম্মের ভার এইরূপে বিভক্ত হইয়াছে—প্রমোদা ও নির্ম্মলা প্রতিদিন সংসারের রন্ধন-কার্য্য করিবেন, চঞ্চলা দাসী তাঁহাদের সাহায্য করিবে! এই সকল কাজ করিয়া ছোট বউ, দাক্ষায়ণীর সহিত দেবতার ভোগ রন্ধন করিবেন, তাহাতে ছাত্রগণের এবং অতিথিগণের ভোজন সমাহিত হইবে। বাটীর ভাণ্ডার রক্ষা করিবেন—প্রমোদার জননী, আর অতিথিশালার ভাণ্ডার রক্ষা করিবেন—দাক্ষায়ণী। ভৃত্য গোবর্দ্ধন হাট-বাজার করিবে—গোরক্ষা করিবে। গোসেবা রামেশ্বর প্রাতঃকালে নিজেই সমাধা করিবেন—ইহার ভার তিনি কাহারও হস্তে দেন নাই—পাছে গোমাতাগণের সেবার ত্রুটী হয়, এই জন্য তিনি মনের মত করিয়া উহা সমাধা করিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হন—আসিয়া পূজাহ্নিক সম্পন্ন করেন! তড়িৎ ও মহিম বাহিরের কাজ-কর্ম্ম পরিচালনা করিবার ভার পাইয়াছেন। ঘরের রন্ধন-কার্য্য প্রমোদা ও নির্ম্মলার করিবার কথা কিন্তু প্রমোদা প্রায়ই তাহা করেন না—ইহার জন্য কোন প্রকার অভিযোগ করা, নির্ম্মলা ভালবাসেন না, তিনি পিসীমাতার সহিত নিজেই উহা সমাধা করেন। প্রমোদা সংসার-কার্য্যে পূর্ব্ব হইতেই পটু নহেন—ইহার জন্য তিনি শাশুড়ীর নিকট কত তিরস্কার খাইয়াছেন, তথাপি তিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে পারেন নাই।

সর্ব্বেশ্বর বেলা নয়টার মধ্যে আহার করিয়া অফিস গমন করেন। দেবীপুরের অনেকেই কলিকাতায় চাকুরী করেন, এই গ্রামে অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন কিন্তু সর্ব্বেশ্বর তাহাদের মত নহেন। তিনি এক স্বতন্ত্র প্রকারের লোক—কাহারও সহিত মিল নাই! ইংরাজী

শিখিয়া—চাকুরী করিয়া তিনি যেরূপ বাহাদুরী দেখান—যেরূপ অহঙ্কার করেন—সেরূপ আর কেহ করে না। অবশ্য তিনি একটা অফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও পাড়ায় সে ভাব দেখান কি ভাল? ঐ পদস্থ চাকুরীর জন্য অহঙ্কারে তিনি পাড়ার কাহারও সহিত মিশেন না। এজন্য তিনি কলিকাতায় একখানি বাড়ীও কিনিয়াছেন।

সর্ব্বেশ্বর সপ্তাহে দুই তিন দিন কলিকাতার বাটীতেই থাকেন। সেখানেও রাঁধুনী বামুন ও একজন চাকর আছে। সর্ব্বেশ্বর বিস্তর টাকা নষ্ট করেন—মাহিনার এক পয়সা ত' বাঁচেই না, তাহার উপর জমীদারী হইতেও টাকা লইতে হয়—আয় হইতেও তাঁহার খরচ এত অতিরিক্ত। কলিকাতার বাটীতে সপ্তাহে দুই দিন ইয়ার-বন্ধু লইয়া খুব খরচ করেন। দেশে রামেশ্বর আছেন—সেখানে ত' আর এ সকল বেয়াদপী চলিবে না, তাহা হইলে ছোট ভাইয়ের কাছে যে অপমানিত হইতে হইবে, এরূপ চরিত্রহীনতা দেখিলে রামেশ্বর গুরুরও খাতির রাখেন না—তা বড় ভাই ত' কোন্ ছার, পাড়াগাঁয়ে এ সকল কার্য্য করিবার তেমন সুবিধাও নাই —লোকে দেখিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সমাজচ্যুত করিবে; কিছু দিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে চরিত্রহীন মদ্যপায়ীর প্রতি লোকের এইরূপ বিদ্বেষই ছিল।

দেবীপুর হাওড়া জেলার মধ্যে একখানি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোকের বাস, আশ্বিন মাসে প্রতি গৃহেই প্রায় দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। সে কয়দিন ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকড়ার বাজনায় কাণ পাতা যাইত না; "দীয়তাং ভুজ্যতাং"য়ের ব্যাপারও খুব হইত। সকলের বাটীতে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব—কে কার বাটীতে খায়—তবে দীন-দরিদ্রগণ সেথায় পুত্র পারজন সহ খুব আদরের সহিত উদর পূর্ণ করিত। তখন দরিদ্র-সেবার জন্য সকলের একটা আগ্রহ ছিল—সামান্য

কাজ-কর্ম্ম হইলেও, দরিদ্রের ভোজন বাদ পড়িত না। সেই সময় গ্রামে দেবানন্দের বাটীর দুর্গোৎসবে এই সকল কার্য্য খুব জাঁক-জমকের সহিত সমাহিত হইত। দেবানন্দ গ্রামের মধ্যে সুপণ্ডিত, ক্রিয়াবান্, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, জাপক ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সে মান-সম্ভ্রম ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বেশ্বর তাহার জন্য অণুমাত্র দুঃখিত নহেন—সে বিষয় তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। টাকা খরচ করিয়া লোকজন খাওয়াইতে পারিলে, ক্রিয়া-কলাপ করিতে পারিলে পাড়ার লোক ভাল বলিবে, তাঁহার সুখ্যাতি করিবে; বংশের মান-মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে—পাড়াগাঁয়ে তাঁহার সে নামের দরকার নাই। বরং কলিকাতায় টাকা খরচ করিয়া খোস্-খানা প্রদান করিলে, তাঁহার বাবুয়ানা বৃদ্ধি হইবে; মান-মর্য্যাদারও ত্রুটী হইবে না। গ্রামে মান-সম্ভ্রম রহিল কিনা সর্ব্বেশ্বর তাহা দেখেন না—দেখিবার সময়ও তাঁহার নাই। রামেশ্বর কিন্তু ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন।

যাহাতে বংশের মান, তাহার কীর্ত্তি-কলাপ চির অক্ষুণ্ণ থাকে, রামেশ্বর দেশে আসিয়া আবার তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। চতুষ্পাঠীতে দুই তিন জন ছাত্র হইয়াছে, পিতার মত তিনি তাঁহাদের আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া রীতিমত ব্যাকরণ ও কাব্যের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। লেখাপড়া, আহার ও বাসস্থানের জন্য ছাত্রগণের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহারা ঠিক ঘরের মত এখানে থাকিতে পারে, রামেশ্বর ও নির্ম্মলা তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু ছাত্র এখন আর পূর্ব্বের মত জুটে না, দেব-ভাষা সংস্কৃতে এখন লোকের আর তত আস্থা নাই। এখন সামান্য ইংরাজী শিখিয়া দাসত্ব করিতে পারিলেই যেন তাহারা স্বর্গ হাতে পায়, এই জন্য রামেশ্বরের চতুষ্পাঠীতে দুই তিনটীর বেশী ছাত্র নাই। কয়েকজন এফ-এ ক্লাশের ছাত্র তাঁহার

নিকট কাব্য পাঠ করিতে আসেন; রামেশ্বর যত্নের সহিত তাহাদের অধ্যাপনা করান, সময় পাইলে তিনিও তাহাদের নিকট কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করেন, ভাষা শিখিতে দোষ নাই—রামেশ্বরের এ ধারণা চির বদ্ধমূল ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি রাজ-ভাষায়ও বেশ পাণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

অতিথিশালা একবার উঠিয়া গিয়াছিল—এই জন্য উহাতেও আর তত অতিথি সমাগম হয় না। পিতার আমলে পঁচিশ ত্রিশ জন অতিথি প্রত্যহ অবস্থান করিত, তাহাদের আহারাদি যোগাইতে হইত; এখন সবেমাত্র পাঁচ সাতটী। রামেশ্বর ইহাঁদিগকে দেবতার ন্যায় দেখেন; না খাওয়াইয়া স্বামী-স্ত্রীতে আহার করেন না। রামেশ্বর এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া বেশ মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছেন। ধর্ম্ম থাকিলে অর্থের অভাব হয় নাই, ভোগ-বিলাস-বিহীন অভাব-অভিযোগ ভগবৎ-কৃপায় বেশ সুখেই মিটিয়া যায়। অধর্ম্মের সহিত উপার্জ্জিত অর্থে হটাৎ বড়লোক হওয়া যায় কিন্তু তাহাতে প্রাণে শান্তি দিতে পারে না, তাহা বেশী দিন স্থায়ীও হয় না। ধর্ম্মে উপার্জ্জিত ও অধর্ম্মে সঞ্চিত অর্থে একটু পার্থক্য।

রামেশ্বরের শিষ্যবর্গ গুরুপুত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পবিত্র ক্রিয়া-কলাপ সকল দেখিয়া তাহারা প্রতি মাসেই তাহাদের প্রতিশ্রুতির টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। কমলেশ্বর ভগ্নীর মাসহারা ছাড়া প্রতি মাসে আরও অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তার পর যাজ্যক্রিয়া ও অপরাপর শিষ্যবাটী সকলের রামেশ্বর যাহা পাইতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ সুখে-সচ্ছন্দে দীন-দরিদ্রাইতে লাগিল। ধর্ম্ম কর্ম্মের সহায় ভগবান্—এ সকল কার্য্যে কখিত। ওখন্যান প্রকার অভাব হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ঋণের দায়।

অপব্যয়ে খরচ করিলে রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়—তা এ ত সামান্য জমীদারীর আয়, কতদিন থাকিবে? বিশেষতঃ সর্ব্বেশ্বর যে পরম ধার্ম্মিক রামেশ্বরকে ফাঁকি দিয়া নিজে জমীদারী ভোগ-দখল করিতেছেন, ধর্ম্মের চক্ষে এ সকল সহ্য হইবে কেন? অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতার অ'·বিক্ত খরচে সর্ব্বেশ্বর ভয়ানক ঋণ-দায়ে জড়িত হইয়া পড়িলেন।

তড়িৎ ঘোষ পুরাতন গোমস্তা—এ সংসারে বহুদিন কার্য্য করিতেছে। সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বেশ্বরকে খরচ কমাইতে বলিল কিন্তু হাত যখন খুলিয়া গিয়াছে অপব্যয়ে যখন ভয়ানক অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, কলিকাতায় দুই তিন দিন অন্তর যখন ন্যক্কারজনক আমোদ-প্রমোদ না করিলে বাবুর মেজাজ ভাল থাকে না, তখন আর খরচ কমাইবেন কেমন করিয়া, আর এখন একেবারে সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলে ইয়ার বন্ধুরাই বা বলিবে কি?

সর্ব্বেশ্বর ভাঙ্গিলেন—তবু মচ্‌কাইলেন না; কার্য্য-গতিকে তাঁহার অবস্থান্তর প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও তিনি প্রাণপণে তাহা ঢাকা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাটীর খরচ কম করিয়াও কলিকাতার খরচ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বড়বাবুর মতিভ্রম দেখিয়া তড়িৎ একদিন ছোটবাবুকে নির্জ্জনে অনেক কথা বলিল। বলিল—ছোটবাবু! আপনার অংশের জমীদারী বাবু অন্যায় করিয়া বেনামী করিয়া লইয়াছেন, আপনি এই সময় তাহার

জন্ত দাবী করুন, আমি আপনার পক্ষাবলম্বন করিব। নতুবা সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে—বড়বাবুকে পথের ভিখারী হইতে হইবে—আমি এত করিয়া বুঝাইতেছি—তথাপি তিনি কলিকাতার অপব্যয় কিছুতেই কমাইতে পারিতেছেন না, যদি না পারেন—তাহা হইলে এ বিষয় আর কত দিন ?

রামেশ্বর দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন—তড়িৎ ! আমার অংশের বিষয় বেনামী করিবার সময় ত' তুমি ছিলে- কই, তখন ত' আমাকে ইহার উদ্ধার জন্য একটী কথাও বলো নাই—এখনই বা বলিতেছ কেন ? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি এই কথা শুনিয়া দাদার বিপক্ষে দাঁড়াইব—আদালতে উঠিয়া মামলা করিয়া এই বিষয় পুনঃ গ্রহণ করিব ? তড়িৎ, আমার দ্বারা তাহা হইবে না, দাদার বিপক্ষে আমি কখনই আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ করিতে পারিব না—ইহাতে সমস্ত যায় যাক—তিনি ত' আর ছেলেমানুষ নন্—স্বইচ্ছায় যদি নষ্ট করেন ত' দোষ কার ? আর তাঁহার অদৃষ্টে যদি তাহাই থাকে, বৃদ্ধ বয়সে যদি কষ্ট-ভোগ তাঁহার অদৃষ্টের লিখন হয়, তাহা হইলে কার সাধ্য যে তাহা রোধ করে ! আমার বিষয় ত' আর পরে খায় নাই—বড় ভাই খাইয়াছেন। আমি ভবানী ও হেমলতাকে তাহা দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি—ইহাই মনে করিব, তথাপি দাদার বিপক্ষে লাগিতে পারিব না। একে ত' দেনার দায়ে তিনি যারপরনাই মনঃকষ্ট পাইতেছেন তার উপর আমি বিপক্ষ হইয়া সে কষ্টের মাত্রা বাড়াইতে পারিব না। তবে বাড়ী আসিলে আমি তাঁহাকে একবার বুঝাইয়া বলিব, কিরূপ হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিব।

তড়িৎ। তিনি এ সকল কথা বোধ হয়, আপনার নিকট প্রকাশ করেন না।

। না করিলে আমি কি করিব—আর তুমিই বা কি

করিবে; ভগবান্ যাহা করেন—তাহাই হইবে! তাহার জন্ত আর বৃথা দুঃখ করিয়া কি হইবে?

তড়িৎ। তা বটে কিন্তু ভাবানী ও হেমলতার ভাবনা বড় হয়—হেমলতা ত' প্রায় বিবাহের যোগ্যই হইল; কেমন করিয়া কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারি না; এই সময় হইতে সাবধান হইলেও কিছু কিছু রক্ষা হইতে পারে, নতুবা সবই যাইবে—কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

রামেশ্বর। আচ্ছা তড়িৎ আজ দাদা আসিলে আমি একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলিব, দেখি কি হয়?

তড়িৎ। তাই বলুন; যদি আপনার কথায় কতকটা ফল হয়—আমার নাম করিবেন না; লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন—এই কথা বলিবেন।

রামেশ্বর। সে জন্ত তোমার কোন চিন্তা নাই আমি কাহারও নাম করিব না।

এই কথা বলিয়া রামেশ্বর অতিথিশালাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তড়িৎও আপনার কাজে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সর্ব্বেশ্বর অফিস হইতে আসিলেন; হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিলেন। আজ কয়েক দিন হইতে তিনি অতিশয় বিমর্ষ, ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা কন না। একমনে নিভৃতে বসিয়া কি চিন্তা করেন। মহিমের সহিত সর্ব্বেশ্বরের যে এত কথা হইত—এখন আর তাহা হয় না; প্রমোদা ও তাঁহার শাশুড়ী ইহার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—অফিসে বিস্তর কাজ আসিয়া পড়িয়াছে. একাকী সাম্লাইতে পারিতেছি না—লোকজনেরও বন্দোবস্ত হইতেছে না; এইজন্ত এত ভাবনা। প্রকৃত কথা—ক্যাসের টাকা নষ্ট করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছেন না—বড় সাহেব আসিলেই ধরা পড়িতে হইবে—এখন উপায়

কি? ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অফিসে তাঁহাকে ক্যাসের কাজ ও বড়বাবুর কাজ করিতে হইত—যাবতীয় দায়ীত্ব তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল—এইজন্ত যে কোনও প্রকারে হউক উহা এখন তাঁহাকেই পূরণ করিতে হইবে—আর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। কলিকাতার বিষয় বিক্রয় করিয়া পূরণ করাই এখন স্থির হইয়াছে। চাঁপাতলার ছোট বাড়ীখানি রাখিয়া ভবানীপুরের বৃহৎ অট্টালিকাখানি বিক্রয় করিলেই হইবে। রামেশ্বরের বিষয় ফাঁকি দিয়া তাহারই টাকায় সর্ব্বেশ্বর কলিকাতায় এই বিষয় খরিদ করিয়াছিলেন। আহা! রাস্তার ধারের এমন রাজ-অট্টালিকা আজ যাইতে বসিয়াছে; ইহাতে প্রাণে একটু ধাক্কা লাগিয়াই থাকে?

এ সকল কথা সর্ব্বেশ্বর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই—এমন কি প্রমোদার নিকটও নহে। কেবল নায়েব তড়িৎ ঘোষ জানে—তাহারই দ্বারা খরিদ্দার যোগাড় করা হইতেছে; আর জানিয়াছে—তাঁহার অফিসের বন্ধু দুই একজন, তাহারা বুঝিয়াছে—সর্ব্বেশ্বর বড়ই বাড়িয়াছিল—ধার্ম্মিক ছোট ভাইকে ফাঁকি দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল—এইবার তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। এই অফিস-বন্ধুর মধ্যে তাঁহাদের পাড়ার একজন লোক ছিলেন—তিনিও একদিন রামেশ্বরকে এই কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু সেদিন তিনি তত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আজ তড়িৎ ঘোষের মুখে শুনিয়া রামেশ্বরের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল কিন্তু কি করিবেন—ভগবানের উপর, অদৃষ্ট-দেবতার বিপক্ষে কলকাটী নাড়া ত' মানুষের সাধ্য নয়!

প্রত্যহ আহারাদির পর সর্ব্বেশ্বর নিজ বাটীর বৈঠকখানার রোয়াকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন—তারপর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতেন। মত সর্ব্বেশ্বর আজও রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছেন—ভবানী

কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; অপর কেহ তথায় নাই দেখিয়া রামেশ্বর কাছে আসিয়া বসিলেন। ভাই-ভাইয়ে মনোমালিন্য তত কিছু ছিল না—যত ছিল বড বউয়ের সঙ্গে; বড়বউই কাহারও সঙ্গ ভালবাসিতেন না; [স্বামী পুত্র এবং বাপের বাড়ীর আত্মীয় লইয়াই তিনি বেশ সুখে থাকিতেন—অন্য সংস্রব তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হইত] ঘর যে ভাঙ্গিয়া যায়—ভাই ভাই যে পৃথক্ হইয়া পড়ে—এই পরের মেয়ের জন্যই, তবে পুরুষ যদি শক্ত হয়—তাহা হইলে এ অবস্থা প্রায়ই ঘটে না। পিতামাতার মৃত্যুর পর—রামেশ্বর গৃহবাসী হইলে ভায়ে ভায়ে আর সেরূপ অসদ্ভাব রহিল না। তাহার কারণ প্রমোদা এখনও তত কঠিনা হন নাই; নির্ম্মলার রূপ-গুণ এবং তাহাকে অত বড়মানুষের মেয়ে দেখিয়া কিরূপ চাল্ চালিলে, তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবেন, তাহা এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই; আর বাস্তবিক তাঁহার শরীরও এখন তত ভাল নয়; তাহাদের এখন বিগ্‌ড়াইয়া দিলে এই অসুস্থ শরীরে তাঁহাকেই ত' এক হাতে সাত শোল ধরিতে হইবে? স্ত্রী ঠিক আছেন বলিয়া স্বামীও ঠিক আছেন—স্ত্রৈণ পুরুষের গতিই এই।

রামেশ্বর কাছে আসিয়া বসিলে—সর্ব্বেশ্বর প্রথমেই বলিলেন—কেও রাম! এখনও কি খাও নাই?

রামেশ্বর। হাঁ৷ দাদা! এই খেয়ে আস্‌ছি!

সর্ব্বেশ্বর। বসো না তবে একটু!

শাস্ত্রপাঠী ধার্ম্মিক রামেশ্বর দাদাকে গুরুর মত মান্য করিতেন; আর সর্ব্বেশ্বরও কাণে মন্ত্রণা না পাইলে ভাইয়ের মত—স্নেহের সহোদরের মত ভালবাসিতেন। রামেশ্বর ছোট হইলেও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া স্নেহসূচক মান্যদানে তাহার আদর করিতেন—এ সময় তাঁহাদের ভিতর যে কোনও পার্থক্য আছে—তাহা কেহই জানিতে পারিত না।

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন— কাজকর্ম্মের এত ভিড় পড়েছে যে তিলমাত্র সময় পাই না—বাড়ীর কিছুই দেখ্তে শুন্তেও পারি না! আচ্ছা রাম! তোমার অতিথিশালা চতুষ্পাঠী কেমন চল্ছে? কয়টী ছাত্র ও অতিথি এসেছে?

রামেশ্বর। দাদা! এখনও তেমন যুৎ হয় নাই—তবে পাঁচ সাতজন অতিথি ও স্থায়ী ছাত্র তিনটী হ'য়েছে। আর ওপাড়ার রায়েদের দুইটী এফ, এ, ছাত্র সকাল বৈকালে আসিয়া কাব্য পড়িয়া যায়।

সর্ব্বেশ্বর। রাম! তুমি এফ, এ, ক্লাসের ছাত্রকে পড়াচ্ছ নাকি? তাদের পাঠ্যে হ'লে যে ইংরাজী জানা দরকার?

রামেশ্বর। এই কয়েক মাসের মধ্যে যা একটু একটু শিখেছি যে দাদা, প্রথম প্রথমে একটু বাধা ঠেক্তো এখন আর তা নেই।

রামেশ্বর ইংরাজী শিখিয়াছেন—শুনিয়া সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি তাহার এরূপ সদুত্তর প্রদান করিলেন যে সর্ব্বেশ্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন, কলেজে পড়া ছাত্রও এরূপ সদুত্তর দিতে পারে না। দাদা ছোট ভায়ের বুদ্ধির প্রখরতার তারিফ করিয়া বলিলেন— রাম! বড় সুখী হ'লাম—তুমি যে সামান্য দিনের মধ্যে এমন ভাল ইংরাজী শিখেছ তাহা জানিতাম না, ভাল ভাল এই রকম শিক্ষায় ত' উন্নতি হয়—তুমি এর ঘরে সংস্কৃত জেনে লাভ কি? আর এখন ওরূপ পণ্ডিতের আদরই বা কোথায়? রামেশ্বর এ বিষয়ে আর বেশী কিছু প্রতিবাদ না করিয়া বাড়ীর কথা তুলিলেন— বলিলেন—হ্যাঁ দাদা! বোসেদের রমেশ বল্ছিল— তোমার কি দেনা হইয়াছে, তার জন্য তোমাকে কি কারবার বিষয় বেচ্তে হবে—এ কথা কি সত্যি?

সর্ব্বেশ্বর ভাইয়ের নিকট মিথ্যা বলিতে পারিলেন না, বলিলেন— হাঁ, তবে সে তেমন কিছু নয়—কিছু দেনা হ'য়েছে বটে, তা কলকাতার

একখানা বাড়ী বেচে শোধ ক'র্‌বো মনে করেছি। কল্‌কাতায় আর এত থাকা হবে না, থাক্‌লে খরচ অত্যন্ত বেড়ে যায়—কিছুতেই সাম্‌লাতে পারা যায় না, এইবার বাড়ী থেকেই যাতায়াত ক'র্‌বো। রামেশ্বর বলিলেন—বাস্তবিক আজব সহর কল্‌কাতায় বসবাস ক'র্‌লে বিলাসিতা বাড়িয়াই যায়—কিছুতেই রাখিতে পারা যায় না, তা দাদা! যদি এরূপ মতলব ক'রে থাকো - তা মন্দ নয়! তারপর বল্লেন—কোনও বিপদাপদে প'ড়ো না, যত শীঘ্র পার তাই ক'রে, ঘরের ছেলে ঘরে এস; ও রকম ক'রে কি আর চির জীবনটা কাটাবে? এধারে মেয়ে বড় হ'চ্ছে, ওর বে-থা দিতে হবে—ভবানীও এখন ভগবানের কৃপায় আট নয় বৎসরের হ'লো; উপনয়ন দিয়ে, এইবার স্কুলে ভর্ত্তি ক'র্ত্তে হবে।

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ ভাই! এই কাজটা সেরে এবার সব ক'র্ব্বো। এই বলিয়া উঠিলেন—চঞ্চলাকে ডাকিলেন—সে নিদ্রিত ভবানীকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া গেল। সর্ব্বেশ্বর ছোট ভাইকে বিদায় দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রামেশ্বর নিজের মহলে আসিয়া দেখিলেন—নির্ম্মলা তখনও দাওয়ায় বসিয়া আছেন। আজ তার ভাব যেন অন্যরূপ, মুখে সে হাসি নাই, বদনে মধুর আলাপ নাই—যেন কি একটা আকস্মিক দুঃখে তাহার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে। প্রাণের দুঃখ স্বামীকে না বলিলে কিছুতেই স্থির হইতে পারিবেন না—এই জন্য সতী আজ এখনও বিনিদ্র অবস্থায় দাওয়ায় বসিয়া আছেন।

রামেশ্বর গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—নির্ম্মলা! আজ এখনও তুমি বসে রয়েছো; অত ভোরে উঠ্‌তে হয়—তবুও এত রাত্তির জাগা কেন?

নির্ম্মলা। দেখ, আজ আমার একটা সন্দেহ হ'য়েছে, তাই তোমাকে বল্‌বার জন্য জেগে বসে আছি, না ব'ল্‌লে যেন স্থির থাকতে পার্‌ছি না!

রামেশ্বর। কি কথা নির্ম্মলা, যার জন্য তোমার প্রাণ এত খারাপ হ'য়েছে, কেহ কি তোমাকে কোনও মন্দ কথা বলেছে?

নির্ম্মলা। তা বললে আর এত দুঃখ কি—সহ্য ক'রলে ত' সব গোল মিটে যেতো কিন্তু যা সন্দেহ হচ্ছে—তা সহ্য ক'রে থাকবার উপায় নাই।

রামেশ্বর। কি সন্দেহ বলই না, তবে ত' বুঝতে পারবো।

নির্ম্মলা। বড়দির ভাইকে আমার বড় সন্দেহ হয়, আমাকে দেখলে সে যেন বাড়ী থেকে নড়ে না, ভাত খাবার একঘণ্টা পূর্ব্বে এসে রান্নাঘরে আস্তানা গাড়বে। ওর চাহনীও আমার বড় ভাল লাগে না, তুমি যদি এর একটা কিনারা কর তবেই, নতুবা আমি আর রাঁধতে যাব না।

হাজার ভাল লোক হ'লেও এ সকল কথা শুনলে কার না রাগ হয়? রামেশ্বরের প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। কি করিবেন, কি না করিবেন—কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মহিম যে ঐরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা তিনি বহুদিন হইতেই জানেন। তিনি দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন উপায় কি? কিন্তু একেবারে রান্না বন্ধ করিয়া দিলে দাদা ও বউদিদি মনে করিবেন কি? বরং তাহাদের কর্ণে এ কথা তুলিয়া তার পর উচিত ব্যবস্থা করা উচিত। এই জন্য বলিলেন—দেখ নির্ম্মলা একেবারে রান্না বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত নয়, কাল তুমি পিসীমাকে সঙ্গে ক'রে রান্না ক'রো এবং তাঁকে এ সব কথা ব'লো। সাবধানে থাকলে কারও সাধ্য নাই যে কিছু করে, তারপর আমি দাদার নিকট বৈকালেই এ কথা তুলবো।

স্বামীর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া নির্ম্মলা আর কিছু বলিলেন না। বাস্তবিক সাবধানে থাকিলে এবং পিসীমা নিকটে থাকিলে কার সাধ্য যে

তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করে। নির্ম্মলা প্রফুল্ল-হৃদয়ে গৃহের আলো জ্বালিলেন; রামেশ্বর শয়ন করিলেন, সতীও পতিপদতলে সুখনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন।

নিদ্রা-ভোগ রামেশ্বরের খুব কম—বহুক্ষণ নিদ্রার কোলে শয়ান থাকিতে তিনি কখনই অভ্যস্ত নহেন। আজ ত' নিদ্রা হইলই না - মহিমের দুর্ম্মতির বিষয় চিন্তা করিয়াই দুই তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া রহিলেন মাত্র। তারপর সকল চিন্তা চিন্তাময়ীর চরণ-প্রান্তে অর্পণ করিলেন। অটল বিশ্বাসে বলিলেন--আগুণের নিকট যাইবে—এমন সাধ্য কার? অগ্নি অপেক্ষাও যে নির্ম্মলার দাহিকাশক্তি বেশী, তবে রমণী জাতি সহজে দুর্ব্বলা— তাই ভয়ে অস্থির হ'য়েছে! মা, তুমি মহিমের মতিগতি ফিরাইয়া দাও! এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন— একতারা লইয়া বিল্ববৃক্ষমূলে বসিলেন। রামেশ্বর ওস্তাদ না হইলেও সঙ্গীতে তাঁহার বেশ আসক্তি ছিল, তিনি প্রাণের সুরে একতারার সুর মিলাইয়া বেশ গাহিতে পারিতেন - যাহা শুনিলে সকলে মোহিত হইত। তাঁহার মনে এখন আর অন্য ভাব নাই —তাই দাশু রায়ের সেই প্রাণ-মাতান মধুর গানটী ধরিলেন,

আমি আছি মা তারিণী ঋণী তব পায়।
মা আমার অনুপায়। ভজন সাধন দিয়ে বিসর্জ্জন,
জননী গো, বিষয় বিষ ভোজনে প্রাণ যায়॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে বল্লাম,
এবার ভজিতে কালী আমি ভবে চল্লাম,
সুপুত্র হব রব স্বপথে, ত্রিপত্র দিব মা তোর শ্রীপদে,
ধরায় পতিত হ'য়ে, আছি মা পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায়॥

হ'লো না সাধন আর হয় না,
হে দুর্গে আমার দুঃখ ত' আর সয় না,
অপার দাশরথী শঙ্করী, হ'লোনা মানস বশ কি করি.
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মা মুক্তকেশী এ ভব বন্ধন দায়॥

তার পর প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দুঃখ, দুঃখ কিসের, সুখও যাঁর দেওয়া—দুঃখও তাঁর দেওয়া, যার হৃদয়ে দুঃখহারিণী সদা বিরাজিতা—তার দুঃখ কোথায়! যে পাদপদ্মের সন্ধান পেয়ে সুখ-দুঃখ সমান হ'যে সেই মোক্ষমলাধার পাদপদ্ম ত' হৃদয়ে সদা বিরাজিত, শয়নে স্বপনে ঐ সব পাদপদ্ম দুখানি নয়ন-সম্মুখে ধরছে চিনে নিতে পারলে আর কে। কি ? বলিয়া গাহিলেন,—

তুমি শবরমা চিনেছি মা, ঐ শ্রীচরণ দেখে।
সেবিলে হয় মোক্ষপদ, স্মরণে হরে বিপদ,
বিপদনাশিনী ব'লে শিব ধরেছেন আপনার বুকে॥

তার পর মনের আবেগে গাহিলেন

শ্যামা নয় সামান্য মেয়ে শমন হেরে শঙ্কা পায়।
মায়েরই চরণ-পদ্ম, শিব দিয়েছেন হৃদিপদ্ম,
পদ্মেরই উপরে পদ্ম, গগন-পদ্ম লজ্জা পায়॥

এখন রজনীর শেষযাম অতীত হইয়াছে; প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। রামেশ্বর প্রাতঃকৃত্য এবং গোসেবাদি সমাধা করিয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। মুখে সেই পবিত্র স্মরণ-মন্ত্র,—

'বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥

পূর্ব্ব-রজনীর কথা স্মরণ থাকিলেও তিনি নির্ম্মলাকে ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া নিত্য-স্নানে বহির্গত হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ রামেশ্বরের হিংসা-দ্বেষ, মান-অভিমান, রাগ-ভয় কিছুই স্থান পায় না। যে এরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, ভগবানে যাহার এতদূর বিশ্বাস, তাহার ভাবনা কি? যে দেবতাকে চিনিয়াছে; তাঁহার অসীম ক্ষমতা বুঝিয়াছে—সেই ত' সংসার চিন্তায়, বিপদাপদের আশঙ্কায়ও অচল-অটল থাকিয়া মাতৃপদে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে? রামেশ্বর চিনিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁহার প্রাণে এতদূর নির্ভরতা জাগিয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভালরূপ শিক্ষা করিয়া যিনি সংসার-তরণীর কর্ণধার হইতে আগমন করেন, পরিপক্ব ব্রহ্মচারীরূপে যিনি এ আশ্রমে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সংসার তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক না হইয়া বরং সুখেরই আস্পদ, শান্তিরই ছায়া-শীতল-পাদপরূপে তাহাকে অশেষবিধ আনন্দ প্রদান করে। যাহার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা নাই—এ ভীষণ স্থানে—সংসারের এ শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে, তাহাকে বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হয়—প্রাণে সে একদিনের জন্য শান্তি অনুভব করিতে পারে না।

সর্ব্বেশ্বর আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন নাই। এত বড় একজন গুণী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী, সংসার-সংগ্রামে বিশেষরূপে জয়লব্ধ পিতার পুত্র হইয়াও তিনি হেলায় সমস্ত হারাইয়াছেন বলিয়া আজ তাঁহার এত দুঃখ—এত কষ্ট; জীবন-মধ্যাহ্নের ভীষণ রৌদ্রতাপে তিনি এতদূর বিপদাপন্ন। ব্রহ্মচর্য্য-বর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া ঘুরিলে সংসারে বিজয়লাভ অনিবার্য্য-কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সেই বর্ম্ম ধারণ করেন নাই; সর্ব্বদা অনাচ্ছাদিত

ভাবে— অসংযমে ঘুরিয়াছেন, পিতামাতার বাক্য অবহেলা করিয়াছেন— এক্ষণে তাঁহার এ কষ্টভোগ কে নিবারণ করিবে?

আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই—বিবাহের পর অনেক যুবক ভাল হয়, আবার অনেক যুবক বিগড়াইয়া যায়। এখানে স্ত্রী-জাতিই যে ইহার মূলীভূত কারণ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অথবা, বিলাস ব্যসনরতা পত্নীর দ্বারা অনেক যুবক এই প্রকারে নষ্ট হইয়াছে, সংসারে প্রবেশ করিয়াও চরিত্র হারাইয়াছে। আবার অনেক দুষ্ট প্রকৃতির যুবক পবিত্র পত্নী সাহায্যে, তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে আসিয়াছে, সংসারের দায়িত্ব অনুভব করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়াছে। ইহার ভিতরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পত্নীই ইহার মূলীভূত কারণ। এমন পবিত্র বংশের এবং এমন পবিত্র পিতামাতার পুত্র হইয়া সর্ব্বেশ্বর যে একপ হইয়াছেন—অথবা, বিলাস প্রিয়, সংসার কার্যে অনভিজ্ঞ প্রমোদাই তাহার একমাত্র কারণ নহে কি?

ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যপথ অবধি পশুভাব বা তামসিক ভাবে কর্ম্মকাণ্ড লইয়া কাল কাটাতে হয়। অনেকে মনে করেন—পশুভাব বা তামসিক ভাব কিছুই নহে- কিন্তু সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, পশু বা তামসিক ভাবই শিক্ষার অবস্থা, কর্ম্মকাণ্ডে ভাল করিয়া পাকা হইবার সময়। এই সময় ভাল করিয়া কর্ম্মকাণ্ড অভ্যাস করিলে—ত্রিসন্ধ্যা, বার-ব্রত, পূজা-আহ্নিক প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মাদিতে রতিমতি দৃঢ় করিতে পারিলে তবে সংসারাশ্রমের শেষ বাণপ্রস্থাশ্রমের মাঝামাঝি মানুষ বীরভাব বা রাজসিক ভাবে জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে। তারপর বাণপ্রস্থের শেষ সন্ন্যাসাশ্রমে সাত্ত্বিক ভাবে পরম পবিত্রকারিণী ভক্তিমার্গের অধিকারী হইয়া দেবত্ব

লাভ করিতে সমর্থ হয়, স্তরে স্তরে না উঠিয়া একেবারে ডগায় উঠিবার শক্তি কাহারও নাই—যিনি উঠিতে পারিয়াছেন—পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই তাহার মূলীভূত কারণ। বিশ্বজননী মা আমার ত্রিগুণময়ী—তিনি তমঃ-রজঃ-সত্ত্ব এবং পশু, বীর ও দিব্য ভাবেরই শুভফলদায়িনী। এই তিন এক করিতে না পারিলে মানুষ কখন মানুষ হইতে পারে না। অতএব তামসিক প্রকৃতিকেও ঘৃণা করিবার কিছু নাই, ইহা শিক্ষার অবস্থা, কর্ম্মে দৃঢ়তা লাভের সময়। রামেশ্বর ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসারে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মকুশলা নির্ম্মলাকে শক্তিরূপে পাইয়া সংসারধর্ম্মে পাকা হইতে লাগিলেন। যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের অবতারণা করিয়া তাহার জীবনের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সতত আগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

ও ভুবঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ।

বীর বা রাজসিক ভাব।

ব্রহ্মে অবস্থিতি।

জ্ঞানযোগ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাঙ্গার দশা।

"বলি কি গো বড় মানুষের ঝি! এখনও কি ঘুম ভাঙ্গেনি? বেলা যে অনেক হ'লো।" বলিয়া বাড়ীর ঝি চঞ্চলা, নির্ম্মলার ঘরের দরজা ঠেলিতে লাগিল।

নির্ম্মলা অন্যান্য দিন ইহা অপেক্ষা অনেক ভোরে উঠেন কিন্তু কাল অনেক রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন এবং ভাবনা চিন্তায় ঘুম হয় নাই বলিয়া—ভোরে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তখনও তত দেরি হয় নাই, তথাপি তাড়াতাড়ি অতি শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন—এই যে চঞ্চলা-এই যে উঠেছি; বড়ঠাকুর আফিসে যাবেন তা জানি। এই বলিয়া খিড়কীর পুকুরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'র্ত্তে, মুখ হাত ধুতে গমন করিলেন।

দাক্ষায়ণী তখন পুষ্করিণীতে বস্ত্র ধৌত করিতেছিলেন, নির্ম্মলা তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের সমস্ত কথা বলিলেন—দাক্ষায়ণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—তবে তোমার আজ আর রাঁধ্‌তে গিয়ে কাজনি—আমিই যাচ্ছি।

নির্ম্মলা। পিসী-মা! তিনি ব'লেছেন—রাঁধা বন্ধ করা হবে না, তবে পিসীমাকে সঙ্গে নিয়ে খুব সাবধানে যেও, দেখি না মহিমের দৌড় কত দূর; তারপর রাত্রে দাদাকে ব'লবো।

দাক্ষায়ণী বলিলেন—হতভাগার আবার এমন মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, আচ্ছা, রামেশ্বর যদি বলে থাকে তবে চল, আমি আজ তোমার কাছ ছাড়া হবো না।

বোনের আদরে, ভগ্নীপতির সোহাগে, মহিম যেন বাবা বৈদ্যনাথের ষাঁড়ের মত খায় দায় আর লোকের সর্ব্বনাশ ক'রবার চেষ্টায় বেড়ায়। বড়লোকের শ্যালক ব'লে গ্রামের লোকে অনেক সময় মনের রাগ মনে চাপিয়া থাকে বড় কিছু বলে না, কিন্তু সে আর কতদিন সাজে, অসহ্য হইলে যে আপনি বাহির হইয়া পড়ে। গতকল্য রাত্রে আহারের সময় পাষণ্ড মহিম নির্ম্মলার সহিত অনেক ঠাট্টা তামাসা লাগাইয়া ছিল যদি তাহার দিক হইতে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখিতে পায়, তাই কই। সেইখানেই চাপিয়া বসিবার সুবিধা বড় কঠিন ঠাঁই? সতীত্বের [illegible] প্রতিমাস্বরূপিণী নির্ম্মলার নিকট মহিমের কোন চাতুরী খাটিল না, তিনি গম্ভীর ভাবে কেবল [illegible] দাদাকে লক্ষ্য ক'রিয়া বলিলেন—"এ সব কথা তোমার মা বহিনের কাছে ক'রবে, নির্ম্মলা ভদ্র লোকের মুখে সহ্য করিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি [illegible] আপনার ঘরের দাওয়ায় গিয়া বসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখন মহিমের সম্মুখে বাহির হইবেন না ইহাতে যদি দিদির সহিত বনিবনাও না হয় সেও ভাল। আর এ সকল কথা তাঁহাকে না বলি। রাগের অন্ত হইবে না ভাবিয়া সেই দাওয়াতেই বসিয়া রহিলেন। তারপর রামেশ্বর বাটী আসিলে পতি পত্নীর যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে. তথাপি মহিমের বিবাহ হয় নাই। অমন অজ্ঞাত-কুলশীল, নিরেট মূর্খকে কে কন্যাদান করিবে? কোন্ পিতা-মাতা হাত-পা বাঁধিয়া নিজের কন্যাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ

করিতে পারে? ভগ্নীপতির নামে ত' আর আপনার বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না—যদি নিজের গুণপণা কিছু না থাকে? মহিম এত বড় হইল—তথাপি একটা সম্বন্ধও আসিল না। তখনকার সময়ে সমাজে জাতি-বিচার বড়ই আঁটাআঁটি ছিল; কন্যা সব ঘর হইতে আনা যায়, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" কিন্তু দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল, ভাল দেখিয়া না দিলে যে কুলে কালী পড়িবে—এখনকার মত তখন বিবাহে যথেচ্ছাচারিতা ছিল না। কাজেই মহিমের মত পাত্রের বিবাহ হওয়া বড়ই কঠিন। সর্ব্বেশ্বর যত না হউক, প্রমোদা ভিতরে ভিতরে অত্যধিক আদর দিয়া তাহার মাথা খাইয়াছিলেন। সে সদাসর্ব্বদাই বড়লোকের মত ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া বেড়াইত; টাকার দরকার হইলে দিদির নিকট চাহিলেই পাইত, খাওয়া পরারও কোন ভাবনা ছিল না, এ অবস্থায় মূর্খ যুবক কি নিজের চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে? লেখা-পড়া না শিখিলে, বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে, হিতাহিত-শক্তি বৃদ্ধি না পাইলে এ বিষম সময়ে চরিত্র ঠিক রাখা মহাদায়, তাহার উপর হাতে যদি টাকা কড়ির অভাব না থাকে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র নষ্ট হইতে কয়দিন লাগে?

দেখিতে দেখিতে মহিমের চরিত্র অতিশয় নষ্ট হইয়া পড়িল। বিবেকবুদ্ধি কিছুই নাই—যাহার দ্বারা সে উচ্ছৃঙ্খল মনকে টানিয়া রাখিতে পারে। কাজেই মত্ত-মাতঙ্গের মত মনের বশে—সে নাকফোঁড়া বলদের মত স্মরশরজালে বিদ্ধ হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেদিন আহারের পূর্ব্বে মহিম—গোপনে ভগ্নীপতির আল্‌মারীর ভিতর হইতে কিছু লাল জল গলাধঃকরণ করিয়া, পরে আহার করিতে বসিয়া নির্ম্মলার উপর পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু সেখানে পদাঘাত মাত্র লাভ করিয়া মহিম সে রাত্রি আর বাড়ী আসে নাই, পাড়ার প্রান্তভাগে

ছোটলোক পল্লীতে গুণ্ডামী করিতে গিয়াছিল। প্রথমে তাহারা বড়বাবুর শ্যালক বলিয়া অনেক সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু মহিম যখন নিতান্ত পশুর মত কাজ করিতে উদ্যত হইল—তখন তাহারা ছাড়বে কেন? মান ইজ্জৎ ত' সকলেরই আছে? তাহারা এমনভাবে প্রহার করিল যে তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না, বহু কষ্টে ভোরের সময় সে বহির্বাটীতে আসিয়া শুইয়াছে। প্রহারের ধমকে তাহার জ্বর হইয়াছে। সে আজ আহারাদি কিছুই করিবে না বলিয়া পাঠাইয়াছে। গায়ে কোন প্রকার দাগ হয় নাই—কাজেই গুণ্ডামীর বিষয় কেহ জানিতে পারিল না, মা-বোন্ মনে করিলেন—সত্য সত্যই জ্বর হইয়াছে, জননী তাই আস্তে ব্যস্তে ডবসাগু প্রস্তুত করিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে আসিলেন। দাক্ষায়ণী ও নির্ম্মলা দস্যের অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর আহারাদির পর একবার রান্নাঘরে গমন করিতেন। তার পর তিনি আপনার শান্তি-নিকেতনে, হয় ত' অতিথিশালায় বা চতুষ্পাঠীতে, নয় ত' দেবমন্দিরে বা সেই বিল্ববৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিতেন। এতাবৎকাল তিনি একদিনও দাদার অট্টালিকার দ্বিতলে পদার্পণ করেন নাই, তবে সময়ে সময়ে বহির্বাটীর চত্বরে আসিয়া দুই ভায়ে অনেক বাত্রি অবধি কথাবর্ত্তা কহিতেন—কখনও কখনও বা ভবানী ও হেমন্তর নানাবিধ খেলার সাথী হইতেন।

রামেশ্বর দাদাকে মহিমের চরিত্র-কথা শুনাইবার জন্য কয়দিন বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিতেছেন কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের দেখা পাইতেছেন না। সর্ব্বেশ্বর অনেক রাত্রে অফিস হইতে আসেন এবং আহারাদির পর আর নীচে নামেন না; কি যেন একটা গোপনীয় কাজের জন্য দাদা ও তড়িৎ সর্ব্বদা বড়ই ব্যস্ত। আজ দাদাকে দেখিতে পাইলেন না—

তবে তড়িৎ আহারাদির পর বাহিরে বসিয়া আছে. সে ছোটবাবুকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিল। রামেশ্বর বলিলেন— তড়িৎ! এ কয়দিন দাদাকে দেখ্‌তে পাইনি কেন, তিনি কত রাত্রে আসেন?

তড়িৎ। ছোটবাবু! বড়বাবু সেই কাজটার জন্ম এতদিন ব্যস্ত ছিলেন—আজ সে কাজ হাসিল হ'য়ে গিয়াছে।

রামেশ্বর। কি কাজ তড়িৎ, আমার ত' কিছুই মনে নাই।

তড়িৎ। সেই যে কল্‌কাতার বাড়ী বিক্রী; বড়বাবু অফিসের তহবিল হইতে টাকা লন নাই? সেই টাকা আজ বাড়ী বেচিয়া দিতে হইল, নতুবা বড় সাহেব আসিয়া দেখিলে কি আর রক্ষে ছিল!

রামেশ্বর। ওহো! হাঁ হাঁ! একদিন দাদার মুখে শুনেছিলাম বটে. তা সে বিষয় ত' বৌদির নামে ছিল, বৌদি ত' বেচিতে দিবেন না বলেছিলেন?

তড়িৎ। সেই রকমই বেঁকে দাড়িয়েছিলেন বটে—তবে এ কয়দিন অনেক সাধ্য-সাধনার পর মত করিয়ে আজ বিক্রী হ'য়ে গেল!

রামেশ্বর! কত টাকায় বিক্রী হ'লো তড়িৎ?

তড়িৎ। কই আর বেশী হ'লো, তবে চারি হাজার টাকাটা শোধ হ'য়ে গেল, অফিসে মান রক্ষা হ'লো, আর সংসামান্ত পাঁচ ছয় শত যা রইলো—তা গিন্নীকে দিতে হ'লো—নতুবা তিনি সই দেন না।

রামেশ্বর। কে কিন্‌লে—এখানকার কেউ নাকি?

তড়িৎ। না, পশ্চিমের একজন বড়লোকের দেওয়ান, বাবুর থাক্‌বার জন্ম কল্‌কাতায় বাড়ী কিন্‌তে এসেছিলো—আমি সন্ধান পেয়ে তাঁকে গিয়ে ধর্‌লাম; যাচিয়া বিক্রী ক'র্ত্তে হ'লো ব'লে, নতুবা আরও দুই চার শত টাকা বেশী হতো!

রামেশ্বরের প্রাণে কোন প্রকার ঘোরপাক নাই, তিনি বলিলেন—

বিষয়-আশয় আর কিসের জন্য; মান-সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যই ত'? তা বেশ হ'য়েছে; অফিসে যে মান রইলো, এই ভাল—নতুবা বিদেশীয় লোকের কাছে কিরূপ হতমান হ'তে হতো বল দেখি?

তড়িৎ। তাতো বটে; আর বিক্রয়ে ত' বাবুর নাম প্রকাশ নাই; গিন্নীর নামে বিক্রী হ'লো; ইহাতেও অনেকটা ইজ্জৎ রক্ষা। তবে ছোটবাবু, যখন বেচা আরম্ভ হ'য়েছে, তখন আর এ সংসারের শ্রেয় নাই। এত টাকাতেও যখন কুলায় না, তখন আর কি হবে; বিষয় বিক্রী হওয়াটা বড়ই দুর্লক্ষণ!

রামেশ্বর। সে ব'ল্‌লে আর কি হবে তড়িৎ! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ; বিষয় থাক্‌তে আর কেউ বেইজ্জৎ হ'তে পারে না ত'?

তড়িৎ। তবে এইবার যে ভাঙ্গার দশা পড়্‌লো, তাতে আর সন্দেহ নাই; এখন বুঝে না চল্‌লে—শেষ দশায় ওঁকে ঢের কষ্ট পেতে হবে।

রামেশ্বর। অদৃষ্টে কষ্ট থাক্‌লে কে রক্ষা কর্ব্বে—তাতে তোমার আমার হাত কি?

তড়িৎ। তা তো বটেই ছোটবাবু। তবে এত বড় একটা মানী ঘর নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—এই দুঃখ! আপনার মনঃকষ্ট দিয়ে—আপনাকে ফাঁকি দিয়েই বড়বাবুর এই দশা!

রামেশ্বর। তড়িৎ। আমি ত' একদিনের জন্যও মনঃকষ্ট করি নাই; আমার থাক্‌লেও যা—দাদার থাক্‌লেও তা; ভবানীই ত' সব ভোগ ক'র্ব্বে—তবে আমি দুঃখ্ ক'র্ব্বো কেন?

রামেশ্বরের সরল প্রাণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তড়িৎ মুগ্ধ হইয়া গেল এবং প্রকাশ্যে বলিল—আপনি দুঃখ না করুন, উপরে ত' একজন রাত-দিনের কর্ত্তা আছেন—তিনি এ পাপ সহ্য ক'র্‌বেন কেন? আমি বার বার বলেছি—বাবু! খরচ কমিয়ে দিন। ঐ যে মহিম ক্ষুদ্র নবাবের

মত পরের ধনে পোদ্দারী ক'রে অত টাকা উড়াচ্ছে; ও বিষয়েও ত' একটু নজর রাখ্‌লে হয়—তাও কই; ও-সব খরচ দিতে গেলে কি আর এখন চলে, আপনার ভাইয়ের জন্য এক পয়সা খরচ দিতে বা কর্ত্তার ক্রিয়া কলাপ বজায় রাখ্‌তে একটী পয়সা দিতে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়—আর মহিম অবাধে কত টাকা নষ্ট ক'র্‌ছে তাতে গুক্ষারই নাই—এ কি বাজার রাজত্ব, তাও যে অপব্যয়ে ছারকার হ'য়ে যায়?

রামেশ্বর। তড়িৎ! ও কথায় আর কাজ নাই—দাদা, বউদির পরামর্শেই নষ্ট হবেন—বিধাতার ইচ্ছা, তোমার আমার সাধ্য কি যে রক্ষা করি!

তড়িৎ। এই যে হতভাগাটা কোথায় গুণ্ডামী ক'রে—মারের চোটে জ্বর হ'য়ে পড়েছে। তার জন্য ডাক্তার খরচ কত দেখুন না!

রামেশ্বর এ বিষয় কিছুই জানিতেন না; আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—তাই নাকি? এই জন্যই কি রমেশ ডাক্তার দু'বেলা আস্‌ছে, আমি মনে ক'রেছিলাম—বউদির কোনও অসুখের জন্য!

তড়িৎ। না না—তা নয়; ঐ হতভাগাটার জন্যই—বাবুও মুক্তহস্ত, ঘর-বেচা টাকা অজস্র খরচ ক'র্‌ছেন!

রামেশ্বর। যখন রোগে পড়েছে—তখন ত' ক'রতেই হবে—আর ভেবে কি ক'র্ব্বে—যাও, শোওগে—রাত অনেক হ'য়েছে।

এই বলিয়া রামেশ্বর ক্ষুণ্ণমনে আপনার গৃহাভিমুখে চলিলেন। তড়িৎও প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিল। পাপীর শাস্তিদাতা ভগবানের চক্ষে যে কাহারও নিস্তার নাই! এই বিষয় তদ্গত হইয়া চিন্তা করিতে করিতে রামেশ্বর আসিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কলুষিতচিত্ত কখনই সুস্থির থাকে না—কোন কার্য্যেই সে সুখ পায় না। প্রমোদা কিছুতেই কলিকাতার নিজ নামে খরিদা বাটী বিক্রয়ের

জন্য সহি দিতে স্বীকার করেন নাই, তারপর দুই তিন দিন ধরিয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর, মান-সম্ভ্রম একেবারে নষ্ট হইয়া যায়—উন্নত মস্তক একেবারে নত হওয়া পড়ে দেখিয়া বহু কষ্টে সহি দিয়াছেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীতে আর তত সদ্ভাব নাই উভয়ে আর উভয়ের সহিত মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না, বিশেষতঃ সর্ব্বেশ্বর সেই-দিন হইতে স্ত্রীর নিকট বড়ই বশংবদ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আর স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই।

নেশার মাত্রা এখন খুব বাড়িয়াছে, তবে লোক জানাজানি হয় না, রামেশ্বর পাছে দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন বলিয়া আর সর্ব্বেশ্বর নীচে নামেন না। উপরের একটা নিভৃত প্রকোষ্ঠে আপন ভাবে বিভোর হইয়া কি ভাবেন। যখন ভাবনার মাত্রা খুব বাড়ে—অসহ্য হইয়া পড়ে তখন সুরাদেবীর অর্চনা করিয়া সে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছেন—তাহা কি আর এ জীবনে কাটিবার? এখন সর্ব্বেশ্বর মনে মনে সর্ব্বক্ষণ ভাবেন—রামেশ্বর আমা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখী—উপায় উপার্জ্জন তত না থাকিলেও মনোরম বশবর্ত্তিনী স্ত্রী তার ঘরে—তারই ত' স্বর্গের সুখলাভ হইয়াছে, সেই ত' জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, সংসারে শুধু অর্থে সে সুখ কোথায়?

পাড়াতে সর্ব্বেশ্বরের ক্রমশঃ দুর্নাম ঘোষণা হইতে লাগিল—এখন আর বড়বাবু বলিয়া লোকে তত গ্রাহ্য করে না। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের একটা সূচনা দেখিতে পাইলে লোকের ভয় ভাঙ্গিয়া যায়—তখন তুমি বড়লোকই হও, আর জমীদারই হও—আপনা আপনি লোকের মনে একটা ঘৃণা আসিয়া তোমায় অপদস্থ করিতে সততই চেষ্টা করিবে। বিষয় বিক্রয়ের পর লোকজানাজানি হইয়া সর্ব্বেশ্বরের তাহাই হইয়াছে। তারপর

মহিমের মহিমা প্রত্যহ আকর্ণন করিয়া সর্ব্বেশ্বর আর গ্রামে মুখ দেখাইতে পারেন না। এখন পাড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকাই শ্রেয়; কারণ, সেখানকার লোক ত' কাহারও কোন খোঁজ খবর রাখে না; কাহারও কোন ভালমন্দে কাণ দেয় না, এ বাড়ীর লোক ও বাড়ীর সংবাদ জানিতে পারে না। আজবসহর কলিকাতায় বসবাস এমনি সম্বন্ধরহিত। সর্ব্বেশ্বর চিরকালই মহা অভিমানী, মানের একটু মাত্র লাঘব হইলে তিনি মরমে মরিয়া যান। তমোগুণান্বিত সর্ব্বেশ্বরের পাড়ায় থাকা দায় হইল—তিনি কলিকাতার সেই নিভৃত স্থানে—তাঁহার সেই ছোটখাট বাড়ীখানিতে আসিয়া বাস করিবেন—দেবীপুরের সম্বন্ধ তুলিয়া দিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছেন—মনটা তত খারাপ নয়—তাই বাহিরে আসিয়া পুত্রকন্যাকে লইয়া গল্প করিতেছেন; ভৃত্য কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রভুকে তামাক সাজিয়া দিতেছে। রামেশ্বর বহুদিন দাদার দেখা পান নাই; তিনি সময় অন্বেষণ করিতেছিলেন; আজ দাদাকে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিলেন—শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিকটে বসিলেন। এখন সর্ব্বেশ্বরের অবস্থা ভাল—কোন প্রকার নেশা করেন নাই—কাজেই রামেশ্বরকে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিলেন না; কাছে বসাইয়া অনেক সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। আজ যেন ভাই ভাইয়ে কোনও ব্যবধান নাই; সর্ব্বেশ্বর বড়, রামেশ্বর ছোট; সর্ব্বেশ্বর উপায়ক্ষম—আর রামেশ্বর পরমুখাপেক্ষী—সমস্তই ভগবানের উপর নির্ভর—এইজন্যই যে একটা ব্যবধান, আজ তাঁহাদের ভিতর নাই—তাই প্রাণ খুলিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিলেন—দাদা! এখন থেকে একটু বুঝে শুঝে চল, তা না হ'লে পরে কষ্ট পেতে হবে! এই দেখ, হেমলতা বড় হ'চ্ছে; আর এক

বৎসর বাদে উহার বিবাহ দিতে হবে, তারপর ভবানীর লেখাপড়ার খরচ আছে। এখন এত খরচান্ত করলে তুমি এ সব সামলাবে কি ক'রে?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ ভাই। তা বুঝি, সেইজন্য এবার থেকে তোমারই কথা শুন্‌তে হবে। তবে কি জান, আমি বাড়ীর জন্য বড়ই বিপদে পড়েছি, আগে জান্‌তাম না, নানা প্রকারে আদর দিয়ে, মাথায় তুলেছি—এখন তার ফলভোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে, গায়ে পেতে এখন সব সহ্য ক'র্‌ছি—বুড়ো বয়েসে কি একটা কেলেঙ্কারী ক'র্ব্বো?

রামেশ্বর। না তা ক'র্ত্তে হবে না, তবে তোমার শাশুড়ীকে ও মহিমকে এখান থেকে সরিয়ে দাও, মহিম বড়ই বাড়াবাড়ি ক'র্‌ছে তারপর মহিমের সেদিনকার দুর্ব্যবহারের কথা সমস্ত দাদার কাছে বলিলেন।

সর্ব্বেশ্বর শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিজের বংশকে কলঙ্কিত করিতে চায়—এ কথা শুনিলে মরা মানুষ পর্য্যন্ত যে জাগিয়া উঠে, তা সর্ব্বেশ্বর ত' শিক্ষিত। তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি. এত বড় আস্পর্দ্ধা, আজই হারামজাদাকে তাড়াব, দেখি কে রক্ষা করে।

রামেশ্বর দেখিলেন—দাদা যেরূপ রাগিয়াছেন, তাহাতে না জানি কিরূপ অনর্থপাত করিয়া বসিবেন—রাগিলে তাঁর ত' জ্ঞান থাকে না। তিনি বলিলেন—দাদা! এ বিষয় লইয়া এত চটাচটী ক'র্‌লে হবে না, মনে মনে রাখিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করাই ভাল—উহাকে আর বেশী প্রশ্রয় না দিলেই হ'লো। তোমার বধূমাতা ত' আর বালিকা নহে এর বাটীর বাহির ও হয় না যে মহিম কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে। তবে ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে এরূপ করা ত' ভাল নয়, প্রায়ই ত' শুনি একটা না একটা কলঙ্ক তার পাছু পাছু লেগেই আছে। আমাদের বাড়ীতে থেকে এ গুলো করা কি তার ভাল, এতে কাদের দুর্নাম হ'চ্ছে?

সর্ব্বেশ্বর। সব বুঝিছি ভাই আর ব'লতে হবে না, আমি শীঘ্রই ইহার প্রতিকার ক'রছি।

রামেশ্বর ঐ বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন — হাঁ দাদা! তুমি নাকি আর দেশে থাকবে না, কলকাতায় থাকবে?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ ভাই? সেই মতলবই ক'রছি, এখান থেকে যাওয়া আসায় অনেক সময় যায়, সে সময়টা কলকাতায় থাকলে আরও কিছু উপায় হ'তে পারে, টাকার ত' ক্রমশঃ দরকার, এইজন্য দুই একদিনের মধ্যে তাই ক'র্‌বো। এই বলিয়া রামেশ্বরকে বিদায় দিয়া বড়বাবু উপরে গেলেন। প্রাণে তাঁহার আজ যে একটা ভয়ানক দুর্ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে - তাহা তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বেশ্বর মহিমের মাহাত্ম্য প্রমোদার নিকট প্রকাশ করিলেন। আরও প্রকাশ করিলেন—এই যে পীড়া সে ভোগ করিতেছে—তাহা এই গুণ্ডামীরই চরম ফল। প্রমোদা তাহা জানিতেন, তথাপি স্বামীর কথায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না বরং নানা প্রকারে ভ্রাতার দোষ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন এবং মনে মনে ছোটবউ ও রামেশ্বরের প্রতি এতদূর চটিয়া গেলেন যে তাহাদের সহিত একত্র থাকিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। এইজন্য স্বামীকে বারংবার কলিকাতায় থাকিবার কথা, এস্থলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্টের কথা বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বেশ্বর স্ত্রীর বড়ই বশীভূত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোনও কথা বলিতে পারিতেন না—এমনি স্ত্রৈণ! সর্ব্বেশ্বরও পাড়াগাঁয়ে থাকিতে বড় ভালবাসেন না। স্ত্রীর কথায় তিনিও বলিলেন—হাঁ! সেখানকার বাড়ীঘর পরিষ্কার করাইয়া শীঘ্রই যাইব। ভবানীর এখানে পড়ার

সুবিধা হ'চ্ছে না, হেমলতার বড় হ'চ্ছে—পাত্র ত' দেখ্‌তে হবে পাড়াগাঁয়ে ত' আর বিয়ে দিলে চল্‌বে না ?

প্রমোদা। না, ওর নামটী ক'রো না, পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে না, এখন আর পাড়াগাঁ সে রকম নাই।

সর্ব্বেশ্বর। আমারও ইচ্ছা নাই—এখানে সে রকম ছেলেও পাওয়া যাবে না।

কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল। প্রাতঃকালেই উঠিতে হইবে—সর্ব্বেশ্বর শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রমোদাও অপর একখানি পালঙ্কে শুইয়া কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

—— —— ——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলহের সূত্রপাত।

মহিমের চরিত্র-দোষ ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, পাড়ায় তাহার কত আখ্যাতি রটিতেছে, তথাপি প্রমোদা সে সকল কিছুতেই মানিতে চাহেন না। সকলে যে হিংসা প্রণোদিত হইয়া তাহার প্রতি এইরূপ বৃথা দোষারোপ করিতেছে—ইহাই প্রমোদার বিশ্বাস। পাড়া-গাঁয়ের লোকে কাহার ভাল দেখিতে পারে না,—এখানে দু'বেলা খাইয়া আঁচাইলে লোকের বুক ফাটিয়া যায়, মনে করে—এ ত খুব সুখে আছে। এখানকার সব লোক অশিক্ষিত কি না-তাই এমন, কিন্তু প্রমোদার তিনকুল যে পাড়া গাঁয়ের অতি নিকৃষ্ট পল্লীতে এতাবৎকাল বাস করিয়া আসিতেছেন—এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন—তাই পাড়া-গাঁয়ের নিন্দায় তিনি আজ শতমুখী। হায়রে—অবস্থা।

সেদিন হইতে রামেশ্বর দাদার কাছে মহিমের চরিত্র-দোষের কথা বলিয়া দিয়াছেন-সেই দিন হইতে সর্ব্বেশ্বর, হাঁকিয়া উঠিয়া বলিয়া দিয়াছেন—মহিমের আর এবাটীতে স্থান হবে না, রোগ আরোগ্য হ'লে সে, যেখানে পারে চলে যাক্ আমি আর তার হ'য়ে এত কথা শুনতে পারব না। প্রমোদা নানা স্তোক-বাক্যে, নানা মিথ্যাকথায় সে কথা চাকা দিয়া স্বামীকে তুষ্ট করিতেছেন, শরীর অসুস্থ বলিয়া এখনি কলিকাতায় যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। সেখানকার সকলেই শিক্ষিত—কেহ কাহারও হিংসা করে না—এ বাড়ীর লোক, পাশের বাড়ীর খবর রাখে না। চব্বিশ ঘণ্টা চারিদিকে কত প্রকারের

আমোদ প্রমোদ চলিতেছে; কেহ কাহাকেও বাধা দেয় না, এরূপ স্থান কি আর আছে? এমন ভদ্রলোকের আবাসস্থান থাকিতে মানুষ কেন পাড়া-গাঁয়ের অন্ধকারে আসিয়া পড়িয়া মরে—তিনি আর এখানে একদণ্ডও থাকিতে রাজি নহেন।

মহিম ছেলেমানুষ—চিরদিন আদরে প্রতিপালিত, কবে কি একটা তামাসার কথা ছোটবউকে বলিয়াছিল বলিয়া, সে তাহা ভিন্ন প্রকারে লইয়া—সকলের কাছে প্রকাশ করিয়াছে, এমন ভগ্নীপ্রিয় ভাইয়ের কুৎসা রটনা করিয়াছে? প্রমোদা এ অপমান কথনই সহ্য করিবেন না, তাই পরদিন হইতে তিনি স্বামী ও দেবরের সাক্ষাতে নির্ম্মলাকে দু-কথা শুনাইয়া দিয়া একেবারে তাহার সহিত কথা কহা বন্ধ করিয়া দিলেন। ছেলে-পিলেকে আর তাহার কাছে আসিতে দিলেন না। কিন্তু তাহারা কি সে নিষেধ মানে? ছেলের জাত যেখানে আদর পায়, সেইখানেই যে দৌড়ায়। ইহাতে মায়ের নির্য্যাতন তাহারা উপেক্ষা করিতে লাগিল; কাজেই এখানে আর থাকা উচিত নয়! বরং আরও দুই একদিন থাকিতে পারিতেন কিন্তু ভবানী ও হেমলতার জ্বালায় তাহা হইল না—তিনি প্রত্যহই স্বামীকে কলিকাতা যাইবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন।

সর্ব্বেশ্বর পাড়ায় আর মুখ দেখাইতে পারেন না—এখানে তিনিও বেশ আমোদ-আহ্লাদে থাকিতে পারেন না, এখানকার কাহারও সহিত তাঁহার মিলও হয় না। তিনি আফিসের বড়বাবু বলিয়া পাড়ায় বড়ত্ব ফলাইতে যান, কিন্তু তাহা থাকে না, কাজেই এমন স্থানে কি আর থাকিতে আছে? এখানে থিয়েটার নাই, সোনাগাছী, রূপাগাছী নাই, সন্ধ্যার পর বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা এখানে হয় না, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য দুই এক গ্রাস পান-পাত্রও এখানে কেহ গলাধঃকরণ করে না, কেবল শাঁক-ঘণ্টার শব্দ, আর দেবালয়ে আরতির কাঁসরধ্বনি, সে বীভৎস

শব্দে কাণে তালা লাগে। তার পর কোশাকুশী লইয়া কোথাও সন্ধ্যাহ্নিক, কোথাও কেবল বা ইষ্টজপে মালা ঠক্ঠকানী, এসকল সর্ব্বেশ্বরের বড়ই অসহ্য; এসকল অকর্ম্মাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। তাঁহার বাড়ীতেও কি তাই—এই সকলের ছড়াছড়ি, রামেশ্বরকে তিনি এত নিষেধ করিয়াও আঁটিতে পারেন না— মা'র পেটের ভাই হইয়া সেও যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কাছে কোনও কথা বলা চলে না—সে এমন যুক্তি তর্ক দেখাইয়া বসে, যে সেখানে সর্ব্বেশ্বরের একটা কথাও খাটে না। বাস্তবিক তাহার সেই সময়কার হাব-ভাব দেখিলে সর্ব্বেশ্বরের প্রাণে কেমন একটা ভয় হয়;—মুখে আর কথা সরে না। তার পর সে এখন দুই পয়সা রোজগার করিতেছে—আমার অধীন নয়; আর এত ফাঁকি দিয়াও যখন তাহাকে বশে রাখিতে পারিলেন না—তখন আর কেন? যখন দুই ভায়ে দুই রকম, তখন একজনকে সরিয়া পড়াই ভাল। ও এখানে থাক —আমিই যাই, কবে আবার কি ক'রে ফেল্‌বে, এখন কিছু উপায় ক'র্‌ছে, হয়ত' দু'দিন পরে বন্ধ হ'লে আমারই ঘাড়ে পড়্‌বে। এখন ত' সে আর একা নয়—দুইজন, এর পর ছেলে-পিলেও হবে। তখন কি হবে? না আর কাজ নাই, কালই এস্থান ত্যাগ ক'র্ব্বো! কলিকাতায় বড় বাবু বলিয়া তাহার কত মান---কত বড় বড় দালাল, সাহেব, মারয়াড়ী তাঁহার হাতের মুঠার ভিতর; আর এখানকার কেউ তাঁহাকে মানে না। আজ শনিবার বৈকাল হইতে রং চড়াইয়া সর্ব্বেশ্বর এইরূপ কত কি ভাবিতে-ছেন। মায়ের বাধ যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন আর এখানে থাকা কেন—যাক্ প্রাণ, থাক্ মান—ইহাই ত' মহাজনবাক্য।

কলিকাতায় যাইবার কথা সকলে শুনিয়াছেন; রামেশ্বরও সেদিন মুখে শুনিয়াছিলেন—তিনি কেন গ্রাম ত্যাগ করিতেছেন। এরূপ না করিলে ভবিষ্যতে আর কোন উপায় নাই। কথা ভাল বলিয়াই

রামেশ্বর তাহাতে কোন দ্বিরুক্তি করেন নাই। সর্ব্বেশ্বর চাকুরীতেই পটু হইয়াছেন— ইহার উন্নতি এখন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ পিতৃ-পিতামহের কাজে ত' তিনি অভ্যস্ত নহেন? কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার ভাল বই মন্দ হইবে না—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, তবে সর্ব্বেশ্বর প্রমোদার সহিত পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিয়াছে—তাহা তিনি জানেন না। কলিকাতায় গিয়া দেশের সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিবেন। ভবানী-পুরের বাটী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে আর একখানি বাটী ক্রয় করিবেন—ইহাই মনোগত ইচ্ছা।

রামেশ্বর ছোট হইলেও সর্ব্বেশ্বর যেমন তাঁহার সহিত কোনও কথা জোর করিয়া কহিতে পারেন না, সর্পের উন্নত মস্তক যেমন রোজা দেখিলেই নত হইয়া পড়ে, প্রমোদাও তেমনি এত দাম্ভিকা, এত তেজস্বিনী হইলেও নির্ম্মলাকে দেখিলে, তাঁহার সেই প্রতিভা-মণ্ডিত মুখের প্রতি তাকাইলে আর কোন কথা কহিতে পারেন না, সহজেই মাথা হেঁট হইয়া পড়ে, প্রাণে যেরূপ আক্রোশ, সেরূপ হিংসাদ্বেষ বিরাজিত থাকুক না কেন, তাঁহার কাছে যেন প্রকাশ করিতে ভয় পান। পশ্চাতে যাহাই করুন—যাহাই বলুন, যত নিন্দার ঝালই ঝাড়ুন—তাঁহার সম্মুখে একটা কথাও বলিতে সাহস করেন না। পুণ্যের নিকট পাপের হীনতা এই রূপেই হইয়া থাকে—ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের পরাজয় যে বিধাতার বিধিবদ্ধ নিয়ম—অন্যথা করিবে কে?

কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন—বড় বউমা! দাদার এত বড় সংসারটা ত' একে একে শূন্য হ'চ্ছে; দেবতা—বামুনের আশীর্ব্বাদে এ বাড়ীতে সর্ব্ব আর তুমি ছেলে-মেয়েটাকে নিয়ে আছ; আর ও বাড়ীতে ওরা দু'টিতে আছে—এতেও বাড়ীটা একরকম জমজমা র'য়েছে—তোমরা চ'লে গেলে যে যা. সব খাঁ খাঁ ক'র্ব্বে; আর কেউ'

থাক্‌তে পারবে ? ছোটবউ ব'লছিলো—হেমা আর ভব যদি দিদির সঙ্গে চ'লে যায়—তবে কেমন ক'রে থাক্‌বো পিসী! তা মা, যদি শরীর সারাবার জন্যে যাও, তাহ'লে হয় ছেলেটাকে, নয় মেয়েটাকে এখানে রেখে যাও!

প্রমোদা। ওমা, অন্ধের নড়ি, কানাপুতের ধন—আমরা কি ছেলে মেয়ে ছেড়ে থাক্‌তে পারি; এই দেখ্‌ছো ত' পিসী, প্রতি বৎসর হ'চ্ছে—কিন্তু একটাও থাক্‌চে না; বিধেতার বুকে যে কি ভাতের হাঁড়ি উলিয়েছি—তা তো ব'ল্‌তে পারি না। একটাও কি বাঁচলো না?

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—ভবানী ও হেমলতার পর সর্ব্বেশ্বরের যতগুলি ছেলে-মেয়ে হ'য়েছে, সকলেই যমের ঘর আলো ক'রেছে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ভবানীর বয়স এখন বার বৎসর আর হেমলতার নয় উত্তীর্ণ হ'য়ে দশে পড়েছে—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রমোদাকে আর একটীও শিশু-সন্তান কোলে করিয়া বুক জুড়াইতে হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রমোদা চারি পাঁচ বার সান্তন-সম্ভবা হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনটী বা আঁতুড়ে, কোনটী বা ভুমিষ্ঠ হইয়াই, আর কোনটী বা অষ্টমমাসে গর্ভে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; সে সময়ে তাহার জন্য প্রমোদারও প্রাণ লইয়া টানাটানী হইয়াছে। কত হেলানে দাঁই, কত হাঁস্‌পাতালের ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তবে গর্ভস্থ মৃতশিশুর বহির্গমনের অত্যধিক কষ্টভোগে প্রমোদার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীজাতি অতিশয় বিলাসপ্রিয়, পরিশ্রমে অপটু হইলে যাহা হয়—প্রমোদার সেই সকল দুঃখ-কষ্ট চরমে উঠিয়া স্বাস্থ্য যারপরনাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এখন তিনি সকল কাজের বার হইয়া পড়িয়াছেন—কেবল বসিয়া বসিয়া হুকুম করিতে পারেন এবং সামান্য খুটিনাটী লইয়া ঝগড়া করিতে তিনি বিশেষ অভ্যস্তা হইয়া পড়িয়াছেন; শারীরিক পরিশ্রম কিছুমাত্র করিবার

তিনি দুই এক কথায় মিষ্টি মিষ্টি করিয়া প্রমোদাকে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা বলিলেন কিন্তু প্রমোদার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন—ঐ দুঃখেই ত' দেশ-ছাড়া হচ্ছি; আমার পর ভাল তবু আপনার জন কেউ নয়; এখন ভালয় ভালয় বেরুতে পারুলে বাঁচি?

উভয়ের ঝগড়া শুনিতে পাইয়া নির্ম্মলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমোদার জননীও থ কিতে পারিলেন না;—কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিলেন। এ মাগী কাণে একটু খাটো এবং বড়ই কলহপ্রিয়; তাঁহাকে দেখিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন—ও বেহান্, তোমার মেয়ে দেখো বিনা-দোষে ঝগড়া ক'রছে. আমি কিছুই বলি নাই, বেন!

বেহান্। না বল্লে কি আর আমার মেয়ে তেমন, যে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে; ওর ছেলে, ও যদি না রেখে যায়—তা তোমার কি? একি গা-জুয়ারী; বলি আমি কি কিছু শুনি নাই—তুমি মিষ্টি মিষ্টি ক'রে অনেক কথা শুনাচ্ছ? ও আমার হাবাতে মেয়ে; ঝগড়া জানে না তাই, নইলে অপর পাল্লায় পড়লে কি আর রক্ষে থাকতো?

দাক্ষায়ণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—কিসের রক্ষা থাকতো না বেহান্, আমি যে ভাল কথাই ব'লতে এসেছিলাম—দুঃখ জানিয়ে ব'লছিলাম—আহা! এতদিন বেশ গোলে-মালে ছিলাম—তোমরা ও ছেলে-মেয়েটা চলে গেলে সব আঁধার হ'য়ে থাকবে; আমরা এখানে কেমন ক'রে থাকবো?

বেহান্। ঐ ত' কথার মার-পেঁচ—আঁধার হ'য়ে থাকবে, দুষমন না হ'লে কি আর এ কথা বলে? আঁধার হ'য়ে থাকবে—মানে যেন আমরা সব মরে গেছি; একথা শুনলে কার না রাগ হয়—আমরা কি জন্মের মত যাচ্ছি? তোমার কাছে ছোট ভাইপো ও তার বউটী সব—আর

এরা যেন বাণে ভেসে এসেছে ; দেখো ! অমন একচোখোমী ক'রো না, ধর্ম্মে সইবে না।

নির্ম্মলা সমস্ত শুনিয়াছিলেন—গায়ে পড়িয়া ইহারা ঝগড়া পাকাইতেছে ; পিসীমাকে অপদস্থ করিতেছে, শেষে ধর্ম্ম দেখাইয়া ইঁহার অপমানের একশেষ করিতেছে। নির্ম্মলা এ সবে বড়ই নারাজ। তিনি পিসীমার কাছে হাত জোড় করিয়া বলিলেন—পিসীমা ! আর না, অনেক দূর গড়াইয়াছে হিতে বিপরীত হ'তে আরম্ভ হ'চ্ছে ; তুমি চল—পড়োরা খাবার জন্ম হান্‌টন্ ক'র্চ্চে, বেলা যে অনেক হ'য়েছে।

দাক্ষায়ণীর চমক ভাঙ্গিল—তিনি যে এখনও ছাত্রদের আহার দেন নাই— বেলা যে প্রায় বারটা ; দাক্ষায়ণী আর কোনও কথা গ্রাহ্য না করিয়া, দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নির্ম্মলা বড়লোকের মেয়ে—টাকার অভাব নাই। গহনাও তাঁহার বিস্তর আছে—তথাপি পরেন না, তাহাতেই যেন রূপ ফেটে পড়েছে, গহনা প'রলে না জানি কত বাহারই হয়। প্রমোদা এত করিয়াও ত' রূপের বাহার দিতে পারে না—তাহাকে ত' নির্ম্মলার মত দেখিতে হয় না। সকলে তাহাকে রাখিয়া নির্ম্মলার সুখ্যাতি করে, এ যে তাঁহার বড় অসহ্য, তাই তিনি বড়গলায় ঝগড়া করিয়া বড় হইতে চেষ্টা করেন, তাহাকে হারাইয়া দিয়া আপনার প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে অগ্রসর হন।

বড় বউ যত ঝগ্‌ড়া করেন, নির্ম্মলাকে যত গালি দেন, নির্ম্মলা তাহার কোন প্রত্যুত্তর করেন না, কাজেই ঝগ্‌ড়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না. একাকী আর কতক্ষণ লোকে বকিতে পারে ? কলিকাতা যাইবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে প্রত্যহই ভীষণ কলহের সূত্রপাত হইতেছে. কিন্তু ছোটবউ ত' কথা কন না, যতই গালি দাও যেন তিনি মরা মানুষ, এও যে বিষম দায় ! কাজেই প্রমোদা আর কোন

প্রকার অনর্থপাত করিয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারিল না, নিজেই চুপ হইয়া গেল।

রামেশ্বর এ সকল কথায় বড় একটা থাকিতেন না, আর তাঁহার কাণে এ কথা উঠিতও না, তিনি আপনার কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন— সংসারের বাজে কাজে কাণ দিবার তাঁহার সময় কই? তাহার জন্য ত' নির্ম্মলা ও পিসীমা রহিয়াছেন। তবে দাদা এখান থেকে চলে যাবেন— ছেলে দুটো যাবে, এইজন্য এ কয়দিন তিনি একটু উন্মনা হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বাসে।

আজ রবিবার বৈকালে দিন ভাল, সর্ব্বেশ্বর সপরিবারে কলিকাতায় আসিবেন। এইজন্য সকাল সকাল আহারাদি চুকাইয়া সকলে যাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত, বিছানা পত্র বাঁধা হইতেছে, বাক্স পাটরা গুছানো হইতেছে। কেহ কিছু না বলিলেও নির্ম্মলা, রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণী বিরস-বদনে আজ তাঁহাদের কাজে সাহায্য করিতেছেন। রামেশ্বর আজ দাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন, প্রাণ তাঁর বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। হাজার হউক মার পেটের ভাই, একত্র থাকিলে যত সুখ, পরস্পর চক্ষের আড়াল হইলে, দেশান্তরে থাকিলে সে সুখ হয় না। ভ্রাতৃদ্বেষীর প্রাণে যাহাই হউক, ভ্রাতৃভক্তের প্রাণে ইহাতে বড়ই কষ্ট হয়।

ভাই-ভাই, ঠাঁই-ঠাঁই, সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার প্রাণে ইহা সদাই জাগরিত রহিয়াছে, তাঁহারা রামেশ্বরকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলেই বাঁচেন কিন্তু রামেশ্বরের প্রাণে তাহা নাই, তিনি ভায়ে ভায়ে ভেদ নাই, দুই কায়ায় এক প্রাণ হইয়া অভেদভাবে থাকিতে চান কিন্তু তাহা হয় কৈ, দুই জনের কি বিরুদ্ধ স্বভাব ইহার মধ্যে ব্যবধান আনিয়া দেয়। সর্ব্বেশ্বর যে কিছুতেই রামেশ্বরের সহিত মিলিতে পারে না, এক পিতার পুত্র হইলেও দুই জনে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্বভাব যে মলেও যায় না, দুইটীতে এক হইতে কিছুতেই পারেন না। ইহাদের স্ত্রী দুইটীর মধ্যেও কি সেইরূপ ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রভেদ বর্ত্তমান। একজন চান্‌—ছাঁটিয়া কাটিয়া সকলকে ফেলিয়া দিয়া আপনি সুখে থাকিতে, আর একজন চান,—সকলকে আঁকড়িয়া ধরিয়া, সকলকে সুখী করিয়া নিজে সুখী

হইতে; সকলে বেশ মনের সুখে ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতিমান হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করুন; আমরা তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের নিকট নত হইয়া, তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া, নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করি। একজন আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া, আপনাকে বিলাইয়া দিয়া পরের হইয়া সুখী হইতে ভালবাসেন, আর একজন অপরকে পদদলিত করিয়া, তাহার সমস্ত সুখভোগ কাড়িয়া লইয়া সুখী হইতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করেন। দুইটীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাই মনের মিল হয় না, স্বার্থপরতার জন্য প্রাণে আঘাত লাগে, পরস্পর দ্বৈধ-ভাবাপন্ন হইলে একত্র থাকা কেমন করিয়া সম্ভব? এইভাব আনিলে, রামেশ্বরে ও সর্ব্বেশ্বরে, প্রমোদায় ও নির্ম্মলায় কস্মিন্‌কালে মিলনের আশা নাই। পৃথক্ হইয়া একজনের স্থানান্তর বাসই শ্রেয়ঃ; ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। তবে বংশের দুলাল ছেলে-মেয়েটার জন্য প্রাণ যে গুমরিয়া উঠিতেছে। রামেশ্বর দাদাকে অনেক করিয়া বলিলেন—ভবানী এখানে থাক, আমি কয়েক দিন পরে রাখিয়া আসিব। নির্ম্মম সর্ব্বেশ্বর তাহাতে রাজী হইলেন না, বলিলেন—আমি দুই একদিনের মধ্যে উহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব, এখানে থাকিলে ওর কিছুই হইবে না। এতদিন না ততদিন দুই একদিন থাকিলেই কি ছেলের পড়া-শুনা নষ্ট হয়, ইহা একটা আছিলা মাত্র, রামেশ্বর মরমে মরিয়া গেলেন, আর কোন কথা বলিলেন না। ভবানী থাকিবার জন্য আবদার ধরিয়াছিল, তিনি বুঝাইয়া বলিলেন—বাবা! এখন কয়েকদিন যাও, স্কুলে ভর্ত্তি হও, তারপর আমি একদিন যাইয়া তোমায় লইয়া আসিব, স্কুলের ছুটীছাটাত আছেই, তার জন্য আর ভাবনা কি? ভবানী পিতার মেজাজ বুঝিত, সে মনমরা হইয়া একধারে বসিয়া রহিল। হেমলতা নির্ম্মলার আঁচল কিছুতেই ছাড়ে না, কেবল বলিতেছে—কাকীমা! দাদা যায় যাক্—আমি তোমার কাছে থাক্‌বো।

মেয়েছেলেটার আব্দারে নির্ম্মলার প্রাণ কাঁদিতেছে—ইচ্ছা যে তাহারা এইখানেই থাক, কিন্তু ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না পিসীমা সেদিন এই কথা তুলিয়াই ত' এক কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন, আর আজ এই শুভ-যাত্রার সময় এই কথা পুনরায় তুলিয়া কি তিনি একটা মনোমালিন্য করিয়া বসিবেন? তিনি বলিলেন—মা! তোমার মায়ের স্বভাব ত' জান, সেদিন ত' সব শুনেছ, আজ এ সময় যদি এ কথা তুলি, তাহা হইলে হয়ত' একটা তুমুল ঝগ্ড়া করিবেন, –যাইবার সময় এ সব অলক্ষণ কি ভাল? তুমি যাও, দুই চারদিনের মধ্যে তোমার কাকা যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিবেন। হেমলতা মাকে ভালরূপ জানিত, কাজেই সে আর কোন কথা কহিল না, মুখটী উনুঝুনু করিয়া আপনার পুতুলগুলি গুছাইতে গেল।

রামেশ্বরের রাগ নাই, এততেও তিনি ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে-ছেন—নানা কথা কহিতেছেন কিন্তু সর্ব্বেশ্বর অনেক কথার পর একটা দুইটা কথার জবাব দিতেছেন—যেন কতই রাগ রাগ ভাব! রামেশ্বর জানেন—তিনি রাগের কাজ কিছুই করেন নাই—দাদার স্বভাবই ঐরূপ, বৌদিদি রাগিলে—কাহারও উপর বিরক্ত হইলে, দাদার বিরক্তি আপনি আসিয়া পড়ে, ভাল-মন্দ কিছু বিবেচনা করেন না—বৌদির কথাই দাদার কথা, তাঁহার নিজের কিছুই নাই! রামেশ্বরের রাগ-দ্বেষ কিছু নাই—মান-অপমান তাঁহার বোধ নাই—তিনি যেন মাটির মানুষ। বিশেষতঃ বড়ভাইয়ের কাছে ছোটভাইয়ের আবার মান-অপমান, হিংসা দ্বেষ কি? বাল্যকালে যাহার কোলে উঠিয়া মানুষ হইয়াছি—এখন যদি তিনি দু'কথা বলেন—তাহা কি শুনিতে হইবে না—প্রতিবাদ করিতে হইবে? রামেশ্বরের প্রাণ এমনি সাদা, মন এমনি ধর্ম্মে গঠিত! সর্ব্বেশ্বরও ছেলেবেলায় ঠিক এইরূপ ছিলেন—ভাই-অন্ত জীবন ছিল। প্রমোদাই তাঁহার মাথা

খাইয়াছেন—তাঁহাকে অধর্ম্মের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন, দাদাও বুদ্ধিদোষে মনুষ্যত্ব হারাইতেছেন।

দিবসের রৌদ্র যখন ঘনাইয়া আসিল—যখন বেলা পড়িল, তখন ভৃত্য গোবর্দ্ধন, বাবুর আদেশমত দুইখানি গোযান ও দুইখানি অশ্বযান ভাড়া করিয়া দ্বারে আনিয়া খাড়া করিল; দ্রব্যাদি সমস্ত গোযানে বোঝাই করা হইল। একখানি অশ্বযানে প্রমোদা ও তাহার জননী উঠিলেন—তাঁহাদের আনন্দ আর ধরে না, ভবানী ও হেমলতা কাকা-কাকী ও ঠাকুমার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদ কাঁদ মুখে গাড়ীতে উঠিল। নির্ম্মলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ইঙ্গিত করিলেন—ভয় নাই বাবা! এস, আমরা দুই চারি দিনেই মধ্যে তোমাদের লইয়া আসিব। রামেশ্বরও অভয় দিলেন। আর একখানি গাড়ীতে সর্ব্বেশ্বর রুগ্ন মহিমকে লইয়া উঠিলেন। হেঁফাজাৎ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন সঙ্গে গেল—সে আজ আর ফিরিতে পারিবে না।

হাওড়া-ঘাটে আসিয়া ষ্টীমারে মাল তুলিতে হইবে—তারপর, পর-পারে আনিয়া আবার গাড়ী করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইতে হইবে—ইহা কি সহজ—গোবর্দ্ধনের ন্যায় প্রিয় ভৃত্য না থাকিলে এ সকল ধাক্কা সাম্‌লান কি সোজা কথা? নায়েব তড়িৎ ঘোষ কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। সে ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিল না। বহুকষ্টে রাত্রি আটার সময় সর্ব্বেশ্বর সদলবলে কলিকাতা চাঁপাতলার ভবনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রমোদা ও তাঁহার মাতার যেন হাড়ে বাতাস লাগিল—"আঃ বাচলাম" বলিয়া মায়ে-ঝিয়ে ছাদের উপর পা ছড়াইয়া বসিলেন। কলিকাতার ছোট বাড়ীর মধ্যে ও' নীচেয় বসিবার উপায় নাই—যা করেন শূন্যমার্গ ঐ ছাদ, পঞ্চভূতের প্রধান ভূত মাটীর সঙ্গে এখানকার লোকের একেবারে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়। যে ধরিত্রীর

শক্তি-সাধনা।

সুশীতল বক্ষে উঠি-পড়ি করিয়া হাঁটিতে শিখি, যাহার মাটী খাইয়া-মাখিয়া আমাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়, এখানে তাহার সহিতই সম্বন্ধ ত্যাগ, কাজে কাজেই স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিসে? এই জন্য পল্লী-জীবন সুখকর—স্বাস্থ্যপ্রদ; এখানকার লোক বুঝে না, প্রকৃত সুখ-দুঃখ জানে না বলিয়া কলিকাতার কোলাহলময় বাসে অবস্থান করিয়া শরীর নষ্ট করে—মন কলুষিত করে।

যে পুরুষ স্ত্রীলোকের অধীন, তাহাদের কথায় মরে বাঁচে—সেরূপ লোকের ভদ্রস্থতা কোথায়? কিন্তু এইরূপ পুরুষই আজকাল পনের আনা, এক আনা স্বাধীন হয়ত' খুব বেশী।

সর্ব্বেশ্বর কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া, সেই দিন রজনীযোগে তাঁহার আফিস বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিল। অর্দ্ধাঙ্গিনীর সংবাদ লইতেও ছাড়িল না; ছেলে-পিলে ভবানী ও হেমলতা ত' কাছেই ছিল; এক একবার তাহাদের হাত-মাথা ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন কিগো বাবাঠাকুর, মাঠাকুরুণ ভাল ত'—ইস্, একেবারে যে আধখানি হ'য়ে গেছিস তোরা! এই জন্যই ব'লেছিলুম সর্ব্বেশ্বর, যে পাড়াগাঁয়ে থেকো না—সব মাটী হ'য়ে যাবে!

সর্ব্বেশ্বর তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—ওরা ত' যা হউক প্রাণে প্রাণে আছে: ওয়াইফ্‌টে (wife) বোধ হয় আর টেঁকে না; প্রসবের পর সেই যে পেটের অসুখ আর কিছুতেই সারছে না।

বন্ধুগণ। কি ক'রে সারবে—সেখানে কি ডাক্তার কবরেজ আছে? এখন এখানে এসেছ—ভাল ক'রে চিকিৎসা করাও, সব সেরে যাবে!

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ ভাই! তাই জন্যে ত' চলে এলুম—আর অবহেলা ক'রে ফেলে রাখা চলে না।

বন্ধুগণ। কি ক'র্ব্বে মনে ক'রছো, কবিরাজী না ডাক্তারী?

সর্ব্বেশ্বর। তোমরা কি যুক্তি দাও।

বন্ধুগণ। পুরাতন রোগ; ভাল কবিরাজ দেখালেই ভাল হয়। অপর একজন বলিল—তেমন কবিরাজ কেহ নাই; কুমারটুলীর কবিরাজদের হাই চার্জ্জ! তার চেয়ে ডাঃ রায়কে বন্দোবস্ত করো, এখন কিছুদিন এলোপ্যাথিক দেখাও, তারপর কিছু না হয়—কবিরাজ দেখান যাবে। তাই সাব্যস্ত হইল—কাল থেকে ডাক্তার রায়ই প্রমোদার চিকিৎসা করিবেন। প্রত্যহ আট টাকা করিয়া দর্শনী দিতে হইবে। তার পর ঔষধের দাম আছে? হায় মানুষের এ সকল মতিভ্রম কবে যাইবে? সামান্য অজীর্ণ—টোট্‌কা টাট্‌কাতেই সারিয়া যায়; আহারের একটু বাঁধাবাধি করিলেই হয়, তার জন্য বিষম বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হইল; মশা মারিতে কামান পাতা—পীড়ার গতি যে কোন দিকে ফিরিবে—কে জানে?

বহুদিন পরে বন্ধুবান্ধব সম্মিলন—রাত্রে একটু আমোদ-আহ্লাদ হ'লে ভাল হয়। সর্ব্বেশ্বর তাহার উদ্যোগ করিলেন। চাকর বামুন ত' নিযুক্ত ছিলই—তাহাকে হুকুম হইল—পাঁঠা ও লুচী প্রস্তুত করিতে। অনেক দিন মা বোতলবাসিনীর সহিত তৈজবী উপাসনার ব্যবস্থা হয় নাই, সেখানে ত' এ সব পাওয়া যাইত না! ব্রাহ্মণ সকলের জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন; তাহারা যে যার স্থানে নিদ্রিত হইলে, বাহিরের ব্যাপার চলিতে লাগিল। তাহাতে প্রায় রাত কাবার হইল—প্রাতঃকালে সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

সর্ব্বেশ্বর ডাক্তার রায়কে আনিয়া স্ত্রীর ও শ্যালকের চিকিৎসা করাইয়া আহারাদির পর আফিস চলিয়া গেলেন। ছেলে দুইটার জন্য মন বড়ই খারাপ হইয়াছিল, কামেশ্বর দুই তিন দিন পরেই কলিকাতায় আসিয়া দাদার বাসায় উপস্থিত হইলেন, গোবর্দ্ধন তখনও সেইখানে

ছিল। ভবানী ও হেমলতা কাকাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল; দেবীপুর যাইবার জন্য বড়ই বায়না ধরিল কিন্তু সর্ব্বেশ্বর থাবাড়ী দিয়া তাহাদের সে উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দিলেন, রামেশ্বরের ইচ্ছারও গতিরোধ হইল। দাদার ও বৌদিদির ভাব তাহার উপর সরল দেখিলেন না, অধিকন্তু শুনিলেন—এমন ক'রে সদা-সর্ব্বদা এসে ছেলে-মেয়েটার মন খারাপ ক'রো না—তা'হলে তাদের লেখাপড়া হবে না—মাথা খাওয়া যাবে। পরোক্ষের এই কথায় রামেশ্বরের মরমে আঘাত লাগিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি সে সমস্ত মনোবিকার ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাদার সহিত হাসি মুখে কথা কহিলেন। বউদিদি কেমন আছেন, কিরূপ চিকিৎসা হইতেছে—জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বেশ্বর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে একটা উত্তর দিলেন। নিজের শরীরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—সে উত্তরও তথৈবচ! রামেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, সামান্য জলযোগ করিয়া সে রাত্রির মত একস্থানে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি একাহারী বিশেষতঃ সগোত্র না হইলে কাহারও হাতে খান না। রামেশ্বর থাকিলে সর্ব্বেশ্বরের আমোদ-আহ্লাদে বাধা পড়ে, এ জন্য তাঁহার আগমন অত্যন্ত বিরক্তিকর, কিন্তু কি করিবেন—আসিয়া পড়িয়াছেন, উপায় ত' নাই? এই রাত্রে কলিকাতা হইতে যাওয়াও সহজ নহে, তখন গঙ্গার পুল হয় নাই, একা নদীই যে বিশ ক্রোশ!

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দাদার নিকট বিদায় চাহিলেন। গোবর্দ্ধন আর থাকিতে চাহে না, সে চিরকাল পবিত্র ব্রাহ্মণের গৃহে দাসত্ব করিতেছে, ধর্ম্ম তার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে। এমন অধর্ম্মময় অব্রাহ্মণোচিত স্থানে সে আর থাকিতে পারিবে না, মুনীব হইলে কি হয়? সেও বিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিল। সর্ব্বেশ্বর তাহাদের দুইজনকেই বিদায় দিলেন। সর্ব্বেশ্বর বিদায় দিবার সময় রামেশ্বরকে বলিয়া দিলেন—

তড়িৎ আসিলেই পাঠাইয়া দিও; হেমার বিবাহের জন্ত টাকার যোগাড় ত' করিতে হইবে, চার পাঁচ হাজারের কম ত' হইবে না; টাকা ত' একটী নাই, এইবার বাস্তু শুদ্ধ টান পড়িল দেখিতেছি। রামেশ্বর আর কি বলিবেন—"মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ভাব দেখাইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। মনে মনে বলিলেন—দাদা! এত টাকা রোজগার করেন—যায় কোথায়! এত নয় তত নয় একটা মেয়ের বিয়েতে বাস্ত পর্য্যন্ত বিক্রয় ক'র্ত্তে হবে - এ বলে কি? এই ত' সেদিন এক কেলেঙ্কারী ক'রে বিষয়-আশয়গুলো নষ্ট ক'র্‌লেন, ছেলেটার মুখের দিকেও কি তাকান না, ভবিষ্যৎ কিছু কি ভাবেন না?

যাহা হউক বাস্তু যে হাত-ছাড়া করা হইবে না, ছেলেটার ভবিষ্যৎ যে নষ্ট ক'র্ত্তে দিবেন না, তাহার বিষয় তড়িতের সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া মতলব আঁটিতে লাগিলেন। বাস্তু বিক্রয় যে একটা অপমানের বিষয় তাহা দাদার বোধ থাক আর নাই থাক - তাঁহার ত' আছে?

তড়িৎ ঘোষ সেদিনই বাড়ী হইতে আসিয়া বড়বাবুর কীর্ত্তি দর্শনে হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় রামেশ্বর আসিলেন। তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল—কলিকাতায় গিয়াছিলেন নাকি?

রামেশ্বর। হাঁ তড়িৎ! ছেলে-মেয়েটা হঠাৎ চার পাঁচ দিন চলে গেছে, প্রাণটা খারাপ হ'য়ে গেছলো, তাই একবার দেখে এলাম।

তড়িৎ। হঠাৎ বাবুর এমন মতি পরিবর্ত্তন হ'লো কেন ছোটবাবু?

রামেশ্বর। কি জানি তড়িৎ। তোমার বাবুই জানেন, তবে শুনছি একদিন মেয়েয়-মেয়েয় গণ্ডগোল হ'য়েছিল।

তড়িৎ তাতেই কি আর এমন করা ভাল হ'য়েছে, তা নয়—তাঁর মতিছন্ন পুরা মাত্রায় ধরেছে!

রামেশ্বর। আজ যা শুনে এলাম, তাতে তাই বোধ হয়; কোন

বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক ক'রেছেন, পাঁচ হাজার টাকা খরচ, হাতে একটী পয়সা নাই, ব'লে দিলেন—তড়িৎ এলে তাকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিও, বাস্তু বিক্রয় না ক'র্‌লে আর উপায় নাই। হাঁ হে, তড়িৎ, দাদা যে এত টাকা রোজগার করেন—তা যায় কোথায় ?

তড়িৎ। সবই উড়ান, এক পয়সাও স্থিতি করেন না।

রামেশ্বর। তাইত' তড়িৎ! কথা ত' ভাল নয়। ভবিষ্যতের ভাবনাই যে বড়—আর কাহারও জন্য না হউক ছেলেটার জন্য যে প্রাণ কাঁদে—মেয়ে না হয় বিয়ে দিলে পরের স্কন্ধে যাবে।

তড়িৎ। সে আর আপনি ভেবে কি ক'র্‌বেন বলুন—বড়বাবু ত' কারুর কথা ভাবেন না।

রামেশ্বর। তুমি বৈকালে যাও, যদি বাস্তু-বিক্রয়ের কথা বলেন—তাহা হইলে—অপরের নাম ক'রে উহা আমাকে কিনিয়া দাও; আমি গহনাপত্র বেচিয়াও উহা হস্তগত ক'রে রাখি! ভবিষ্যতে ভবানীরই থাকিবে। উপস্থিত পাড়ায় বাস্তু-বিক্রয়ের নিন্দা হ'তেও রক্ষা পাই।

তড়িৎ আর ভবানীর জন্য কেন, ছোট বউদের নামেই করুন না।

রামেশ্বর জিব কাটিয়া বলিলেন—তা কি হয় তড়িৎ! দাদার নয় মতিচ্ছন্ন ধরেছে; আমার ত' ধরে নাই—আমি যে তার কাকা!

রামেশ্বরের উদারতা দেখিয়া তড়িৎ স্তম্ভিত হইল। এরূপ আভাস তিনি আরও অনেকবার পাইয়াছেন—কিন্তু এ যে অত্যন্ত বেশী, নিজের সম্বল ছাড়িয়া এতদূর করা কি মানুষের সাধ্য, ছোটবাবু কি তবে দেবতা! প্রকাশ্যে বলিলেন—যদি তাই ইচ্ছা, তবে টাকার যোগাড় করুন।

রামেশ্বর। তাও তোমাকে ক'র্‌তে হবে—আমার ত' আর নগদ টাকা নাই—ছোট-বউয়ের গহনাগুলি বিক্রয় ক'রে টাকা সংগ্রহ কর।

তড়িৎ। আচ্ছা আমি যাই—মনের ভাব বুঝে আসি।

এই বলিয়া তড়িৎ আহারাদি করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল এবং রাত্রি আটার সময় চাঁপাতলার বাটীতে গিয়া বাবুকে প্রণাম করিল। তড়িৎকে প্রত্যাগত দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর বাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বাটীতে তড়িতের আত্মীয়-স্বজন বেশী কেহ নাই। এক দূরসম্পর্কীয়া মাসীমাতা ও স্ত্রী; পুত্রাদি কিছুই নাই; যাহা হইয়াছিল—তাহা কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। তড়িৎ বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদে এখন সমস্ত ভাল—আর কোন প্রকার পীড়ার গোলযোগ নাই। তড়িৎ উত্তরে তাঁহার বাটীর সমস্ত কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—হঠাৎ আপনার কলিকাতা চলিয়া আসিবার কারণ কি? হেমলতার কি বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ তড়িৎ! দুই এক জায়গায় দেখাশুনা হইতেছে, তবে কলিকাতায় চলিয়া আসিবার উহাই কারণ নহে। ছোট-বউটা বড়লোকের মেয়ে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না; প্রত্যহ ঝগড়া করে—মানীর মান রাখিতে সে জানে না; কাজেই আর কত সহ্য হয়? "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনাঃ" স্থানত্যাগ করিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি। এখন তুমি এক কাজ কর; আমি সেখানকার বিষয়-আশয় সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিব; আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না, তুমি খরিদ্দার যোগাড় কর।

তড়িৎ বলিল—বাপের ভিটা একেবারে সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁর নাম ডুবাবেন; আমাদের এতদিনের অন্নজলের সংস্থানটাও একেবারে নষ্ট করিয়া দিবেন, এক কলমে এতদিন আপনাদের সংসারে কাজ করিলাম। বুড়ো বয়সে আমি আর কোথায় যাব?

সর্ব্বেশ্বর। তড়িৎ! সেজন্য ভাবনা কি? বিষয় বিক্রয় করিলে যে তোমাকে জবাব দিতে হইবে—তাহার কোন কথা নাই। এক রকমে না এক রকমে তোমার একটা কিনারা হইবেই!

তড়িৎ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ দিবার জন্য টাকা সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য—এ সমস্ত কথার কথা—কিছুই নয়। ছোট বাবুকে জব্দ করা এবং কিছু নগদ টাকা হস্তগত করাই বড়বাবুর ইচ্ছা।

গোমস্তা মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই রামেশ্বরের মুখে সমস্ত শুনিয়া আসিয়াছিলেন। রামেশ্বর তাহাকে অভয় দিয়াছেন—দাদা না রাখেন—সে তাহারই কাছে থাকিবে—চাকুরী যাইবে না।

রামেশ্বর যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—তড়িৎ তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে লাগিল; স্বামীর কথামত নির্ম্মলাও তাঁহার গাত্রের অলঙ্কার সমস্ত প্রদান করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। একদিন তড়িৎ ঐ সকল গহনা বিক্রয় করিয়া চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিল এবং বেনামী করিয়া দেবীপুরের জনৈক ব্যক্তিকে সর্ব্বেশ্বরের বিষয় বিক্রয় করিয়া দিল।

একটা জিনিষ তৈয়ারী করিতে যত সময় যায়—নষ্ট করিতে তত যায় না। বিষয় করিতে যে কি কষ্ট, তাহা সর্ব্বেশ্বর জানেন না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেবানন্দ যাহা করিয়াছিলেন, সর্ব্বেশ্বর অকাতরে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন—কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহে গোলযোগ।

কলির মানুষ বড়ই সঙ্কীর্ণচেতা। ছোট একটী পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে ক্ষুদ্র একটু প্রাণ লইয়া অবস্থিত, কাজেই তাহারা অনেকে একত্র থাকিয়া, বহু আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করিয়া, প্রাণের পরিসর বৃদ্ধি করিতে পারে না। ছোট হইতেও ছোট, ক্ষুদ্র হইতে আরও ক্ষুদ্র হইতে চায়। আধুনিক শিক্ষাই তাহাদিগকে এই দোষে দোষী করিয়াছে। নিজের পুত্র-কলত্র লইয়া ছোট একখানি ঘরের মধ্যে শুক-শারীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া কাল কাটাইতে পারিলে, সুখে স্বচ্ছন্দে দুই বেলা সামান্যরূপ আহার-বিহার করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। পূর্ব্বকালের ন্যায় বহুতর গোষ্ঠী একত্র হইয়া বিশাল সংসার পাতিতে আর তাহার ভালবাসে না।

অমৃতের সন্তান—মহামায়ার খাস্ তালুকের প্রজা আমরা এত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছি যে, নিজের মায়ের পেটের ভাইকে আর আপনার বলিতে পারি না। তাহার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ যখন আপনার করিয়া লইতে পারি না—তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ আমরা কি করিয়া রাখিব এবং তাহা রাখিতে আমাদের ক্ষমতাই বা কোথায়? যে ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার ভাবিত প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মসত্ত্বা অনুভব করিয়া যাহারা ব্রহ্মময় হইত; হায়! আজ তাহাদের এই অদ্ভুত পরিণতি দেখিলে বাস্তবিক চক্ষে জল আসে নাকি?

যত দিন যাইতেছে—ততই যেন আরও খারাপ হইতেছে। পিতা যেরূপ ছিলেন—পুত্র যেন তাহা অপেক্ষা আরও অনেক নীচে পড়িয়া যাইতেছে—পিতার ধর্ম্মভাব যেন তাহাতে কিছুমাত্র বর্ত্তাইতেছে না। মুখে আকাশ পাতাল জয় করিতেছেন—বাগাড়ম্বরে দিগন্ত কাঁপাইতেছেন—কাজে কিন্তু কিছুই নাই। দেবানন্দ যেরূপ ছিলেন—তিনি যে আশা করিয়া উপযুক্ত পুত্রকে আপনার সংকার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন—সর্ব্বেশ্বর তাহার তিলমাত্র প্রতিপালন করিলেন না, বরং বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার নাম লোপ করিয়া দিলেন। অকৃতি পুত্র। সংস্কৃত-ভাষায় শিক্ষিত রামেশ্বর এখন প্রাণপণে তাহা বজায় করিলেন। ভগবান যাহার সহায়, তাহার ভাবনা কি?

তড়িৎ ঘোষ বুঝিল—বড়বাবু আর তাহাকে রাখিতে পারিবেন না। গোমস্তা রাখা আর তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইবে না তিনি মুখে কিছু বলিতে পারুন আর নাই পারুন—কার্য্যতে দেখাইবেন। দুই একমাস মুখের খাতিরে কিছু বলিবেন না বটে কিন্তু যত দিন যাইবে—তত তিনি অপারক হইয়া পড়িবেন. তখন খোরাকই দিতে পারিবেন না—তা মাহিনা ত' পরের কথা! সে সময় মনোমালিন্য করিয়া চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা এখন হইতে নিজেই মানে মানে সরিয়া পড়া ভাল। বহুদিন ত' তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, শেষে কি টাকার জন্য একটা বিরোধ বাধাইয়া বসিব। বাহিরের আমদানী না থাকিলে কে কতদিন নিজের তহবিল হইতে একজনের মাহিনা সরবরাহ করিতে পারে? মাহিনা লইয়া থাকিতে পারিলে বরং ভাত-কাপড়টা কষ্টে যোগাইতে পারে। যদি এইরূপে থাকিতে হয়, তাহা হইলে বড়বাবুকে ছাড়িয়া ছোটবাবুর আশ্রয় লওয়াই ভাল। টাকা না পাই, ধর্ম্ম-কর্ম্মে সময় কাটাইতে পারিব ত' ঐহিক না হউক, পারত্রিক অনেক উন্নতি হইবে ত'? সর্ব্বেশ্বর দেবী-

পুরের বিষয়াদি বিক্রয় করিবার দশ পনর দিন পরে তড়িৎ সেই যে বাটী যাইবার অছিলা করিয়া চলিয়া আসিল, আর তাঁহার সহিত দেখা করিল না।

রামেশ্বর স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া এবং কয়েকজন শিষ্যের নিকট কিছু সাহায্য পাইয়া পিতৃবাস্তু বেনামী খরিদ করিয়া লইলেন তার পর কিছুদিন পরে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বনামে উহা রেজেষ্টী করিয়া লইবেন। তড়িৎ ঘোষ একজন পাকা গোমস্তা—এ কার্য্যে সে মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। কোন পক্ষে না ক্ষতি হয়—আইন-সঙ্গত কোন প্রকার গলদ না থাকে, নিজের বুদ্ধি অনুসারে তাহা করিতে ত্রুটী করিল না, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই যে তাহার সমান, কাহাকে রাখিয়া সে কাহার অনিষ্ট করিবে? বিশেষতঃ ছোটবাবু পূর্ব্বে পিতার সমস্ত বিষয় হইতে ফাঁকী পড়িয়াছেন. সর্ব্বেশ্বর মিছামিছী জমী-দারীর দেনা দেখাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এখন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে দেখা উচিত। কারণ, রামেশ্বর ধর্ম্মপক্ষ, সর্ব্বেশ্বর অধর্ম্মপক্ষ এবং সেই অধর্ম্মেই এখন হইতে তাঁহার অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে· সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার অবস্থা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে—তাহা কে বলিতে পারে; পাপ করিয়া কে কবে চিরসুখী হইয়াছে?

ছোটবাবু নিরীহ ভালমানুষ—দাদার প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অবিশ্বাস নাই। এই জন্য তিনি কিছুমাত্র প্রতিবাদও করেন নাই; অবাধে সমস্ত সহ্য করিয়া দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন—তথাপি দাদার সহিত আইন-আদালতে লিপ্ত হন নাই; তড়িৎ অনেক বলিলেও দাদার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। দাদা তাহার অংশের বিষয় ফাঁকি দিয়া যদি তাহা বংশের দুলাল ভবানীর জন্য রাখেন—তাহা হইলে রামেশ্বরের দুঃখ নাই কিন্তু এখন দেখিতেছেন—

দাদার সে অভিপ্রায় নয়—সমস্ত অপব্যয়ে নষ্ট করাই উদ্দেশ্য; তাঁহা। চরিত্র ছারখারে গিয়াছে- অর্থ-সঞ্চয় হইবে কিসে? অতএব পিত। বিষয় যাহাতে পরের হস্তগত না হয়, তাহা করা বিধেয়—এই জন্য সদা শাস্ত হইয়াও রামেশ্বর ইহা রক্ষা করিয়াছেন। বৌটী নাকি খুব ভাল যথার্থ সদ্বংশের মেয়ে—তাই অকাতরে তাঁহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তড়িৎ যেরূপ পাকা দলিল-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে—তাহাতে ভবিষ্যতে আর কাহারও দাঁত ফুটাইবার ক্ষমতা নাই

কার্য্য-কর্ম্ম শেষ করিয়া দিয়া তড়িৎ জন্মের মত এ বাড়ী ত্যাগ করিতে চাহিল। রামেশ্বর বলিলেন—তড়িৎ! এ বয়সে আর তুমি যাইবে কোথায়? দাদা রাখিতে পারিলেন না বলিয়া কি এতদিনের একটা পুরাতন মুনীব-বাড়ী ছাড়িয়া অপর স্থানে দাসত্ব করিবে; সে বয়স কি আর তোমার আছে? নূতন স্থানে যাইলে কত নূতন নূতন কাজ করিতে হইবে, কত নূতন নূতন হুকুম তামিল করিতে হইবে—এ বয়সে আর তুমি তাহা পারিবে না, এইজন্য বলিতেছি—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর, আর আমার সংসার দেখ; জমীদারী ত' আ। নাই? পিতৃদেবের অতিথিশালার ইজেরাদারী আমার স্কন্ধে পড়িয়াছে দেবসেবা, চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সেবা-শুশ্রূষা ত' রহিয়াছে, ইহা ত' আর আমি একাকী দেখিতে পারিব না; তুমি আমাকে এ সকল বিষয়ে সাহায্য কর—এস, দুই জনে মিলিয়া জীবনের এই সকল মোক্ষপ্রদ কাজে আত্ম-নিয়োগ করি—ইহাতে অর্থ যত না হউক, পরমার্থ ত' হইবে? তার পর আমার যদি একবেলা যুটে, তাহা হইলে তোমারও অভাব হইবে না জগদম্বা একপ্রকার চালাইয়া দিবেনই, তাঁহার পদে মতি রাখিয়া চলিলে জগতে কাহার কবে অচল হইয়াছে?

ছোটবাবুর যা কথা সেই কাজ, তিনি কখন কাহাকেও স্তোক-বাক্যে

ভুলাইয়া আকাশের চাঁদ হাতে দেন না, আর কাহাকেও নিরাশ করিয়া একেবারে নরকেও ডুবান না। যাহা বলেন—তাহা অকাট্য—কখন নড-চড করেন না! তিনি যখন ছাড়িতে চাহিতেছেন না—সমভাবে থাকিবার জন্ম জেদ করিতেছেন, তখন আর এ বয়সে অন্যত্র ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি? এ সময় অন্যত্র যাওয়াও ত' সহজ নহে—কত প্রকার নূতন খাটুনী খাঁটিতে হইবে—এ বয়সে কি আর তাহা পারিব?

যখন তাহার সংসার তত বড় নহে এবং তাহাতে খরচ-খরচাও যখন বেশী দিতে হয় না, তখন আর ইতস্ততঃ করিয়া কি হইবে, পরকালের কিছু কাজও ত' করা চাই? ছোটবাবুর মত ধার্ম্মিকের কাছে থাকিলে তাহা অবাধে সঞ্চয় হইবে। তড়িৎ আর ভিন্ন মত না করিয়া রামেশ্বরের কথাতেই সায় দিল—রাজী হইল।

পুরাতন গোমস্তা তড়িৎ আসিয়া যোগদান করিলে রামেশ্বরের বাহিরের পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হইল। হাট-বাজার এবং সংসারের অভাব-অভিযোগ সে সমস্তই দেখিতে লাগিল। সেও এ বিষয় খুব পাকা, পিতার আমলে সেই যে স্বহস্তে এ সকল কার্য্য সমাধা করিত। দাদার তাঁবে কিছুদিন চাকরী করিয়াই কেবল এ সকল ছাড়িয়া দিয়াছিল বই ত' নয়! দাদা যে এ সকল কাজে একেবারে নারাজ, মহা বিরোধী ছিলেন—প্রভু বিরোধী হইলে, ভৃত্য না হইয়া থাকিতে পারে কৈ?

রামেশ্বর এখন অনেকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। বাহিরের কাজ এখন সমস্ত তড়িৎই করিতেছে। পিসীমা যাহা বলেন—যে দ্রব্যের অভাব হয়, তড়িৎকে বলিলে—সে তৎক্ষণাৎ তাহা সরবরাহ করে; হাট-বাজার করা, শিষ্য-যজমানের নিকট চাঁদার টাকা আদায় করা—এখন তড়িতেরই কাজ হইয়াছে—তাহাকে সকলে জানে—কাজেই ইহার জন্ম

আর রামেশ্বরকে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয় না। তিনি প্রায় সমস্ত দিনই ধর্ম্ম-কর্ম্মে কাল কাটান।

ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসারাশ্রমের প্রথম অবস্থায়, নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষার সময়। এ সময় কর্ম্মে পরিলিপ্ত না হইলে যথার্থ কর্ম্মী হইতে পারা যায় না। এ সময় তামসিক বা পশুভাবের অবস্থা—কর্ম্মকাণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। তামসিক অর্থে—আলস্য ঔদাস্যে খেলা করিয়া সময় কাটান নহে। এই অবস্থায় কর্ম্মে সুদৃঢ় হইতে হয়—পূজা, আহ্নিক, জপ, তপ প্রভৃতিতে চিত্ত সংযত করিতে হয়।

সময় পাইয়া রামেশ্বর এইবার সেইরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হইলেন। রাত্রি চারিটার সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরুর স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন। তার পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান সমাপন করিয়া গৃহে আসেন। ইতিমধ্যে নির্ম্মলা দেবগৃহে সমস্ত পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়া দেন। রামেশ্বর পূজা-গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজা, ভোগ, আরতি, সন্ধ্যাহ্নিক, জপ, তপ সমাধা করিয়া, অতিথিগণের সেবাকার্য্যে যোগদান করে। কয়েকটী সহকারী সহ নিজে তাঁহাদের পরিতোষরূপে আহার করেন। পাঁচ ছয় জন অতিথি প্রায়ই তথায় অবস্থান করেন, সময়ক্রমে বিশ পঁচিশ জনও হয়, অতিথির আধিক্য দেখিলে রামেশ্বরের বড় আনন্দ হয়। রামেশ্বরের অর্থ নাই—তথাপি এই কার্য্য যে মা কোথা হইতে এমন সুশৃঙ্খলায় চালাইয়া দিতেছেন—তাহা তিনিই জানেন। মন থাকিলে এ সকল কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে না। অতিথিগণের ভোজনের সময় দাক্ষায়ণী ও নির্ম্মলা পাকশালায় গলবস্ত্রে দাঁড়াইয়া থাকেন, আপ্ বাড়াইয়া সমস্ত সরবরাহ করেন। রন্ধন কিরূপ হইয়াছে, অতি বিনীত ভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করেন—সকলে

সুখ্যাতি করিলে, তাঁহাদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—মনে মনে মা অন্নপূর্ণার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করেন। রন্ধন-কার্য্যই স্ত্রীজাতির জীবনে মহাশিক্ষণীয় বিষয়। যিনি এ কার্য্যে গুণপণা দেখাইতে না পারেন, রন্ধন-কার্য্যে যাহার বিশেষ পারদর্শিতা নাই, তাঁহার রমণীত্ব কোথায়? বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের গৃহে স্ত্রীজাতি অন্নপূর্ণার আসন গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহার জন্মই বৃথা!

অতিথিসৎকার শেষ হইলে, পাঁচ ছয় জন ছাত্রকে পুত্রনির্ব্বিশেষে আহার করাইয়া রামেশ্বর গৃহের মধ্যে ও তড়িৎ বাহিরে আহার করিতে বসিতেন। তাঁহাদের আহার হইলে, ভৃত্য গোবর্দ্ধন অবশেষে দাক্ষায়ণী ও নির্ম্মলার ভোজন হইত। এরূপ আদর্শভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা এখন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে; এই জন্য সাধারণে ইহার মর্য্যাদা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না।

আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, রামেশ্বর ছাত্রগণের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন—প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ঠিক পিতার মত তাহাদের শিক্ষাদান করিয়া অতিথিগণের রাত্রি-ভোজের ব্যবস্থা করিতেন। অতিথিগণ রাত্রিতে প্রায় সকলেই জলযোগের ব্যবস্থা দিতেন—সেই অনুসারে দাক্ষায়ণী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। নির্ম্মলা ছাত্রগণের জন্য কাহারও অন্ন, কাহারও রুটী, কাহারও বা ইচ্ছানুসারে ফলাহারের ব্যবস্থা করিতেন। ছাত্রগণ এখানে নিজের গৃহ অপেক্ষাও সুখে থাকিত, শরীর একটু অসুস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা হইত। পূর্ব্বে গুরুগৃহে শিষ্যগণের এরূপ আদর-আপ্যায়ন, এরূপ সেবা-যত্ন ছিল বলিয়া কত দেশ-দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ এইরূপ আশ্রয়ে আসিয়া মানুষ হইয়া যাইত, জ্ঞানালোকে হৃদয় আলোকিত করিয়া, জীবনের পথ মুক্ত করিত। এখন এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকারের স্থানে বিষম

স্বার্থপরতার নিবিড় ছায়া পাত হইয়াছে ; কাজেই আর্য্যশাস্ত্র-শিক্ষায় আর কাহারও তত আগ্রহ নাই

সর্ব্বেশ্বর দেশের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। ছোটভাই, ভ্রাতৃবধূ বা পিসীমাতার কোন খোঁজ-খবর রাখেন না ; তবে ছেলে-মেয়েটার জন্য প্রাণ খারাপ হয় বলিয়া, রামেশ্বর সময়ে সময়ে তাহাদের দেখিতে কলিকাতায় যান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা বধূ তাঁহার আদর-যত্ন করুন আর নাই করুন—তিনি তাহাতে তত গ্রাহ্য করেন না—এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন প্রভাত হইলেই চলিয়া আসেন। কোন বার দাদার সহিত দেখা হয়, কোন বার হয় না। দাদা কোথায় থাকেন—তাহার খোঁজই পান না।

মহিমচন্দ্র এখন আরোগ্য হইয়াছে, সে এখন বাড়ীর কর্ত্তা। যাহা করে—তাহাই হয় ; যাহা না করে—তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহার স্বভাব সেইরূপই আছে, বিবাহাদি হয় নাই—লাম্পট্য পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান, তবে কলিকাতায় ত' আর এ অভাব পূরণের ভাবনা নাই ?

ভবানী এখন বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে। সে বেশ মেধাবী বালক ; পড়াশুনায় তাহার প্রবৃত্তি খুব—এখনও যোল বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই—এই অল্প বয়সেই সে প্রবেশিকা পড়িতেছে। প্রথম শ্রেণীর সে প্রধান ছাত্র ; প্রতি বৎসর প্রথম পারিতোষিক তাহার একচেটিয়া—সে যে অতি সুখ্যাতির সহিত এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভবানীর এখন জ্ঞান হইয়াছে, সে খুড়া-খুড়ীকে অন্যত্র থাকিতে দেখিয়া বড়ই দুঃখ করে, পিতামাতাকে তাহার জন্য কত অনুরোধ করে—কিন্তু তাহার কথা শুনে কে ?

পিতা মাতা যতই মন্দ হউন, পুত্রের নিকটে তাঁহারা দেব-দেবী, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা উচিত নয়। তবে ছুটীছাটা পাইলে

সে কাকা-কাকী ও ঠাকুরমার নিকট দেবীপুরে, যাওয়া-আসা করে, ইহার জন্য সে পিতার নিকট না হউক, জননী ও মাতুলের নিকট কত তিরস্কৃত হয়, তথাপি ছাড়ে না—আঁতের টান কোথায় যাইবে?

কাকা কলিকাতায় ভবানী ও হেকমে দেখিতে আসিলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। রামেশ্বর যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ তাহারা কাছ-ছাড়া হয় না। রামেশ্বরও তাহাদের জন্য কত প্রকার ভাল ভাল খাবার, ভাল ভাল খেলনা লইয়া আসেন, বালিকা হেমলতা তাহা পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া যায়। আর ভবানী এখন কেবল ভাল ভাল শাস্ত্রগ্রন্থের ফরমাস করে, রামেশ্বর এক একখানি হাতের লেখা পুঁথি আনিয়া দেন, তখন ত' আর ছাপার প্রচলন এত হয় নাই?

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় গঙ্গার উপর পুলও হয় নাই। নৌকা-ইষ্টিমারে পারাপার হইতে হইত; কাজেই ভবানীকে একাকী কলিকাতা হইতে আসিতে দিতেন না, রামেশ্বর নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন, আবার ছুটি ফুরাইলে রাখিয়া যাইতেন। কখনও নিজে কখনও বা তড়িতের দ্বারা এ কাজ হইত। তড়িৎ এখন ছোটবাবুর অধীনে কার্য্য করিতেছে; রামেশ্বর এখন আবার মানুষ হইয়া গোমস্তা রাখিয়াছে দেখিয়া প্রমোদা ও মহিম রাগে গস্ গস্ করিত, হিংসায় ফাটিয়া মরিত। সর্ব্বেশ্বর সেজন্য তেমন কিছু হিংসা করিতেন না, বলিতেন—সে যদি পারক হইয়া থাকে লোক রাখিবে না কেন? রাখা ত' ভালই। সময়ে সময়ে সর্ব্বেশ্বরের প্রাণে এরূপ সাদাসিদা ভাবও উদয় হইত।

হেমলতার বিবাহের অছিলা করিয়া পিতার বাস্তু বিক্রয় করা হইল কিন্তু কই, বিবাহের ত' কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মেয়ে বড় হইতেছে, তাহার জন্য পিতা-মাতার কোন চিন্তাই নাই। বিষয় বিক্রয় করিয়া এত টাকা পাইলেন, তবে কি দাদা তাহা নয়-ছয় করিয়া ফেলি-

বেন, সমস্ত কি ইয়ারকীতে নষ্ট করিবেন? সে কথা বলেই বা কে আর শুনেই বা কে?

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রামেশ্বর ভ্রাতার কোন সংবাদ পান নাই। সেই পূজার ছুটিতে ভবানী আসিয়াছিল, তারপর আর আসে নাই, কোন পত্রাদিও লেখে নাই, তবে সে বলিয়া গিয়াছিল—কাকা! এইবার পরীক্ষার সময় আসিতেছে, আমাকে এইবার অনবরত পরিশ্রম করিতে হইবে, পরীক্ষা শেষ না করিয়া বোধ হয় আর আসিতে পারিব না। সে সেই জন্য ব্যস্ত আছে—তাঁহারা পতি-পত্নীতে এইরূপ চিন্তাই করিয়া থাকেন।

একদিন বৈশাখ মাসের প্রাতঃকালে রামেশ্বর গঙ্গাস্নান গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই; এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খামের ভিতর, কাজেই নির্ম্মলা তাহা পড়িতে পারিলেন না। স্বামী আসিলে উহা প্রদান করিলেন। পত্র আসিয়াছে দেখিয়া রামেশ্বর তাড়াতাড়ি উহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা আছে - "রামেশ্বর! হটাৎ হেমলতার একটী সম্বন্ধ যুটিয়া গিয়াছে, আগামী মঙ্গলবার বিবাহের দিনাস্থির হইয়াছে, আমি যাইতে পারিলাম না, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। তুমি আসিও।"

মায় পেটের ভাই রামেশ্বরকে পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইল; ছোট বউ বা পিসীমাতাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও জিদ করা হইল না। সর্ব্বেশ্বর হইলে বোধ হয় এ পত্র গ্রাহ্য করিতেন না, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন না কিন্তু রামেশ্বর তাহাতে কোন প্রকার মান-অপমান বোধ করিলেন না, তাঁহার প্রাণের ভ্রাতুষ্পুত্রী সৎপাত্রে পড়ুক, স্বামী সুখে সুখিনী হউক, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিবাহের দিন ক্ষমতা মত যৌতুক লইয়া তিনি বিবাহ-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাস্তরক্ষার জন্য

যখন সমস্ত গহনা বিক্রয় হইয়া যায়, তখন নির্ম্মলা একখানি গহনা রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হেমলতার বিবাহের জন্য আজ সেই হীরার বালা এক যোড়া স্বামীর হস্তে দিলেন। রামেশ্বর তাহা লইয়া তড়িতের সহিত দাদার কলিকাতার ভবনে গমন করিলেন।

পাত্রটী খুব ভাল,সদ্বংশের ছেলে, বেশ শিক্ষিত, পিতামাতা বর্ত্তমান তাঁহাদের সংস্থানও কিছু আছে; মেয়েটা খাওয়া-পরার কষ্ট পাবে না, তারপর উপযুক্ত হইয়া কিছু আনিতে পারিলে ত' সোণায় সোহাগা হইবে। পাত্রটী খুব সুরূপ, ঢল-ঢলে চেহারা, দেখিলে চরিত্রবান বলিয়াই বোধ হয়।

সর্ব্বেশ্বর যাহা চুক্তি করিয়াছিলেন- যে সব গহনা দিবার কথা ছিল, তাহা দেন নাই। এইজন্য বিবাহবাসরে নানারূপ বচসা হইতেছে; পাত্রের পিতার মন উঠে নাই, তিনি যেন এই বিবাহ দিতে নারাজ। সর্ব্বেশ্বর বলিতেছেন—মহাশয়! আমি যখন দিব বলিয়াছি, তখন দিবই, এই অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া উঠে নাই; বালা আমি ইহার পর প্রস্তুত করিয়া দিব।

বরপক্ষীয় একজন বলিলেন—মশাই! "বে ফুরুলে ছেংলায় নাতি" পরে কি আর পাওয়া যায়—উহা সকলেই বলিয়া থাকেন। আপনার গহনা গড়ান না হইয়া থাকে, টাকাই ধরিয়া দিন না। টাকাও হাতে নাই—সর্ব্বেশ্বর বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীর নিকট গিয়া যোড়হস্তে বলিলেন —দেখ, প্রমোদা! বালা যোড়াটী দাও, বিবাহ চুকিলে আমি তোমায় পুনরায় গড়াইয়া দিব। প্রমোদা বলিলেন—আর তুমি গড়াইয়া দিবে; যেখানকার যা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিলে, এর পর আর কোথা থেকে টাকা আসবে? আমি ঘর ছাড়িয়া পথে বসিব কি? এত খরচ করিয়া মেয়ের বিয়ে না দিলেই হইত?

সর্ব্বেশ্বর। দেখ, কিছু বেশী খরচ হবে ব'লে কি, যা তা পাত্রে মেয়েটাকে ফেলে দেওয়া যায়! ওর ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে হবে ত'?

প্রমোদা। দেখ, ও সমস্ত বরাৎ, তুমি ভাল দেখে দিলেই মেয়ে সুখী হবে না, ওর বরাতে না থাকিলে তুমি হাজার চেষ্টা কর কিছুতেই কিছু ক'র্ত্তে পার্ব্বে না। ঐ বোসেদের মেয়ের কি ছিলো, কত গরীব দেখে দিয়েছিল, এখন কত সুখ ভোগ ক'চ্ছে দেখছো ত'?

সর্ব্বেশ্বর। দেখ, ভাল দেখে দিয়ে ত'সন্তুষ্ট হ'লাম, তার পর ওর কপালে যা থাক, বাপ-মা কবে খারাপ দেখে দেয়?

প্রমোদা। তা উজান বুঝে দিতে হবে ত', তোমার ক্ষমতা বুঝা ত' উচিত ছিল!

সর্ব্বেশ্বর এখন যা হবার হ'য়েছে, তুমি আমার মান রক্ষা কর।

প্রমোদা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন—টাকা ধার করিয়া দাও।

রামেশ্বর সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন, অবাক হইয়া মনে মনে বলিলেন—মা বটে! তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—দাদা এত গোলযোগ কিসের।

সর্ব্বেশ্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত বলিলেন। রামেশ্বর বলিলেন—তা আর কি হবে, লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, আর দেরী ক'র্‌লে চল্‌বে না। আমি বালা দিচ্ছি, তুমি কন্যা সম্প্রদান কর। সর্ব্বেশ্বর হাতে স্বর্গ পাইলেন, আজ এই দারুণ বিপদে মায়ের পেটের ভাইয়ের দ্বারা যে কিরূপ উপকার হয়—তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—রামেশ্বর! যথার্থ ভাইয়ের কাজ ক'র্‌লি, আজ যেরূপ মান রাখ্‌লি—তাহা জীবনে কখন ভুল্‌বো না।

সামান্য আট ভরির সোণার বালা দিবার কথা ছিল, এক্ষণে বরকর্ত্তা

তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দর হীরার বালা পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট-চিত্তে বিবাহে অনুমতি প্রদান করিলেন।

জগদীশ প্রসাদের সহিত হেমলতার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। হেমলতা বালিকা হইলেও কাকার ত্যাগস্বীকার দেখিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল। ভবানীর আনন্দও বড় কম হইল না। তাহার ধার্ম্মিক কাকা যে এরূপ করিয়াছেন—ইহার আর বিচিত্র কি, আমাদের জন্য তিনি যে প্রাণ দিতে পারেন!

পাত্রটী রামেশ্বরের বেশ পছন্দ হইয়াছিল, তাহার পিতার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া হেমলতা যে সৎপাত্রে পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

বর ক'নে শ্বশুর বাটী চলিয়া গেল। আজ সর্ব্বেশ্বর একটী মহাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন—সে দায়োদ্ধারের কর্ত্তা রামেশ্বর।

বিবাহ বাস্তবিক দুই চারিদিনের কথাতেই স্থির হইয়াছিল, এই জন্য আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ আসে নাই। অমনি একপ্রকার পর লইয়া কার্য্য সমাধা হইল। সর্ব্বেশ্বর কন্যার বিবাহে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তবে চাকুরীটা খুব ভাল করেন তাই, নতুবা তাঁহাকে এইবারেই পথের ভিখারী হইতে হইত।

প্রমোদা নিজের গরবেই মত্ত—পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জাতেই বিব্রত' এত বয়স হইল, মেয়ের বিয়ে হইয়া জামাতা হইল, তথাপি তিনি বিলাসিতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না। ইচ্ছা করিয়া এ সকল বর্জ্জন না করিলে, লজ্জার খাতিরে এ সকল ত্যাগ না করিলে কি সহজে ছাড়িতে পারা যায়? তবে আর বেশীদিন এ সমস্ত থাকিবে বলিয়া ত' বোধ হয় না; বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। অবস্থা যারপরনাই মন্দ হইতেছে।

এই বিষম দায় হইতে যে রক্ষা করিল, অকাতরে এত টাকার গহনা দিল, সেই প্রাণের দেবরকে প্রমোদা একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন না—তোমরা কেমন আছ! রামেশ্বর তাহার জন্ম তিলমাত্র দুঃখিত হইলেন না. তিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাধা করিয়া পরদিন সন্ধ্যা-কালে তড়িতের সহিত বাটী চলিয়া আসিলেন। ভবানী পরীক্ষায় পাশ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে, সে থাকিলে বোধ হয়—সঙ্গে আসিত, কিন্তু সে ভগ্নীকে শ্বশুরবাড়ী রাখিতে গিয়াছে—আসিবে কেমন করিয়া?

—— ——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদর্শ-কর্ম্মী।

দ্বিজত্বই মানব-জন্মের চরম! অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য-জন্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিজত্ব লাভ বহু সাধনসাপেক্ষ; বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে, জীবের এ অবস্থা লাভ হয় না। যাঁহারা বহু তপস্যার ফলে এ অবস্থা লাভ করিয়াও কার্য্যগুণে আবার পতনের দিকে চরণ চালনা করেন—তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কি আর অবধি আছে?

সর্ব্বেশ্বর ও রামেশ্বর এক পুণ্যময় পিতামাতার পুত্র হইয়া, পূর্ণরূপে দ্বিজত্বের অধিকার লাভ করিয়া, কর্ম্মগুণে একজন অধঃপতনের পথে, আর একজন ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান। একজন বিবেকবুদ্ধিবিহীন হইয়া দ্বিজত্বে জলাঞ্জলি দিতেছেন, আর একজন সম্পূর্ণ বিবেকবলে আশ্রমোচিত ক্রিয়া-কলাপে মতিমান হইয়া দ্বিজত্বের পূর্ণ প্রতিভামণ্ডিত হইতেছেন। দুই জনে এক হইলেও কার্য্যগুণে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছেন। আশ্রমোচিত শিক্ষাই ইহার কারণ; সর্ব্বেশ্বরের তাহা নাই —তাই পদে পদে পতনপরতন্ত্র হইয়া পড়িতেছেন। আর রামেশ্বর সে বিষয় সম্যক্‌ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান, পদস্খলনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

গুরু সন্নিধানে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়া সংযমের দ্বারা আত্মবশীভূত করাই দ্বিজত্বের প্রথম সাধনা—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। তার পর মানব বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া সংসার

পাতিতে চায় ; ত্যাগের ভিতর দিয়া যখন তাহারা এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে—তখনই গৃহস্থাশ্রমের উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ হয়!

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাধনা সমাপন করিয়া পুরুষ যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে—তখন প্রকৃতির সহিত মিলনেচ্ছা স্বভাবতঃই তাহার মনে জাগরিত হইয়া পড়ে। এ সময় নানা বাধাবিঘ্ন, নানা দুঃখ ঝঞ্ঝা তাহার সম্মুখীন হইলেও জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এবং সংযমের দ্বারা সমস্ত ছাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সে অনায়াসে—অক্লেশে আপন মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে বলিয়াই বিবাহ করে। বিশ্বের মঙ্গল জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া সে তাহাতেই মজগুল হইয়া পড়ে—তখন সে সকল বস্তুতেই সেই একই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পায়—যিনি "শিবং সত্যং"। তখন সে বিশ্ব-হিতের জন্য নানা বিচিত্র কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়— প্রকৃতির সহিত বিচিত্র-মিলনে মিলিত হইয়া— সেই সর্ব্ববিচিত্রতার মধ্যে কেবল সেই একেরই অস্তিত্ব দেখিতে পায়— যিনি "শিবং সংমব্যয়ং"! তাঁহারই উপাসনা করে—যিনি—"সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারণম্!" এই সময় মানবের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ হইয়া দ্বিজত্বে পূর্ণ পরিণতি সংসাধিত হইয়া থাকে, তখন সে পূর্ণ যৌবন তেজে তেজীয়ান হইয়া. নবমুকুলিত শক্তিস্বরূপিণী পত্নীর সাহায্যে অপরিমিত বলশালী হইয়া বিশ্ববাসীর সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করে।

প্রবৃত্তি যখন আপনার বশে থাকে, তখন তাহাকে সংযতভাবে নাড়াচাড়া করা কঠিন নহে। রিপুগণকে তখন এক একটী গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া প্রযুক্ত করিলে—তাহাতে হিত ব্যতীত অহিত হইবে না এবং তাহাতে প্রেমের ভাব আরও সমুজ্জ্বল গরিমায় ফুটিয়া উঠিবে। তখন আর কোন ইন্দ্রিয় তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারিবে

না বরং তাহারা সাধনক্ষেত্রে সাধকের পূর্ণ সহায়রূপে সকল বাসনা সংপূরণ করিয়া দিবে।

ব্রহ্মচর্য্যে যাহা শিক্ষা হয়—গার্হস্থ্যাশ্রমে তাহারই সার্থকতা লাভ। যে স্বার্থত্যাগ করিতে না শিখিয়াছে, পরহিতে যে আত্মবিসর্জ্জন দিতে না পারিয়াছে, এ আশ্রমে তাহার সুখ নাই। দুঃখের দাবদাহে দগ্ধ হইতে না পারিলে—সুখের পরম আনন্দ-আরাম কিছুতেই পাওয়া যায় না। দুঃখই যে সুখের নিদানভূত কারণ, মনুষ্যত্ব বিকাশের ইহাই যে চরম পন্থা! ভূমার দিক হইতে যে ডাক মানুষের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিঁড়িয়া দেয়, তাহা ত' শুধু প্রমোদ-শিল্পবনের কলকণ্ঠ কোকিলের কণ্ঠোচ্চারিত মধুর কুহুধ্বনি নহে, তাহা যে মহাভীম রুদ্রদেবের ত্রিলোক-বিধ্বংসী পিণাকের ভৈরব গর্জ্জন। যে মানুষ ইহাতে ভয় করে না—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ইহাকে আদরে তুলিয়া লইয়াছে—সেই ত' দ্বিজ, তাহাতেই ত' তাহার দ্বিজত্বের চরম বিকাশ।

গার্হস্থ্যজীবনে দ্বিজ বিচিত্র কর্ম্মে—নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সেই ভূমা, সর্ব্বরূপী পুরুষকে চিনিতে বুঝিতে, অনুভব করিতে চেষ্টা করে, এই বিষম দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার গভীরতা লাভ করে। যখন এই দুঃখনিশি সীমা অতিক্রম করিয়া অবসানের রক্তিমচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইবে—তখনই সে ভূমানন্দ অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

গার্হস্থ্য-জীবনে পরম জ্ঞানবান রামেশ্বর দ্বিজত্বের ভাবে বিভোর হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে মন দিয়াছেন। জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন, ভক্তির জন্য আবার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু মূলে কর্ম্ম না করিলে কিছুই পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য পরম সুখকর। গৃহিণী এই আশ্রমের সর্ব্বেসর্ব্বা—সর্ব্বমঙ্গলা, মহাশক্তি। রামেশ্বরের গৃহিণী নির্ম্মলা আ

তাঁহার সকল সাধন-কার্য্যে সাহায্যকারিণী, কাজেই কোন কার্য্যে বিঘ্ন নাই। বিশ্বের হিতসাধন যাঁহাদের অন্তরের ইচ্ছা, যাঁহাদের সাধনার চরম—তাঁহাদের বাধাবিঘ্ন, দুঃখদৈন্য কোথায়? আসিলেও সহিষ্ণুতার বাণবিদ্ধ হইয়া তাহা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—অনুভবই হয় না। ধর্ম্মকে যাঁহারা আশ্রমের সার সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদের বাধাবিপত্তির উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর নহে।

দাদা আর এখানে নাই—তিনি পদে পদে নানা প্রকার বাধা প্রদান করিতেন, এ সকল সৎকার্য্যে নিরুৎসাহ করিতেন; এখন তিনি স্বইচ্ছায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এইবার তিনি পূর্ণমাত্রায়, বিষম উদ্যমে সংসারাশ্রমে ব্রতী হইলেন। কর্ম্মই সংসারের প্রধান সাধনা। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন, দান, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ষট্ কর্ম্ম প্রাণপণে সমাহৃত করিয়া রামেশ্বর প্রতিদিন প্রগাঢ়রূপে ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। পরম শিক্ষিতা বিদুষী পতিব্রতা নির্ম্মলা যখন তাঁহার সাহায্যকারিণী শক্তি, ব্রহ্মচারিণী পরম মঙ্গলময়ী পিসীমাতা দাক্ষায়ণী যখন তাঁহার সহকারিণী—তখন তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দিবে কে? রামেশ্বর দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্যে সমাগত ছাত্রগণ বেশ কৃতিত্ব লাভ করিতে লাগিল। শিষ্য-যজমানগণ তাঁহার যাজন-কার্য্যে বিশেষ ফললাভ করিয়া একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক রূপে যে প্রতিগ্রহণ করিতেন—তাহা অতিথিশালায় ব্যয় করিয়া রামেশ্বর দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সুযশ-মহত্ত্ব চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণোচিত আচার-বিচারে পাণ্ডিত্যলাভ ও ধনাগম হইতে লাগিল। বিলাসিতা তাঁহাদের কিছুমাত্র নাই—একখানি কাপড় ও চাদর হইলেই তাঁহার যথেষ্ট; পাদুকা প্রায়ই ব্যবহার করেন না নগ্নপদেই ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে তিনি চিরাভ্যস্ত। অনবরত পাদুকা ব্যবহার করিলে, দেহের ক্ষতি হয়—কিছু সময় খালি পায়ে বেড়াইয়া পৃথিবীর মাটীর সহিত সম্বন্ধ রাখিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ প্রভৃতি পঞ্চভূত দেহের পক্ষে পরম উপকারী, এইজন্য তিনি প্রায়ই খালি-গায়ে খালি পায়ে থাকিতেন। তবে অতিরিক্ত শৈত্যে মোটা চাদর এবং প্রবল বৃষ্টির সময় কখন কখনও পাদুকা ব্যবহার করিতেন। পূজাগৃহে প্রবেশের সময় কাষ্ঠ পাদুকা তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। খাইয়া তিনি বেশী সুখ পাইতেন না—খাওয়াইয়া তাঁহার অতিরিক্ত সুখ হইত।

বাস্তবিক অতিরিক্ত ভোজনে সুখ নাই—তাহাতে জীবনী-শক্তি না বাড়িয়া বরং ক্ষয়ই হয়, অখাদ্য কুখাদ্যের ত' কথাই নাই—তাহাতে মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসে। যে লোক বেশী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ—আচার-বিচার-সম্পন্ন, তাহার আয়ু বেশীদিন স্থায়ী হয় সহজে মৃত্যুর কিঙ্কর হইয়া পড়ে না, অকাল-মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে ভয় পায়।

রামেশ্বর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃনাম মহামন্ত্র জপিতে, জপিতে তিনি একক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রত্যহ সুরশৈবলিনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া আসিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা একদিনের জন্যও তিনি এ কার্য্যে অবহেলা করিতেন না—ইহাতে শাস্ত্র হিসাবে ধর্ম্ম ত' হইতই এবং শরীরও বেশ নির্ব্যাধি কান্তিপুষ্ট হইত। মন নির্ম্মল—প্রাণ স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতে এমন ঔষধ আর নাই।

বাড়ীর মধ্যেও এই ভাব। নির্ম্মলা নবীন-যৌবন-তেজে পূর্ণ বিকশিত হইলেও, বিলাসিতার আড়ম্বর তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। একখানি লালপাড় শাটীই তাঁহার অভাব পূর্ণ করিত—সীমন্তে সেই সধবার পবিত্র চিহ্ন—উজ্জলরূপে রঞ্জিত সিন্দূর, মণিবন্ধে শাঁখা এবং সময়ে সময়ে দুই গাছি সুবর্ণবলয় তাঁহার শোভাবর্দ্ধন করিত—গলায় অন্য মালার পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষ; ইহাতে তাঁহার যেরূপ শোভা হইত, লক্ষ টাকার স্বর্ণাভরণ পরিলেও তাহার শতাংশের একাংশও হইত কিনা সন্দেহ! যখন গৃহ-কর্ম্ম-শেষে শিবপূজার জন্য তিনি বিল্ববৃক্ষমূলে দাড়াইয়া পত্র চয়ন করিতেন, তখন দেখিলে বাস্তবিক ভগবতীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হইত। ছাত্রগণ, উদ্দেশে অন্য দেবীর চরণে প্রণিপাত না করিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী গুর্ব্বিণীর পদে প্রণাম করিয়া ধন্য হইত। রূপহীনাকে রূপবতী করিবার জন্যই অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা; কিন্তু যাহার ঈশ্বর-দত্ত রূপ আছে; ধর্ম্মে যাহার রূপের স্ফুরণ হয়—এ কৃত্রিমতায় তাহার হ্রাস বই বৃদ্ধি হইবে না।

দ্বিজ মাত্রেই শাক্ত। উপনয়নের সময় হইতেই তাহারা সাবিত্রী-দীক্ষায় দীক্ষিত, অতএব তাহারাই শক্তির প্রধান উপাসক। বহুপূর্ব্বে রামেশ্বর তান্ত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন; বিবাহের পর কালাশৌচান্তে নির্ম্মলাও দীক্ষিতা হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বৃদ্ধ গুরুদেব দেহ-রক্ষা করায় আর কোন প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত না হইলেও, পরমগুরু শিবস্বরূপ স্বামী-দেবতার নিকট প্রত্যহ উপদিষ্টা হইয়া নির্ম্মলার প্রাণ ধর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। ইহার বাড়া আর কি আছে—স্বামীর নিকট যে উপদেশ লাভ করিতে পারে, তাহার তুল্য সৌভাগ্য আর কাহার?

রামেশ্বর কিন্তু গুরুদেবের স্বর্গারোহণে বিষম দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, পারত্রিক উন্নতি আর তাঁহার হইতেছে না। যদিও তিনি শাস্ত্রপাঠী

মহাজ্ঞানী, তথাপি ইহাতে যেন তাঁহার প্রাণ সন্তুষ্ট নহে। একজন করিতকর্ম্মা মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিতে না পারিলে, তিনি যেন আর প্রাণে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না. এত কর্ম্মের মধ্যেও যেন তিনি অতিশয় অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এইজন্য একদিন তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—ভাগ্যে গুরুও মিলিয়াছিল কিন্তু কৃপালাভ ত' করিতে পারেন নাই ? তবে তিনি আশা দিয়াছেন—সময়ে সমস্তই লাভ হইবে। রামেশ্বর জানেন—ভগবান সদাশিবই জগতের গুরু, সময় হইলে নিশ্চয়ই মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। এইজন্য মাতৃপদে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—বিচলিত হন নাই।

বাড়ীতে এখন স্ত্রীলোকের অভাব নাই। রামেশ্বরের সেই জ্ঞাতি স্ত্রীলোকটী, যিনি প্রথম অবস্থায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন—সেই ভুবনেশ্বরী দেবী এখনও আছেন। ইহাতে দাক্ষায়ণীর অনেকটা পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছিল—তারপর নির্ম্মলা আসিলে, তাঁহাকে আর এখন কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় না; তবে স্বেচ্ছায় যাহা করেন—তাহা স্বতন্ত্র। রামেশ্বরের প্রিয় ছাত্র বিরূপাক্ষ এখনও সম্যক্‌ভাবে গুরুগৃহে আছে—সেই এখন চতুষ্পাঠীর প্রধান ছাত্র। ছোটবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া তড়িৎ ঘোষ প্রাণপণে লাগিয়া গিয়াছে, তার এখন আর অর্থের আকাঙ্ক্ষা তত নাই—যত পরমার্থের। এই জন্য সে সময় পাইলেই ছোটবাবুকে ধরিয়া বসিত—প্রাণারাম ধর্ম্মোপদেশ লইয়া আনন্দে ভোরপুর হইত—এইটুকুই এখন সে মহালাভ বলিয়া মনে করে।

অতিথিশালাই এখন রামেশ্বরের প্রাণস্বরূপ। অনেক সাধু-সান্ন্যাসী এখানে আসে; অনেক মৌনী, জ্ঞানী, সিদ্ধাশ্রমী এখন দেবানন্দের অতিথিশালা পবিত্র করেন। রামেশ্বর কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী—এই সকল সংসার-ত্যাগী মহাত্মাগণের তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও

তাঁহাদের পবিত্র পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হন—বংশের পবিত্রতা বৃদ্ধি করেন।

আজ এক বৎসর হইল—তাঁহাদের অতিথিশালায় একজন পাগল আসিয়াছেন, তাঁহার সাধন-ভজন কিছুই নাই—কেবল যা পান তাই আহার করেন; আচার-বিচার তত করেন না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথাও কন না, আহারাদির পর অপরাহ্নে কোথায় চলিয়া যান। আবার পরদিন ঠিক ভোজনের সময় আসেন—রাত্রে তিনি এখানে থাকেন না। তিনি সাধক কি অন্তরূপ পাগল—তাহা সাধারণ লোকের চেনা দায়; তবে রামেশ্বর তাঁহাকেও সাধ্য-সাধনা করেন—তিনি একজন খুব উচ্চ শ্রেণীর সাধক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস—ঠিক এই রকমটীই যেন তিনি সেই হরিদ্বারের গিরিগুহায় অবধূতকে দেখিয়াছিলেন। তবে তাঁহার আচার ব্যবহার এত কদর্য্য নহে, পোষাক-পরিচ্ছদও এমন পাগলের মত ছিল না। যাহা হউক যখন আসিয়াছেন, গৃহ পবিত্র করিয়াছেন—তখন ইনি যিনিই হউক—যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করুন। এ সকল মহাত্মার পদরেণু স্বর্গরেণু অপেক্ষাও পবিত্র! রামেশ্বর প্রত্যহ এই পবিত্র ধূলি লইয়া দেহ-মন পবিত্র করিতেছেন কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য হইল না—তিনি নরকেই মজিয়া রহিলেন।

— — ——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভক্তের ভাব।

এখন রামেশ্বরকে সংসারের জন্য তত খাটিতে হয় না—অর্থাগমের জন্যও নহে। নির্ম্মলা, দাক্ষায়ণী ও আত্মীয়া স্ত্রীলোকটী ঘরের কাজকর্ম্ম দেখেন—আর বাহিরের কাজ তড়িৎ ঘোষ ও টোলের প্রধান ছাত্র বিরূপাক্ষ দেখিয়া থাকেন। রামেশ্বর পূজা-আহ্নিকের পর অবসর পাইলে অতিথিশালায় আসিয়া সাধু-সন্ন্যাসীগণের সহিত ধর্ম্মালাপে সময় অতি-বাহিত করেন।

কাজের একটু আসান হইয়াছে—বাহিরের পরিশ্রমের একটু লাঘব হইয়াছে, তজ্জন্য রামেশ্বর প্রাণপণে ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, শুধু পূজা-আহ্নিকে আর তাঁহার মন সন্তুষ্ট হয় না; ইহা অপেক্ষা যেন তিনি আরও কিছু উচ্চাধিকার লাভ করিতে চান। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া, যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া মন-প্রাণকে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না বলিয়া তিনি প্রত্যহ নিভৃতে মায়ের নিকট আত্ম-নিবেদন করেন—আপনার মনের প্রবল ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ীর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত করেন। হায়! এই সময় যদি গুরুদেব জীবিত থাকিতেন —তাহা হইলে তাঁহার নিকট কত উচ্চতম উপদেশ লাভ করিয়া প্রাণ শীতল করিতে পারিতাম—তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া কত প্রকারে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া এতদিন জীবনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতাম; কিন্তু কই তিনি—এ মর্ত্ত্যধামে যে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই। তবে কি

আমার আশা মিটিবে না? মানব-আত্মা ত' অমর, আমার গুরুদেব ত' সাক্ষাৎ শিবরূপী—তিনি ত' মানব নহেন যে, ধরা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—আর তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই! কই তবে আমার হৃদয়-দেবতা কই! হরিদ্বারের গিরিগুহায় যিনি সেদিন আমাকে বড় আশা দিয়াছিলেন; তবে তিনিই কি দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া অবধূত-বেশে আমার মনোবাসনা সিদ্ধ করিবেন? তিনিও ত' আশা দিয়াছিলেন তাই; তবে এখনও আসিতেছেন না কেন? শাস্ত্র বলেন—ধর্ম্ম-পথে উন্নতির জন্ম উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিলেই, প্রাণ-ফাটা ধর্ম্ম-পিপাসা প্রাণে উদয় হইলেই গুরু আপনি আসিয়া উপস্থিত হন, গুরু মানব নহেন দেবতা, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই; গুরুরূপে জগৎগুরু সদাশিব যে জন্ম মৃত্যুর অতীত, করাল কাল যে তাঁহার দাসানুদাস, তবে তাঁহার মৃত্যু কোথায়! যদি তিনি সকল সময়ে সকলের জন্ম সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন, প্রাণে ধর্ম্মের উৎকট পিপাসা জাগিলেই যদি তিনি জ্ঞানামৃত পানে সে পিপাসার শান্তি করেন, অজ্ঞান তিমিরে দিশেহারা জীবের দৃষ্টিহীন চক্ষুকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন করিয়া দেন, তবে আমার প্রতি বাম কেন প্রভু! এস প্রভু, এস হৃদয়েশ! জীবন যে কেবল শেষের দিকে অবিরত চলিয়া যাইতেছে; আর কবে কি হইবে প্রভু? তুমিই ত' আশ্বাস প্রদান করিয়া আমাকে সংসারী করিয়াছ; তোমার কথায় আমিও এখন পূর্ণ সংসারী, নির্ম্মলার মত অতুলনীয়া শক্তির সাহায্য কেবল তোমারই কৃপায় পাইয়াছি, সেও এখন সন্তানসম্ভবা, এইবার আমাকে পথ দেখাও প্রভু। নতুবা প্রাণ যে আর স্থির হয় না, হৃদয় যে ক্রমশঃ বড়ই অস্থির হইতেছে, তোমার চরণামৃত পানের জন্ম মন যে সদাই উৎকণ্ঠিত, কোনও কাজ যে আর ভাল লাগে না দয়াময়! দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছ কিন্তু সে কোন্ দেশ, পতিতকে উদ্ধার করিতে কি এদেশে

আসিবে না? অথবা তোমার অবস্থান কোথায় হইয়াছে—জানাইয়া এ অধম শিষ্যকে কৃতার্থ করিবে? অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের বেদনা ত' জানিতেছ প্রভু! তবে আর বিলম্ব কেন?

সংসার-চিন্তা হইতে একটু অবসর পাইলেই ধার্ম্মিকের মন একেবারে ভগবৎ চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়ে; রামেশ্বরের সেই অস্থিরতা এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আহারে বিহারে, শাস্ত্র-বিচারে আর যেন তিনি কিছুমাত্র সুখ পাইতেছেন না। তাঁহার মন-মধুকর যে সুখ পাইবার জন্ম অস্থির, এ সকলে যেন তাঁহার বিন্দুমাত্র সুখ দিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রাহ্মণমাত্রেই শাক্ত, রামেশ্বর গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহাদের বংশ-পরম্পরাগত শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছেন। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার শাক্তাভিষেকও হইয়াছিল কিন্তু সেই অবধি শেষ; গুরু ব্যতীত আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও অগ্রসর হইবার জন্ম আর কেহ তাঁহাকে সহজ সাধ্য কোন উপায় বলিয়া দেয় নাই।

এতদিন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া, সংসার ও অতিথিশালার ভার লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলেন—এ সকল অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অবধূত স্পষ্টা-ক্ষরে তাহা বলিয়া দিয়াছেন—এক্ষণে সে সকল বেশ নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খ-লায় চলিতেছে, ইহার জন্ম আর তাঁহাকে বেশী খাটিতে হয় না। এইজন্ম প্রাণ এখন নিজের জন্ম খাটিতে চায় কিন্তু খাটায় কে, সে প্রভু কোথায়! শক্তি-সাধনা বড় কঠিন, বুঝিতে না পারিলে পদে পদে পদস্খলন হইয়া থাকে। রামেশ্বর শাক্তগণের অমূল্য গ্রন্থ আগম-শাস্ত্র সকল ক্রমাগত পাঠ করিতেছেন, নানাবিধ তন্ত্রের মন্ত্র, বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি আয়ত্ত করিতেছেন কিন্তু তৃপ্তি হইতেছে না, একজন সাধনপটু কর্ম্মী সে সকল ভাল করিয়া না বুঝাইয়া দিলে, কেবল বিদ্যাবলে তাহাতে রস পাওয়া যায় না।

রামেশ্বর আর্য্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য লইয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তন্ত্রের মর্ম্ম বেশ ভাল বুঝিতে পারা যায় না. যেন সমস্ত গুলাইয়া যায়, নানাপ্রকার সন্দেহ আসিয়া মনকে আন্দোলিত করিতে থাকে। ভগবান সদাশিবের এমন বিস্তৃত আগমশাস্ত্র কলির জীবের এত বড় প্রত্যক্ষ সাধন-পথ, নানাপ্রকার সন্দেহ লইয়া দিন গোঁয়াইলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিব কবে, নানাপ্রকার বিভীষিকা যে পথের মাঝখানে প্রাণ বিনষ্ট করিবে? এইজন্য "গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্" প্রভু এস; আশার ধন, আশা দিয়া নিরাশ ক'রোনা; প্রাণ অস্থির, মন চঞ্চল—আর বধির হ'য়ে থেকোনা এস, ভবার্ণবের নাবিক ইহপরকালের কর্ত্তা এস, সন্দেহ-সাগরে উদ্ধার করিয়া হৃদয় নববলে বলীয়ান কর। রামেশ্বর অহরহঃ গুরুর চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন, সেই আরাধ্য অবধূত-প্রধানকে পাইবার জন্য কায়মনে আরাধনা করেন।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সর্ব্বেশ্বর যখন তাঁহার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন- তখন কয়েকমাস রামেশ্বরের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। মার পেটের বড় ভাই—গুরুর তুল্য, হায়! আমাকে কি দোষে তিনি পরিত্যাগ করিলেন—আমি ত' একদিনের জন্যও তাঁহার অবাধ্য হই নাই—মাথা তুলিয়া একটী উঁচু কথাও কই নাই, তবে দাদা কেন চলিয়া গেলেন, কেন বাস্তু বিক্রয় করিয়া অপযশ কিনিলেন—যদি নির্ম্মলার গহনা না থাকিত, তাহা হইলে এই পবিত্র বাস্তুও ত' পরের হইত? এই সব ভাবিয়া রামেশ্বর দিনকতক বড়ই উতলা হইয়াছিলেন। তারপর তড়িৎ ঘোষ, পাড়ার লোক, পিসীমা ও নির্ম্মলার সান্ত্বনাবাক্যে এখন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন, তবে ঐ বাস্তুর যাবতীয় আয়ের এক কপর্দ্দকও তিনি লইতেন না, ভবানীকে পাঠাইয়া দিতেন, ইহাতে লোক জানাজানি হইল, সর্ব্বেশ্বর ভ্রাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এত টাকা হাতে

রাখিয়া তাঁহাকে সাহায্য না করায়—হাড়ে চটিয়া গেলেন। ভিতরে ভিতরে ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে লাগিলেন। যাঁহার মন্ত্রণাদাত্রী কূটবুদ্ধিশালিনী প্রমোদা, আর সাহায্যকর্ত্তা মূর্খ দাগাবাজ মহিমচন্দ্র, তাহার দ্বারা হইতে পারে না, জগতে এমন কি কাজ আছে?

ভবানী এখন নাবালক, নিজের পড়া-শুনায় ব্যস্ত—এদিকে দেখিবার তাহার সময় নাই, আর এ সকল কথা তাহাকে শুনাইবেই বা কে? মন্ত্রণা যে অতি গোপনীয়, তিনটী প্রাণী ভিন্ন চারিটীর জানিবার অধিকার নাই। ভবানী কাকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, খুড়ীমাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করে—সে শুনিলে অনর্থ ঘটাইবে, কাজেই অতি গোপনে এই সকল ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

পাঠ্যাবস্থায় অন্যদিকে মাথা ঘামান উচিত নয়, বিশেষতঃ ভাল ছেলে যাহারা, তাহারা লেখা-পড়ার চিন্তাতেই বিভোর থাকে—অন্য চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দেয় না, সাধনার অবস্থায় এইরূপ অনন্যচিত্ত না হইলে সিদ্ধি কোথায়? লেখাপড়ায় উন্নতি করা যে একটা মস্ত সাধনা, ভবানী আজ এই সাধনায় বিভোর, এবার এফ এ পাশে তাহাকে বৃত্তিলাভ করিতেই হইবে, এইজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, সাধিলেই যে সাধকের সিদ্ধি করতলগত হইবে—তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

হেমলতা এখন বড় হইয়াছে—ঘরণী গিন্নী হইয়াছে, সে বেশ স্বামীসুখে সুখিনী হইয়াছে, কাজেই বাপের বাড়ী আর বড় একটা আসে না—তাহাদের সংসারে লোকাভাব—আসিলেও চলে না।

রামেশ্বর প্রথম প্রথম দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া দাদার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, পরে পত্রাদিও ব্যবহার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে দাদার তুষ্টিসাধন করিতে না পারিয়া বরং বিরক্তির উপাদান করেন—কাজেই তিনি আর কোন প্রকার সংবাদ গ্রহণ করেন না, আর তড়িৎ

কোন প্রকার পত্রের আদান-প্রদান করিতে নিষেধও করিয়া দিয়াছে। মন তাঁহার ভাল নয়—পারিষদ্‌বর্গও খারাপ, হিংসার বশে কিছু করিতেও পারেন—অতএব আপনি আর কোন প্রকার লেখাপড়ার ভিতর যাইবেন না। রামেশ্বর জানিতেন "শতং বদ মা লিখ" কি জানি যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে তাহা হইলে হাতের লেখার দ্বারা বিপদে ফেলিতে পারে। কিন্তু রামেশ্বর জীবনে কাহারও এমন কোন কার্য্য করেন নাই—যাহাতে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে? তবে কলির মানুষের প্রবৃত্তি ত' সকলের সমান নয়—এইজন্য পণ্ডিতের কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে।

এখন আর রামেশ্বর বাজে কাজে সময় নষ্ট করেন না; যাহা হইবে—মা যাহা করিবেন—তাহার গতিরোধ করে কে? এখন তিনি সম্যক প্রকারে ইষ্টদেবীর পদে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন—যাহাতে সাধনপথে সমধিক উন্নতি করিতে পারেন—তাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। গুরুদেবের জন্য তিনি এখানে—সেখানে করিয়া বেড়াইতেছেন—অন্য কাজে মন দিতে তিনি আর রাজী নহেন। বয়স ত' হইতেছে—আর কতদিন এমন মায়ার ঘোরে অচেতন হইয়া কাল কাটাইবেন?

তাঁহার গৃহে ভবানী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন। প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইলে এই মাতৃপদে রামেশ্বর আপনার প্রাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—কাঁদিয়া কাটিয়া দেবীকে অভীষ্ট ফলদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন—তাহাতে তাঁহার প্রাণের অশান্তি নিবিয়া গিয়া শান্তির আলোক-চ্ছায়া পতিত হইতে থাকে, রামেশ্বর কতক্ষণ যে এইভাবে তন্ময় হইয়া থাকেন—তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রাণে যার এত ভাব আছে, সাধনমার্গে সমুত্তীর্ণ হইবার তার ভাবনা কি, অভীষ্ট ফললাভে তাহার অন্তরায় কোথায়?

ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের সুবিমল জ্যোতির

বিকাশ পায়। রামেশ্বরের দেহ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট, তারপর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া—কর্ম্মযোগে তিনি এতদূর মনোনিবেশ করিয়াছেন—ধর্ম্মকর্ম্মে এতদূর পরিশ্রম করিতেছেন যে, গৃহী হইলেও এখন তাঁহাকে যোগী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না; সে সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় চেহারা দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। নির্ম্মলা প্রাণপণে পতির ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্য করিয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণীর পরিচয় দিতেছেন। তিনিও স্বামীর পদে মতি রাখিয়া ধর্ম্মজীবনের খুব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। নির্ম্মলার শক্তি যে রামেশ্বরের শক্তি উদ্বোধনে নিয়ত চেষ্টিতা, তাহা তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্বামী যদি সমস্ত দিন ভাবমগ্ন থাকেন—দেবদেবীর পূজায় আত্মহারা হন—আহারাদি না করেন—নির্ম্মলাও পোষ্যবর্গকে যথাসময়ে পানভোজন করাইয়া, অতি সন্তর্পণে পূজাগৃহে পতির পাশে বসিয়া ভগবতীর আরাধনা করেন। ব্রহ্মচারিণী দাক্ষায়ণীর ত' কথাই নাই—এ কার্য্যে তিনি ত' চিরদিনই অভ্যস্তা. সংযম সহকারে পূজাজপে বিব্রত থাকিতে পারিলেই তিনি সাতিশয় আনন্দলাভ করেন। নির্ম্মলা আসিয়া অবধি তাঁহার এ কার্য্যে ত' আর সময়ের অভাব হয় না। এই জন্যই তিনি রামেশ্বরকে বিবাহ করিবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন—আর সেইজন্যই ত' আজ তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে মজিলা থাকিবার এত সুসময় আসিয়াছে।

পুত্র রামেশ্বরের ধার্ম্মিকতায় দেবীপুরে দেবানন্দের নাম আবার সমুজ্জ্বল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পিতার সৎকীর্ত্তিসকল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বলতর করিয়া রামেশ্বর চারিদিকে সুখ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল—বড় ছেলে না পারুক, ছোট যাহা করিতেছে-তাহা পিতারই মত—অনেকাংশে তাঁহার চেয়েও বেশী; এমন না হ'লে কি ছেলে; অনেক সাধনা না ক'রে কি অমন

ছেলে পাওয়া যায় ? দেবানন্দ ও উমাকালীর আমলে যাহা হয় নাই—রামেশ্বর ও নির্ম্মলার সময়ে তাহা হইতেছে, ভাল কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে যে ভগবান্ সহায় হন। রামেশ্বরের মন ভাল—তাই অমন স্ত্রী লাভ হ'য়েছে—আর তার গুণেই ভট্টাচার্য্য বংশের অত উন্নতি হ'চ্ছে !' প্রমোদা ও সর্ব্বেশ্বর এদিকে মনই দিলে না, তাই দেশছাড়া হ'তে হ'লো ; এখন ভগবান্ এদের দুটীকে বাঁচিয়ে রেখে বংশের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

— —

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিষে-বিষাদ।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্!" যিনি শরীরস্থ বীর্য্যকে অবিকৃত অবিচলিত অবস্থায় রক্ষা করিতে পারেন—তিনিই ব্রহ্মচারী; ইহাই ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রমের কার্য্য। বীর্য্যই ব্রহ্ম—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ইহা সম্যক্‌রূপে ধারণ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপদবাচ্য। এইজন্য ব্রাহ্মণের শরীর সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্যোতিঃ-সম্পন্ন—ইঁহারাই সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ"—শাস্ত্র এইজন্যই ব্রাহ্মণের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। এই ব্রহ্মকে ধরিতে না পারিলে জীব ব্রহ্মময়ীর দরবারে উপস্থিত হইতে পারে না। বিন্দু বিপর্য্যয়ে যাহার শরীর নষ্ট হইল—তাহার যোগসাধনের ক্ষমতা রহিল কোথায়?

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে পাকা হইয়া সাধক, গুরুর আদেশে বিবাহ করিয়া সংসারী হন, কেহবা চির-কৌমার-ব্রত অবলম্বন করেন কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুরাগী যাঁহারা—এখন হইতে মনোরমা পত্নী গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় আশ্রম সংসারে প্রবেশ করিলে—তাঁহাদের দ্বারা সংসার পবিত্র হয়। আজ রামেশ্বর এই নিয়মে সংসার পাতিয়া দেবীপুর পবিত্র করিয়াছেন।

সংযম শিক্ষাই এই আশ্রমের মূল—ব্রহ্মচর্য্যে তাহা শিক্ষা হইয়াছে, চিত্তের বৃত্তি অনেক পরিমাণে নিরোধ হইয়াছে; অতএব অযথা বীর্য্যক্ষয়ে শরীর নষ্ট হইবার আর সম্ভাবনা নাই, তবে বিবাহ করিলে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সংসারের সার পুত্ররত্ন লাভ করিয়া বংশরক্ষা করা উচিত, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সংযমের দ্বারা পুত্রোৎপাদন

করিলে স্ত্রী-পুরুষ কাহারও শরীর নষ্ট হয় না—অথচ ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়।

এইরূপ সংযমী গৃহীর পুত্র-কন্যা সুস্থ, সবল এবং নিরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করে; অকালমৃত্যু তাহাদের হয় না। এখনকার মত এত ছেলেমেয়ের বাপ-মা হওয়া তখনকার নিয়ম ছিল না। তখনকার ঋষিদের একটী কিম্বা দুইটীর বেশী কাহারও পুত্র-কন্যা হইত না; হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিধিনিষেধ মানিয়া—সংযমের সহিত পুত্রোৎপাদন করিলে—এই রকমই হইয়া থাকে। অপরিপক্ক-অসংযমীর শুক্রশোণিতে উৎপাদিত পুত্রকন্যার অকালমৃত্যুতে পিতামাতাকে অনবরতই শোকে মুহ্যমান থাকিতে হয়। পরিপক্ক বীর্য্য, সংযমীর পুত্রকন্যার প্রতি অকালে কালের দৃষ্টিপাত হয় না। আজকাল যে চারিদিকে অকালমৃত্যুর এত হাহাকার, ব্রহ্মচর্য্যে মতিহীন হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

নির্ম্মলাও রামেশ্বরের ন্যায় সংযমপরায়ণা ব্রহ্মচর্য্যশালিনী; তাহার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে—তাহা সুপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং পিতামাতার পরমানন্দদায়ক হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি? নির্ম্মলা গর্ভবতী ছিলেন—শুভদিনে শুভক্ষণে দশমাস দশদিনে একটি সুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। বাটীশুদ্ধ সকলের আনন্দ; দাক্ষায়ণীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া নবজাত শিশু ও প্রসূতির তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। পাড়ার লোক শুনিয়া সকলেই আনন্দোৎফুল্ল; আর যাঁহারা দেবতার এ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, ভগবৎকৃপাবলে আজ হইতে যাঁহারা পৃথিবীর এই দুর্লভ বস্তু লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের আনন্দের কথা লিখিয়া জানান যায় না। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা দেবদূত-সদৃশ কুমারের মুখাবলোকন করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিলেন। শিরোমণি ঠাকুর আসিয়া জাতকর্ম্ম সমাধা করিলেন

জ্যোতিষে তাঁহার বেশ দখল ছিল—পুত্রের লগ্নফল গণনা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—রামেশ্বর! পুত্রটী তোমার দীর্ঘজীবী হইবে এবং বংশের মানরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। পুত্রের ভবিষ্যজ্জীবনের মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিলে—পিতামাতার প্রাণ সদাই উৎফুল্ল হয়, রামেশ্বর আনন্দগদ্গদচিত্তে পুরোহিত ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

কোন প্রকার পার্থিব আনন্দে রামেশ্বর একেবারে আত্মহারা এবং বিষাদে বিচলিত হন না, সকলই মায়ের আশীর্ব্বাদ—যখন যাহা আসে, তাহাই তিনি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। পুত্র জন্মাইবার পর তাঁহার গুরুদেবকে মনে পড়িল—তিনি ত' বলিয়াছিলেন—বিবাহ করিয়া পুত্রাদি লাভে বংশের উন্নতি কর, তারপর যোগাভ্যাস। এই ত' পুত্রলাভ হইয়াছে, এইবার অন্তর্যামী তিনি দয়া করিয়া দেখা দিবেন কি? সাংসারিক এই আনন্দে একেবারে প্রমত্ত না হইয়া অহরহঃ তাঁহার আত্মোন্নতির চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। ইহাকেই বলে—নির্লিপ্তভাবে সংসার করা—সংসারের কোন কার্য্যই বাদ দেন না, প্রাণপণে সকল কার্য্যই করেন কিন্তু সংসার-ভাব তাহাতে প্রবেশ করিয়া একেবারে চৈতন্যশূন্য করিতে পারে না। মায়ের সংসার—রামেশ্বর তাঁহার হুকুমের চাকর, যেমন চালাইতেছেন—তেমনি চলিতেছেন, যেমন করাইতেছেন—তেমনি করিতেছেন; কর্ত্রীর কর্তৃত্বই বর্ত্তমান, তাঁহার কর্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই।

ভৃত্য যদি প্রভুর কোনও ভাল কাজে কোনরূপ সুসার করিতে পারে, তাহা হইলে প্রাণে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হয়। শিরোমণি ঠাকুর বলিয়াছেন—পুত্রটী খুব ভাল হইয়াছে, উত্তরকালে ইহার দ্বারা সংসারের খুব ভাল হইবে, গ্রহগণের এইরূপই যোগাযোগ, শুনিয়া রামেশ্বরের আনন্দের আর অবধি নাই। সেদিন সমস্ত রাত্রি ইষ্টদেবীর নিকট আবেদন-নিবেদনেই কাটিল—ইষ্টমূর্ত্তির পূজা আরতি করিয়া ধ্যান ধারণাতেই নিশি শেষ

হইল। মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলার পদে নবজাত পুত্রের নিয়তি পরিণতি সমস্ত অর্পণ করিয়া মাতৃময় হইলেন। হাতে পয়সার অভাব; প্রাতঃকালে যে "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" চির-প্রথানুসারে ইহার জন্য যে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে হইবে—সে চিন্তাই নাই। চিন্তাময়ীর চরণচিন্তায় যার মন নিয়ত বিব্রত, এই সামান্য অসার চিন্তায় সে মাথা ঘামাইবে কেন? যার ভাবনা সেই ভাবিবে, আনন্দময় কর্ম্মযোগী রামেশ্বর মহামায়ার ভাবসাগরে ডুবিয়া প্রাণের আবেগে গাহিলেন:—

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ওগো কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবি মা তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দিস্ মা তোর ঐ অভয় পদ, রাখি হৃদি-পদ্মাসনে॥

সংসারে কর্ম্মযোগেই যাহার এত ভাবের অভিব্যক্তি, জ্ঞানে না জানি তিনি কোথায় তলাইয়া যাইবেন; তারপর ভক্তির প্রবল উৎসে যখন তিনি এই ভাব-সাগরে সাঁতার দিবেন, তখন বোধ হয় আর তাঁহাকে খুজিয়াই পাওয়া যাইবে না। ধন্য রামেশ্বর তোমার কর্ম্মের আসক্তি!

অতি প্রত্যূষে রামেশ্বর গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র অতিথিশালার দাবায় আসিয়া বসিয়াছেন। কয়েকজন সন্ন্যাসী তাঁহার মনোভীষ্ট লাভ হইয়াছে বলিয়া কত মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। রামেশ্বর তাঁহাদের পদধূলি লইয়া মস্তকে দিতেছেন। এমন সময় সেই পাগলা সন্ন্যাসীটা আসিয়া উপস্থিত হইল, তার ঝুলি-কাঁথা, জুতার-মালা, সামুকের বালা, একধারে ফেলিয়া কেবল পেট চাপড়াইতে লাগিল। ক্ষুধা পাইলেই সে ইঙ্গিতে এইরূপ করিয়া দেখাইত, আজ এতদিন হইল সে এইরূপ জোর করিয়াই আহারাদি করিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, মেশামেশী

করে না। খাওয়া হইলে একধারে পড়িয়া একটু বিশ্রাম করে, তারপর রৌদ্র পড়িলে আপন-মনে কোথায় চলিয়া যায়, সমস্ত রাত্রি তাহার খোঁজ খপর থাকে না। পরদিন প্রহর অতীত হইলে, সূর্য্যদেব গগন-গাত্রে সমুদিত হইলে, আবার আসিয়া উপস্থিত হয়, আহারাদি প্রার্থনা করে। আজ সে অন্যান্য দিন অপেক্ষা অতি প্রত্যূষে আসিয়া পেট চাপড়াইতেছে—খাবার দিতে বলিতেছে।

আজ আহারে বেলা হইবে, কারণ নির্ম্মলা আতুঁড় ঘরে, দাক্ষায়ণী ও ভুবনেশ্বরী আর কত করিবেন? বিরূপাক্ষ পূজা করিবার জন্য পুষ্পাদি চয়ন করিতেছে। হাতে একটীও পয়সা নাই যে কিছু খাবার আনিয়া পাগলকে খাওয়াইবেন, রামেশ্বর বলিলেন—বাবা! বড্ড খিদে পেয়েচে নয়, আচ্ছা আমি দেখছি—তড়িৎ এসেছে কি না? সে পূর্ব্বদিন টাকা আদায়ের চেষ্টায় গিয়াছিল—অনেক দূর বলিয়া রাত্রিতে বাড়ী আসিতে পারে নাই।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহন করেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের রক্ষা কর্ত্তা। রামেশ্বর উঠিয়া বাটীর ভিতর যাইবেন—এমন সময় পার্ব্বতীপুরের জনৈক শিষ্য আসিয়া গুরুর পদে দশ টাকা প্রণামী দিয়া পদধূলি লইল। গত মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহার পুত্রের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কার্য্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হওয়ায় গুরুদেবকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য অতিশয় কুণ্ঠিত এবং তটস্থ হইয়া প্রণামী প্রদান করিয়া তাহার এই অনিচ্ছা-কৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে বলিল।

রামেশ্বর বলিলেন—বাবা। বিবাহাদি কার্য্য সময়-সাপেক্ষ, ঠিক সময় হইলে আর অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আশীর্ব্বাদ করি—নবদম্পতি অফুরন্ত সংসার সুখ উপভোগ করুক।

শিষ্য বলিল—ঠাকুর! প্রণামী অতি অল্প; আমাদের অবস্থা ত' জানেন?

রামেশ্বর। অল্প কি বাবা! এই আমার লক্ষ টাকা, তুমি তজ্জন্য কিছু মনে করিও না।

শিষ্য কার্য্যান্তরে যাইবে, আর অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় গুরুদেবের পদধূলি মস্তকে প্রদান করত প্রস্থান করিল।

রামেশ্বরের চিত্ত কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে না। তিনি জানিতেন "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ" এইজন্য তিনি কখনও শিষ্য-যজমানের বাটী প্রার্থনা করিতে যাইতেন না, যাহার যাহা ইচ্ছা হইত, যে যাহা সন্তুষ্ট-চিত্তে দিতে পারিত রামেশ্বর তাহাই মাথায় তুলিয়া লইতেন। এমন প্রশান্ত চিত্ত, শিষ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরু অধুনা নিতান্তই বিরল। যথেষ্ট প্রণামী না পাইলে এখনকার গুরুর মন উঠে না, শিষ্যের প্রতি সরলচিত্তে আশীর্ব্বাদ করেন না। গুরু রামেশ্বরকে দিলেও যেমনি সন্তুষ্ট, না দিলেও তেমনি বা ততোধিক। অপারক শিষ্যের মঙ্গলের জন্য বরং তিনি ব্যথিত হৃদয়ে মায়ের নিকট কায়মনে মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন, আর এইজন্যই তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কাহারও কখন অমঙ্গল হইত না। গুরুদেবের প্রসন্নতা যে শিষ্যের সকল উন্নতির মূল!

ধর্ম্ম থাকিলে অর্থের অভাব হয় না। দেবতার প্রতি অচল অটল বিশ্বাস থাকিলে যে কোন প্রকারে হউক, তাহার সাংসারিক অভাব-অভিযোগ সংপূরণ হইয়াই থাকে, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। অভাব যখন হইয়াছে - তখন পূরণ হইবেই—মা যার অনুকূল, অবস্থা কি তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে?

রামেশ্বর টাকা কয়টী পাইয়া মিষ্টান্ন আনয়নের জন্য একজন ছাত্রকে ডাকিলেন। তখন এখনকার মত দ্রব্য-সামগ্রী এত মহার্ঘ ছিল না।

দশ টাকায় তখন ভাল মিষ্টান্ন বিশসের সহজেই পাওয়া যাইত। রামেশ্বর একজন ছাত্রকে মিষ্টান্ন কিনিতে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন, ভৃত্য গোবর্দ্ধন সঙ্গে গেল।

রামেশ্বর সঞ্চয়ের জন্য কিছু বেশী রাখিতেন না, অথচ তিনি অপরিমিত ব্যয়ীও ছিলেন না, নির্ম্মল-চরিত্রে অপরিমিত ব্যয় হইবে কেন? তবে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য পিতার মত অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যয় করিতেন, তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন—ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিলে ভগবান্ তাহার সহায় হন; আর হইতও তাই, কাহার কাছে ভিক্ষা করিতেন না, বেশী কোথাও যাওয়া-আসা করিতেন না, অথচ কাজের সময় খরচের ঠিক সঙ্কুলন হইয়া যাইত।

হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে আজ তাঁহার শুভাশৌচ, কাজেই বিরূপাক্ষ পূজা করিবেন—ভোগ দিবেন। তিনি মন্দির-দ্বারে বসিয়া দেবদেবীর চরণে মনে মনে হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন বলিয়া গৃহে যাইতেছেন, এমন সময় তড়িৎ ঘোষ আসিয়া প্রণাম করিল। বহুদিনের একটা প্রাপ্য টাকা আনিবার জন্য কলিকাতার একজন ডেপুটী যজমান তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাই তড়িৎ গিয়াছিল, সে আসিয়া পঁচিশ টাকা প্রদান করিল। রামেশ্বর তড়িৎকে নবজাত পুত্রের শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া উৎফুল্ল-হৃদয়ে দেবগৃহে গমন করিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, মিষ্টান্ন আসিলে পাগলা বাবাকে, সন্ন্যাসীগণকে এবং ছাত্রগণকে পরিতোষরূপে প্রদান করিয়া তবে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিও, তার পর পিসীমা যাহা হয় করিবেন। তখন আর অন্য কথা বলা হইল না, তড়িৎ "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপনার কক্ষে কাপড় চোপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

বৈকালে আহারাদির পর যখন রামেশ্বর বাহির্বাটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, তড়িৎ আহারাদি করিয়া কাছে আসিয়া বসিল এবং দুই

একটী অবান্তর কথার পর বলিল—ছোটবাবু! এখন যে মহা বিপদ, উপস্থিত, আপনি শত্রু মিত্র সকলকে সমান ভাবেন কিন্তু এ সময় কি তাই, এ যে ঘোর কলি।

বিপদ উপস্থিত শুনিয়া রামেশ্বরের কোন উদ্বেগ উপস্থিত হইল না, চিত্তে কোন প্রকার দুর্ভাবনার ছায়াপাত হইল না; তিনি অম্লানবদনে ঠিক আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন—বিপদ আবার কি গো তড়িৎ!

তড়িৎ। বড়বাবু যত না হউক, মহিম ও বড়বৌ চিরকাল আপনার পাছু লাগিয়া আছে জানেন ত'? কিসে আপনাকে বিপদে ফেল্‌বে, কিসে আপনাকে অপদস্থ করিবে, তাহাদের এই ইচ্ছা।

রামেশ্বর। হাঁ, তাত' জানি, তবে আমি কাহারও মন্দ না ক'র্‌লে আমার মন্দ কেউ ক'র্ত্তে পারে না—ইহাই আমার বিশ্বাস!

তড়িৎ। সে আর একালে নয়; এখন যত সরল হইবেন—অপরে তত গরলের মধ্যে ফেলিয়া আপনাকে কষ্ট দিবে। কাল যে বিষম ছোটবাবু! আপনি বোঝেন না। নেহাৎ চুপ ক'রে থাক্‌লে ত' হবে না, একটু ফোঁস না ক'র্‌লে যে উপায় নাই।

রামেশ্বর। ফোঁস করি কাকে—ক'র্ত্তে গেলেই যে আপনার প্রাণে লাগে, সকলেই যে আমার আপনার।

তড়িৎ। বিশ্ববাসীকে যদি আপনার ভাবেন—ত' বিপদে আপদে জড়িয়ে পড়ুন।

রামেশ্বর। জড়িয়ে প'ড়বো কেন গো, মা যে আছেন—তিনি যে বিপত্তারিণী; বিনা-দোষে বিপদে ফেল্‌লে তিনি কি দেখবেন না?

তড়িৎও এখন একটু একটু ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে, তাই ছোটবাবুর ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অটল বিশ্বাস দেখিয়া সে সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়া যাইত, কথার কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিত না। তবে আর চুপ

করিয়া থাকিলে চলিবে না—এখন শিরে সংক্রান্তি - বিপদ যে ঘনীভূত হইয়া শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুপ করিয়া থাকিলে ত' চলিবে না?

বিষয়-বুদ্ধি তড়িতের খুব বেশী, মামলামোকদ্দমায় তড়িৎ খুব বিচক্ষণ। সে বলিল—দেখুন, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আপনি কখনও মহিমের কাছে পাঁচশত টাকা ধার লইয়াছেন কি? সুদে আসলে সেই টাকা সাতশত হ'য়েছে। মহিম আদালতে টাকার জন্ম নালিশ ক'রে একতরফা ডীক্রি ক'রেছে।

রামেশ্বর আশ্চর্য্যের সহিত একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—আমার সহিত মহিমের চিরকালই আদায় কাঁচকলায়, এ অবস্থায় আমি তাহার নিকট টাকা লইয়াছি - ইহা কি বিশ্বাস হয়—আর এ টাকা ডিক্রীই বা হইল কি ক'রে, তমসুক বা হাতচিঠিই বা কোথায়?

তড়িৎ বলিল—হাতচিঠি বা তমসুক প্রস্তুত করবার ভাবনা কি? এইজন্য আমি বার বার তাহাদের পত্র লিখিতে বারণ করিতাম। হাতের লেখা আর নাম সহি পাইলে—তমসুখ বা হাতচিঠা সহজে প্রস্তুত ক'র্ত্তে পারা যায়।

রামেশ্বর। আচ্ছা, তাহা যেন হইল—আমরা জানিলাম না শুনিলাম না, আদালত তাহা ডিক্রী দিলেন?

তড়িৎ। অমন হয়, শমন গোপন ক'রে একতরফা ডিক্রী ক'র্‌তে পারে; বিষয়-আশয় ক্রোক দিয়া—ঢোল পিটিয়া অপমান করা, যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা এরূপ ক'রে থাকে।

রামেশ্বর। তবে কি তাহারা জায়গা-জমী ক্রোক দিবে নাকি?

তড়িৎ। আমি ডেপুটী বাবুর কাছে আদালতেই গিয়াছিলাম, একজন লোক আমাকে বলিলেন—হয় আজ, না হয় কাল অতি প্রত্যূষে ঢোল সাহায্যে তারা পাড়া সরগরম ক'রে আমাদের অপমান ক'র্‌বে।

রামেশ্বর। তা বটে, তবে এখন উপায় কি? ডেপুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে—তিনি কি পরামর্শ দিলেন?

তড়িৎ। তিনি আর কি বলিবেন, বল্লেন—ঠাকুরের আদালতে উঠিয়া কাজ নেই—আপোষে মিটাইয়া লও; যদি টাকার আবশ্যক হয় আমি দিব। কিন্তু আমার মত তা নয় মহিমকে একবার জব্দ ক'রে দেওয়া উচিত! আপনি অনুমতি করুন—তার জাল করা একবার দেখিয়া লই—তাহাকে শ্রীঘর বাসের আসামী করি! অত নীচু হ'য়ে যাওয়া নির্দ্দোষী হইয়া দোষী সাজা কখনই উচিত নয়।

উদার-হৃদয়ের এমন মহত্ত্ব, সরল-হৃদয়ে পাপীকে ক্ষমা করিবার এমনি ক্ষমতা, যে রামেশ্বরের মন কিছুতেই গরম হইল না; তিনি বলিলেন—নীচু হইয়া যাওয়াই ত' ভাল তড়িৎ! গুরুদেব বলেছিলেন—মায়ের সব ছেলে কি সমান হয়। ইহার ভিতর যদি দাদা বৌদিদি জড়িত থাকেন তাহা হইলে মহিমকে শাস্তি দিতে গিয়া প্রকারান্তরে আমাকেই কি শাস্তি ভোগ ক'র্‌তে হবে না?

তড়িতের গরম মস্তিষ্ক শীতল হইল—ছোটবাবুর বিচারশক্তি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। বড়বাবু ও বড়বৌ যে ইহার ভিতর আছে—তাহার আর সন্দেহ নাই; নতুবা মহিমের কি এতদূর ক্ষমতা হইতে পারে; শেষে কি কুকুর মারিতে গিয়া ঠাকুরের অপমান করিতে হইবে। তড়িতের বিবেকবুদ্ধি এখন জাগিল—সে বুঝিতে পারিল—হিত করিতে গেলে, ভয়ানক বিপরীত ফল হইবে—মহিম হালে পানি না পাইলে, নিশ্চয়ই বড়কর্ত্তা ও বড়গিন্নীর নাম করিবে—তখন সামলান দায় হইবে; এত বড় একটা পবিত্র বংশের কুলবধূকেও আদালতে হাজির করিতে হইবে—তারপর মোকর্দ্দমার ফলাফল ত' ব'ল্‌তে পারা যায় না!

হাজার হউক সে একদিন ত' তাঁহারও নিমক্ খাইয়াছে। দূর হ'ক ছাই—ধর্ম্ম ত' জানেন—ছোটবাবু দোষী কি নির্দ্দোষী।

সমস্ত রাত্রি জল্পনা-কল্পনা করিয়া তড়িৎ তার পরদিন অতি প্রত্যূষে পুনরায় কলিকাতায় যাইয়া ডেপুটীর নিকট রামেশ্বরের অভিমত জানাইল। ডেপুটী অনাথশরণ রায় পুরুষানুক্রমে দেবানন্দেরই শিষ্য; তিনি রামেশ্বরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—গুরুদেব যে কিরূপ সাধু-প্রকৃতির লোক তাহা অনাথশরণের জানিতে বাকী ছিল না। নিশ্চয়ই কোন পাজি লোক তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দিবার জন্য, আদালতে আনিয়া অপমান করিবার জন্য এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তড়িৎকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিলেন এবং আহারাদি করিয়া আদালতে যাইতে বলিলেন; কোন উকীল-মোক্তারের দ্বারা তিনি উহা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। তড়িৎ অনাথবাবুর আদেশ মত তাহাই করিল।

এদিকে মহিমচন্দ্র প্রাতঃকালে আদালতের পরোয়াণা লইয়া দেবীপুরে আসিল এবং ঢোল সরহদ্দ করিয়া রামেশ্বরের যাবতীয় বিষয় ক্রোক দিল। হঠাৎ নিলামী ঢোলের আওয়াজ পাইয়া পাড়াশুদ্ধ লোক বাহির হইল এবং রামেশ্বরের পোষা কুকুর মহিমকে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে আসিল। পেয়াদার মুখে রামেশ্বরের দেনার দায়ে বিষয়-আশয় নিলাম হইতেছে, শুনিয়া কেহই বিশ্বাস করিল না বরং মিথ্যা অভিযোগ বুঝিতে পারিয়া মহিমকে গালাগালি ও টিট্‌কারী দিতে লাগিল। সকলেই সমস্বরে বলিল - মহিম! চিরজীবনটা কি একরকমেই কাটিল—ধর্ম্মের দিকে কি একবারও চাহিলে না, উপরে যে একজন রাতদিনের কর্ত্তা আছেন, তাহা কি একবার ভুলেও ভাব্‌লে না; অনবরত পাপ সঞ্চয় ক'রলে, যাবার সময় যে বড় কষ্ট পাবে? অপর একজন টিট্‌কারী দিয়া

বলিল—ওকি আর যাবার জন্য এসেছে, মনে ক'রেছে বুঝি বড়লোকের শালার কাছে যমও এগুবে না। বাবা! তা নয়—বড়বাড়ীর জারিজুরী সেখানে খাট্‌বে না, কত সুখে মর—তা নরলোকেই দেখ্‌বে। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সকলে আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। পাষণ্ডের সে কথায় চৈতন্য হইল না। সে অকথ্য ভাষায় রামেশ্বরকে গালি দিতে বলিল—বাবা! বড় অপমান ক'রেছ; একদিন একটা ঠাট্টা করেছিলাম বলে—তোর মাগ আমার পাতে ভাত দেয় নাই। টাকা দিতে না পারলে মাগ শুদ্ধ টেনে বার ক'র্ব্বো তবে ছাড়বো, প্রভৃতি অকথ্য কথায় আস্ফালন করিতে লাগিল। কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়াই থাকে বলিয়া রামেশ্বর অবিচলিত চিত্তে গৃহে বসিয়াছিলেন, কিন্তু পাড়ার লোক যখন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি অগত্যা বাহির হইলেন, একত্র এত লোক দেখিয়া মহিমচন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—আদালতে দেখিয়া লইব, কিন্তু পাড়া ঐক্য থাকিলে কার সাধ্য কি করে?

মধ্যাহ্নে তড়িৎ আদালতে যাইয়া ডেপুটীর নিয়োজিত মোক্তার লইয়া নিলাম রদ করিয়া দিল। মহিম মনে করিয়াছিল—এত টাকা রামেশ্বর সংগ্রহ করিতে পারিবে না, কাজেই তাঁহাকে নাস্তানাবুদ করিবে। এখন কার্য্য দেখিয়া পাষণ্ড মহিমের মুখে চুণকালী পড়িল—এত আস্ফালন কোথায় চলিয়া গেল। তবে মাঝখান হইতে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কৃপায় ভয়ানক অধর্ম্ম করিয়া বিনায়াসে কতকগুলা টাকা পাইল—এই তার লাভ। এখন ইয়ারকী ও গুণ্ডামী দিনকতক বেশ চলিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাধন-সৌকার্য্য।

সাধনায় যার চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে—সে কিছুতেই টলে না। লোকের দুই একটী ভালমন্দ কথায় বা সুখ্যাতি-অখ্যাতিতে তার যায় আসে কি, বৃথা একজন অনিষ্ট করিলে তার মনই বা খারাপ হইবে কেন? মহিমের এই ভয়ানক চাতুরীতে রামেশ্বর কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বরং মায়ের নিকট তাহার চিত্ত-বিকৃতির জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। উদার-প্রকৃতি ধার্ম্মিকের নিকট পৃথিবী শুদ্ধ লোক যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ, সকলেই যে তাঁহার আপনার, তবে কোপ প্রকাশ করিবেন কাহার উপর? এতগুলি টাকা যে ফাঁকি দিয়া লইল—তার জন্য তিলমাত্র চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল না, যেদিক দিয়ে যাহার প্রাপ্য সে ত' তাহা পাইবেই—মা ত' তাহাকে দিয়াই দিবেন। রামেশ্বর পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে সদানন্দময়ীর চরণে প্রগাঢ় ভাবে চিত্ত স্থির করিলেন।

আমাদের দেশে সাধনার অনেক প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও —শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সাধকই বেশী। নদী যেদিক দিয়াই যাক— সাগরের সহিত মিলিত হওয়াই যেমন তাহার উদ্দেশ্য; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে যেরূপেই সাধনা করুন—উদ্দেশ্য সেই ভগবৎপ্রাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সমস্ত প্রকারভেদ—ভাবিয়া দেখিলে আসলে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই।

সাধনার দুইটী পথ—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি ভোগ, নিবৃত্তি যোগ। নিগমোক্ত সাধনা নিবৃত্তির পথে, আর আগমোক্ত সাধনা

প্রবৃত্তির পথে। যাহাদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে—তাহাদের নিবৃত্তির পথ—যোগ। আর যাহাদের বাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তাহাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া জগদ্গুরু ভগবান সদাশিব তাহাদের জন্য তন্ত্রের সাধনা প্রচার করিয়াছেন, ভোগের পথ দিয়া যোগের পথে আসিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তিমার্গে আনাই ইহার উদ্দেশ্য।

নিগম-বেদ, আগম তন্ত্র। বেদ ও তন্ত্র পৃথক্ শাস্ত্র নহে; বেদও যেমন চারিযুগ চলিয়া আসিতেছে। তন্ত্রও তদ্রূপ, সত্যাদিযুগেও ইহার প্রচলন ছিল—মহারাজ সুরথাদি এই তন্ত্রোক্ত সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্কর অধুনা অল্পায়ুঃ কলির জীবের পক্ষে তন্ত্রমতে শক্তিসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভের উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন।

"শক্তেজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তির্হাস্যায় কল্প্যতে"—শক্তির উপাসনা ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক। অনেকে মনে করেন—মদ্যাদি পান করিয়া সাধনা করাই তন্ত্রের মত—ইহাতে মন্দ ব্যতীত ভাল ফল হইতে পারে না। এ চিন্তা যাঁহারা করেন—তাঁহারা ভ্রান্ত। পরম মঙ্গলময় সদাশিব কখনও জীবকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবার জন্য উপদেশ দেন নাই। তবে তুমি যদি শাস্ত্রার্থ বুঝিতে না পারিয়া ব্যভিচার কর ত' দোষ কার?

তন্ত্র সার্ব্বজনীন, তিনি ভালমন্দ—পাপী পুণ্যাত্মা, কাহাকেও বাদ দেন নাই। যাহার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে—তিনি যোগমার্গ অবলম্বন করুন। কিন্তু যিনি বদ্ধজীব—আসক্তির পথে সদা ভ্রাম্যমাণ—তাহার উপায় কি? প্রবৃত্তি যাহার বদ্ধমূল—আদৌ নিবৃত্তি যাহার আয়ত্ত হয় নাই, তাহাকে কেমন করিয়া ধর্ম্মের মধ্যে আনা যাইবে? প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহাকে নিবৃত্তি করানই ভাল। নতুবা সে কিছুতেই এ পথে অগ্রসর হইবে না। ত্যাগের জন্য ভোগ করিলে—সে আসক্তি কতদিন

থাকে? পানের জন্য সাধনা নয়, সাধনার জন্য পান—এই ভাবিয়া যে পান করে—তাহার মদ্যপানে দোষ কি? ঔষধের জন্যও ত' সুরাপান শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মদ্যপান করিয়া মাতাল হওয়া তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণে পান করিবে। মানুষকে একাগ্র করিবার একটা শক্তি সুরার আছে। যাহাদের চিত্ত স্থির হয় না, জপের পূর্ব্বে শাস্ত্র তাহাদের "তোলকদ্বয়ং" পানের একটা মাত্রা স্থির করিয়া দিয়াছেন। গুরুর দ্বারা শোধিত সুরা ঐ পরিমাণে জপের সময় পান করিবে, যখন তখন নয়। তেজঃ পদার্থ ব্যতিরেকে যাহাদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে না; তাহাদের জন্য যথাশাস্ত্র পান বিধি দোষের নহে। যাহাদের কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে, সুষুম্নাপথ পরিষ্কার হইয়াছে; তাহাদেব পানের আবশ্যকতা কি?

মূলাধারের শক্তি কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলে—শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন সাধকেরই জপ সিদ্ধ হয় না—অতএব যেরূপ হউক, সাধক মাত্রকেই এই মহাশক্তিকে জাগাইতে হইবে।

রামেশ্বর প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা সুষুম্না পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহার প্রতি প্রসন্না, সুতরাং সাধারণ যপ-যজ্ঞে তাঁহার পানের আবশ্যক হইত না। তবে বড় বড় তান্ত্রিক-ক্রিয়ানুষ্ঠানে উপচাররূপে পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা যেখানে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। রামেশ্বর এখন কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানেই ব্যস্ত, কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই; যাহার ফল সাধক হাতে হাতে লাভ করিতে পারেন। এইজন্যই রামেশ্বর একজন করিতকর্ম্মা গুরুর জন্য অস্থির হইয়াছেন। গুরু না হইলে এসকল কর্ম্মে যে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

শক্তি-সাধনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যের মাঝামাঝি পাশ-বদ্ধ অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাধককে নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে হয়। পূজা, জপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, শ্রাদ্ধতর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম—কর্ম্ম-যোগের গোড়া. তার পর বারব্রত, যজ্ঞানুষ্ঠান হোম প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম—কর্ম্মযোগের একটু পাকাপাকি অবস্থা, ইহাই—পশুভাব।

এ সময় সাধকের প্রকৃতি তমোগুণ প্রধান থাকে। তমোগুণ অর্থে স্বভাবের বৈষম্য নহে। সাধন-প্রকৃতির বৈষম্য ভাব—ধর্ম্মকর্ম্ম করিব, সংসারের উন্নতি করিব, পরিজন প্রতিপালন করিব ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া মনকে পরিষ্কার করিবার জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা।

রামেশ্বর কখনও বিলাসী নহেন; পোষাক-পরিচ্ছদের আঁটুনী তাঁহার ছিল না; ইহাতে লোকের নিকট মান্যার্হ হইবেন কিনা, সে বিষয় আদৌ চিন্তা করিতেন না, শুধু পায়ে, শুধু গায়ে, একখানি কাপড় ও এক খানি চাদরেই তিনি রাজসভা মারিয়া আসিতেন। জলে ভিজিবার, রৌদ্রে বেড়াইবার অভ্যাস ত' ব্রহ্মচর্য্যে বেশ শিক্ষা হইয়াছে; প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, মৃত্তিকা-জলাদি সেবনে তাঁহার বাহ্যিক শরীর-কান্তি যেমন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল, দানাদি সদ্‌গুণ দ্বারা মনের নির্ম্মলতাও তিনি সম্যক্‌ভাবে সাধন করিয়াছিলেন। দানই যে কলির ধর্ম্ম, ইহার তুল্য মোক্ষ কাজ যে আর নাই, রামেশ্বর পিতামাতার নিকট হইতে সে গুণে বিশেষ গুণবান্‌ হইয়াছিলেন। তাই তিনি এ সকলে সদাই মুক্তহস্ত, সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে খরচই তাঁহার সব। বোধ হয় আরও বেশী আয় হইলে রামেশ্বর প্রাণ ভরিয়া পরের দুঃখমোচন করিতে পারিতেন।

কর্ম্মযোগী রামেশ্বরের কর্ম্মই এখন প্রধান সাধনার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ভরণ-পোষণ, অতিথিশালার অতিথি-

গণের পরিতুষ্টি সাধন, আগত অভ্যাগত এবং আত্মীয়গণের প্রতিপালন এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার এখনকার সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়াছে। এই সাধন-সৌকার্য্যেই রামেশ্বর এখন প্রাণাহুতি দিয়াছেন, দেবী নির্ম্মলাও এ কার্য্যে তাঁহার শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। পিত্রালয় হইতে মাসিক যে ভাতা প্রাপ্ত হন- অকাতরে তিনি উহা স্বামীর হস্তে প্রদান করিয়া ঐ সকল সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে অনুরোধ করেন—মনে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। তিনিও বিলাসিনী নহেন, ভোগের ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই, সেই পূর্ব্বের ন্যায় একখানি লালপাড় শাড়ী এবং মনিবন্ধে দুইগাছি শাঁখা ও সীমন্তে সধবার পবিত্র চিহ্ন কপাল-পোরা সিন্দুর ধারণ করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। বাস্তবিক এই বেশে যখন তিনি বৈকালের রৌদ্র পড়িলে অঙ্গনে বিল্ববৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া সুকুমার কুমারটীকে আদর করিতেন, তখন যেন ভগবতী দুর্গা গণেশকে কোলে লইয়া আনন্দময়ীরূপে ভক্তের ভবন আলোকিত করিতেছেন বলিয়া অনুমান হইত।

রামেশ্বরের ধর্ম্মকর্ম্মে দাক্ষায়ণীও কম সাহায্যকারিণী ছিলেন না। আজীবন কাটনা কাটিয়া তিনি রামেশ্বরের এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি না থাকিলে বোধ হয় আজ রামেশ্বর এ কার্য্যে এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। রামেশ্বরের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রথম ও প্রধান সহায়—স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাশালিনী, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী দাক্ষায়ণী- ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, তারপর নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা পুত্রবতী হইয়াছেন—দারাগঞ্জে এ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাই মহানন্দ একবার দৌহিত্র-মুখ দেখিতে বাসনা করিয়াছেন, সৌদামিনী ও মাধুরীর বড় ইচ্ছা যে একবার নির্ম্মলাকে এ বাটীতে আনা হয়। আহা! সেই কতদিন হইল গিয়াছে—এখন কেমনটী হইয়াছে, পুত্রটীই

১৫

বা কেমন হইল—তাহা দেখিবার ইচ্ছা কার না হয়? বিশেষতঃ নির্ম্মলা সেই আসিয়া অবধি আর পিতামাতার চরণ দর্শন করেন নাই। এতদিনের পর তাঁহাদিগকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। মহানন্দের আশীর্ব্বাদ-পত্র ও কমলেশ্বরের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া রামেশ্বর নির্ম্মলাকে জানাইলেন যে, তাঁহারা একবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভগবান সদাশিবের কি ইচ্ছা, এ ত' আর দক্ষযজ্ঞ নয় যে, ভয়ের কোন কারণ আছে?

রামেশ্বর। না নির্ম্মলা তা নয়, তবে পিসীমা বুড়ো হ'য়েছেন, এ সকল খেপাখেপি কি তিনি এখন আর সহ্য ক'র্ত্তে পারবেন? নতুবা অনেক-দিন আসিয়াছ, একবার না পাঠানও ভাল দেখায় না। তোমার মা বাবা এবং কমলেশ্বর কত পত্র লিখিয়াছেন, আমি তোমাকে কোন কথা না বলিয়া কেবল একটা না একটা কারণ দেখাইয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। এবার আর না পাঠালে ভাল দেখায় না।

নির্ম্মলা। তুমি একবার পিসীমাকে জিজ্ঞাসা কর না, তিনি কি বলেন?

এই সময় দাক্ষায়ণীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মলার পিতা পত্র লিখিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন—আহা! দেখ্‌বার সাধ ত হবেই, অমন নাতিটী হ'য়েছে কার, না দেখ্‌তে সাধ যায়? আমাদের চলে না ব'লে কি, তাঁরা একবার সোণার বাছাটীকে দেখ্‌তে পাবে না? বাবা তুই লিখে দে মাসখানেকের জন্যও একবার লইয়া যান, বেশী দিন থাকলে চলবে না।

পিসীমা তার অনুমতি পাইয়া রামেশ্বর তাহাই লিখিয়া দিলেন। যথাসময়ে পত্র পাইয়া একদিন কমলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুপ্রকৃতি ভগ্নীপতির সহিত কয়েকদিন মনের আনন্দে কাটাইয়া কমলেশ্বর

ভগ্নী ও ভাগিনেয়কে লইয়া দারাগঞ্জে প্রস্থান করিলেন। কমলেশ্বর বেশ স্বস্থ হইয়াছেন, মনের গতি ত' পূর্ব্ব হইতেই ফিরিয়াছিল। নিত্যকর্ম্মে এখন বেশ উন্নতি করিয়াছেন দেখিয়া রামেশ্বর তাহাকে প্রত্যহ গীতা ও চণ্ডীপাঠের উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাস্নানের ফল।

বয়স যত বাড়িতে থাকে, আয়ুসূর্য্য যত কালের কোল পানে ঘনাইয়া আসিতে থাকে; মানুষের প্রাণ পরকালের জন্য ততই অস্থির হইয়া পড়ে—ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য স্বতঃই প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। যাহারা কখনও ধর্ম্ম করে না—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও প্রাণে যখন ধর্ম্মের সাড়া পড়িয়া যায়, পরকালের চিন্তার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটী করে—তখন ধার্ম্মিকের ত' কথাই নাই—তাঁহাদের প্রাণে যে কিরূপ আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা বলা যায় না।

রামেশ্বরের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হইল, এখনও কিছু হইল না, গুরুদেব কই আশা দিয়া এখন দেখা দিলেন না! আজ সমস্ত রাত্রি বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া রামেশ্বর কেবল এই চিন্তাতেই ভোরপুর, প্রাণে যেন কিছুতেই সুখ পাইতেছেন না; মন যেন কতই অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন! হায়! এমন দুর্লভ জন্ম কি আমার এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে, এই সময় মনোমত গুরু পাইলে বোধ হয় আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইত, অন্তর্যামিনীকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বসাইয়া ভক্তিপ্রাবল্যে পূজা করিতে পারিতাম, ভবের সকল ভাবনা এড়াইয়া ভব-ভাবিনীর সুশীতল কোলে স্থান পাইতাম; কিন্তু হায়! তাকি হবে না? ঠিক এই ভাবে বসিয়া রামেশ্বর কত কি ভাবিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবকে মিলাইয়া দিবার জন্য মাতৃপদে কত প্রার্থনা করিলেন; গুরু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া না দিলে

ত' সে অভয়পদ দর্শনের কোন আশা নাই; এত দিন গেল কই কাজের মত কাজ ত' কিছুই হইতেছে না! মন যে কেমন উড়ু উড়ু করিয়া বেড়াইতেছে – কিছুতেই বাগ মানিতেছে না! জীবনের দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে—আর কবে কি হইবে মা?

নিদাঘ নিশা সাতিশয় গুমোট ভাব ধারণ করিয়াছে; গাছের একটী পাতাও নড়িতেছে না. রাত্রির এ গভীর যামে যে যেখানে পাইয়াছে, পড়িয়া বৃথা নিদ্রা যাইবার আশা করিতেছে। যাহার চিন্তা নাই, মন যার চিন্তাশূন্য, এ দুঃসহ গ্রীষ্মেও সে কিয়ৎক্ষণ এ-পাশ ও পাশ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চিন্তা যার সহচরী, সে আর বিছানায় পাশ্ দিতে পারিতেছে না। আই ঢাই করিয়া কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে। রামেশ্বর নির্ম্মলার কাছে শয্যায় শুইয়াছিলেন, সতী, নির্ম্মলাও পতি-পদতলে সুকুমার শিশুটীকে লইয়া নির্ভাবনায় নিদ্রিতা; পতির পদতলে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি শিশুকে কোলে লইয়া শয়ন করিতে পারিলে সতীর চিন্তা কিসের, তিনি দুই একবার "খোকা ঘুমোনা বাবা! রাত যে অনেক হ'য়েছে, চক্ষে কি ঘুম নেই" বলিয়া সোহাগের রাগে পুত্রকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে নিজেও গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন—শিশুও মায়ের মাই মুখে দিয়া দুই একবার রাগে গর গর করিতে করিতে দুগ্ধ পানের আশা মিটাইয়া মাইটী মুখে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মায়ে-পোয়ের আর সাড়া-শব্দ নাই।

রামেশ্বর কিয়ৎক্ষণ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন, নির্ম্মলার সেই গণেশজননী মূর্ত্তিটীকে সোহাগভরে কত আদর করিলেন। পরক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—বংশের তিলক ত' বংশ রক্ষা করিবে কিন্তু আমার রক্ষা কোথায়, এইরূপেই ত' দিন কাটিয়া যাইতেছে, মাছ ধরিবার আশায় কেবল কাদাই ঘাটিতেছি, কই মাছ ত'

ধরিতে পারিতেছি না! আর কবে ধরিব সেই অমৃতের আস্বাদ আর কবে পাইয়া জীবন ধন্য করিব? রামেশ্বর সংসার করিতেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্ত এইরূপে অস্থির হইয়া পড়িত, এমন সুখের সংসার, এমন সতী স্ত্রী, এমন সুকুমার পুত্ররত্ন কিছুতেই তাঁহার প্রাণকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দান করিতে পারিত না, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রাণ প্রাণময়ীর জন্য অস্থির হইয়া পড়িত, নির্লিপ্ত সাধক-প্রাণের ইহাই হইল—অঘটন ঘটন-নব জাগরণ, এত মায়ার মধ্যে বাঁধা থাকিলেও মা তাঁহার হৃদয়তন্ত্রি এক একবার এইরূপে বাজাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিতেন!

বিনিদ্র রজনী বৃথায় জাগিয়া ফল কি? তাই রামেশ্বর বিল্বমূলে আসিয়া বসিয়াছেন—কত কি ভাবনার পর সাধক সুখাসনে সমাসীন হইয়া নাভিস্থলে নেত্রবদ্ধ করিয়া অজপা জপে মন দিলেন। হংসঃ মন্ত্রে প্রতিবার এই শ্বাস পতন লক্ষ্য করিলেন—হায়! এই ত' জীবনী-শক্তি, এই অজপা * যখন ফুরাইয়া যায়, তখনই ত' জীবের মৃত্যু, দিবারাত্রে ইহার উত্থান পতন হইতেছে, এই শ্বাস বাহির হইয়া যদি আর প্রবেশ না করে, তাহা হইলেই ভবলীলা শেষ, এমন দুর্লভ জন্মের এইখানেই ত' যবনিকা পতন কিন্তু যে এই অজপা জপে সিদ্ধিলাভ করিয়া সোঽহং ভাবে ইহার গতি ফিরাইতে পারে, তাহার জীবন কত সুখের, এ জগতে মানবজন্ম তার কত আনন্দময়! আনন্দময়ীর পুত্রের

* অহোরাত্রে ২১৬০০ বার অজপা জপ অর্থাৎ হংসঃ-মন্ত্রে শ্বাসের উত্থান পতন হইলে কলির মানুষ ১২০ বৎসর বাঁচিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত হইলে আয়ু কমিয়া যায়, কম হইলে পরমায়ু আরও বর্দ্ধিত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা ইহার কম বেশী করা যায়।

জীবন যদি এইভাবে পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভের সার্থকতা কি ?

সেদিন শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি হইলেও চন্দ্রকিরণের তত ঔজ্জ্বল্য নাই, যেন কাক-জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ব্যাপিয়াছে, কাজেই রজনীর গাঢ়তা অনুভব করিবার বা পরিমাণ মাপিবার কোন উপায় নাই। এখনকার মত তখন ঘটিকাযন্ত্রের এত প্রচলন হয় নাই, এজন্য কত রাত্রি আছে— তাহা জানিবারও উপায় ছিল না। রামেশ্বর বিভোর প্রাণে সমভাবে বসিয়া আছেন—এমন সময় বৃক্ষান্তরে গ্রীষ্মতাপতাপিত একটা কালো পাখী তাঁহার প্রিয়া-পাশে কুহু কুহু করিয়া কি বলিল।

রামেশ্বর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন—পতিতপাবনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া দেহ-মন জুড়াইতে তাঁহার একদিনও অবহেলা ছিল না; তাই মনে করিলেন—নিদাঘ-নিশা বোধ হয় অবসান হইয়াছে; তবে আর কেন ? আনন্দিত মনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া দিয়া তিনি অন্যান্য দিনের মত আজও আকুলপ্রাণে সুরশৈবলিনী জাহ্নবী-কূলে প্রস্থান করিলেন। এই গঙ্গাতীরে যখন সরটঃ করটঃ কৃশ শুনীতনয় * হ'য়ে থাকাও মহাপুণ্য—কবিগুরু বাল্মীকি যখন স্তব-মাহাত্ম্যে এই কথা প্রকাশ করিতেছেন—তখন যাহারা নিকটে থাকিয়া গঙ্গার পবিত্র সলিলে অবগাহন না করে—তাহাদের ত' জন্মই বৃথা ! সে পাতকীর উদ্ধার হইবে কিসে ? মা যে আমার পতিতপাবনী; পতিত জনকে পাবন করিবার জন্যই ত' তাঁর মর্ত্ত্যে আগমন—এই জন্যই ত' গঙ্গাভক্ত মুসলমান-সাধক দরাফ খাঁ সখেদে বলিয়াছিলেন—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।

---

* শুনীতনয়—কুকুরছানা।

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং ॥

সাধক যখন এত জোর করিয়া মাকে পাতকী উদ্ধারের জন্য বলিতেছেন—তখন এ দেবদুর্লভ অমল জলে সমল দেহ ডুবাইলে চিত্ত-শুদ্ধি, আত্মার তৃপ্তি হইবে না কেন ; আর এত নিকটে থাকিয়া সে সুখে বঞ্চিত হয়—এমন দুরাত্মাই বা কে ?

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া কর্ম্মযোগী রামেশ্বর পুনরায় হৃদয়ে আশার বাতি জ্বালিয়া, আনন্দময়ীর প্রেমে মনকে আনন্দময় করিয়া—"আশাময়ি ! মনের আশা পূর্ণ কর মা !" বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাটীর বাহির হইয়া দেখিলেন—সম্মুখে কাহাদের একটী দুগ্ধবতী গাভী চরিতেছে—গো দর্শনে যাত্রা শুভ ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পথে জনমানবের সমাগম নাই। রামেশ্বর কখনও মুখ বুজিয়া রাস্তা চলিতেন না প্রাচীন সাধক কবিগণের একটা না একটা গান তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত। যাত্রা শুভ দেখিয়া প্রাণ পুলক-হিল্লোলে নাচিতেছে—তাই সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে মনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল
সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হ'য়ে ব্রহ্মময়ী সুত ?
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলি রে পাগলার মত,

ও মন মা আছে যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে দুর্গা বল অবিরত,
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবে রে তোর তেমনি মত।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত,
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি ক'র্‌বে রে রবিসুত॥

সাধকের গানে সাধক রামেশ্বরের আবার মন সতেজ হইয়া উঠিল; হৃদয়-উথলিত নৈরাশ্য-সাগর একেবারে শুকাইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—বাস্তবিকই ত' যার ব্রহ্মময়ী মা আছে, তার আবার ভাবনা কি? জীবনের দিন ফুরাইতেছে—রবিসুত আগমনের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে ব'লে ভাবনা কি; যার মায়ের পায়ে কালের কাল মহাকাল পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, সে সামান্য কালের জন্য এত ভাব্‌বে কেন—এ যে বাস্তবিকই অদ্ভুত—গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ ক'র্‌লে মরণের ভয় কোথায়?

রামেশ্বর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তন্ময় ভাবে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু একি? ঘাটে যে লোক নাই; স্নানার্থী একটীও প্রাণী যে ঘাটে আসে নাই। ঘাট যে জনমানবশূন্য; তবে কি এখনও রজনী প্রভাত হয় নাই—রাত্রি কি এখনও বেশী আছে, প্রভাতকাল উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই কি আমি এত রাত্রে ঘাটে আসিয়াছি? কাকজ্যোৎস্নায় ঠিক যেন প্রভাতেরই সূচনা করিতেছে। যাহা হউক, যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন আর ফিরিয়া যাইব না। দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে—কিয়ৎক্ষণ পবিত্র সলিল-শীকরবাহি বাতাসে প্রাণ শীতল করিয়া মায়ের নাম জপ করি—তার পর অরুণোদয়ে স্নান করিয়া ভগবান্ ভাস্করের লোহিত জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে বাড়ী যাইব।

আধুনিক শিবপুরের নিকট তখন এই দেবীপুরের ঘাট কলিকাতার পার-ঘাট ছিল। বিদেশী বণিকগণ অনেক কল-কারখানা এখানে নির্ম্মিত করিবার জন্ম সেই সময় নানাপ্রকার মাল-মস্‌লা আনিয়া ফেলিয়াছিল। রামেশ্বর তীরে মনোমত একটু স্থান বাছিয়া লইয়া দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করতঃ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দেবীপুরের ঘাট হইতে দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিলে—কালীঘাটের আদিগঙ্গার মায়ের ঘাট অবধি দেখিতে পাওয়া যাইত; এখন নানাপ্রকার গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া সে দর্শনে বাধা পড়িয়াছে। সাধক একাগ্রচিত্তে মায়ের ঘাটের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া জপে মনোনিবেশ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন—কৃষ্ণকায় একজন সুদীর্ঘ উলঙ্গ পুরুষ জলের উপর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তিনি কোন কিছুর ছায়া মনে করিয়া তত চঞ্চল হন নাই। তার পর মূর্ত্তি যত নিকটবর্ত্তী হইয়া, দেবীপুরের ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল—রামেশ্বরের নির্ভীক চিত্তও ততই ভয়যুক্ত হইয়া পড়িল—শঙ্কাশূন্য-প্রাণে আশঙ্কার উদয় হইল। মানুষ যে বিনা যানারোহণে জলের উপর দিয়া চলিয়া আসিতে পারে—তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না—অতএব ইহা কোন কিম্পুরুষ অথবা ভূতযোনি হইবে।

রামেশ্বরের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনি উঠিলেন—কল-কারখানা নির্ম্মাণের জন্য নিকটে একটী লৌহ-নির্ম্মিত বৃহদাকার চোঙ্গ (বয়লার) পড়িয়াছিল। তিনি ভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ছিদ্র-মধ্যে নয়ন দুইটী আবিষ্ট করিয়া দেখিতে লাগিলেন—কিম্পুরুষ কি করে—কোথায় যায়। আত্মরক্ষার জন্য তিনি মাতৃনাম মহামন্ত্রে কবচ আঁটিয়া বসিয়া রহিলেন।

মূর্ত্তি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই ঘাটেই উত্তীর্ণ হইল; সলিলঃ

সন্নিধানে বসিয়া নেতিধৌতি প্রভৃতি ক্রিয়া সমাধা করিয়া যখন তীরে উঠিল—তখন আঁ, একে এ—এ যে আমাদেরই অতিথিশালার সেই পাগ্‌লা বাবা! ইনি এত বড় সাধক! এইজন্য তিনি একদিনও অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করেন না, প্রতিদিন মায়ের কোলে যাইয়া সুখে নিদ্রা যান—তারপর প্রাতঃকালে আমার কুল পবিত্র করিতে, আমার ন্যায় অধমকে কৃতকৃতার্থ করিতে—তথায় উদয় হন। হায়! আমার অনুমান সত্য হইলেও এতদিন ইঁহাকে জানিতে না পারিয়া স্বয়ং কত অপরাধ করিয়াছি, না জানি এ মহাত্মা মুক্তপুরুষের নিকট কত ত্রুটী করিয়াছি?

রামেশ্বর এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতেছেন ইত্যবসরে সাধক নেতিধৌতির দ্বারা অন্তর মল পরিষ্কৃত করিয়া বাহ্যিক ভাবভাবে মত্ত হইলেন। তাঁহার পোষক-পরিচ্ছদ—সেই জুতার মালা, শামুকের বালা সেই ঝুলি কেঁথা সমস্ত একটী ঝোঁপের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কার্য্য শেষে তাহা পরিধান করিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন—রামেশ্বর অমনি বাহির হইয়া পদতলে লুটিয়া পড়িলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভু! এতদিন আপনাকে চিনিতে পারি নাই! আপনি যে একজন মহাপুরুষ—তাহা মনে মনে অনুমান করিলেও—সংসারী আমরা কিছুতেই ধরিতে পারি নাই—আপনার মত মহাপুরুষ ধরা না দিলে সংসারের অজ্ঞানী মায়ামুগ্ধ জীবের সাধ্য কি যে ধরিতে পারে! ঠাকুর! না জানিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি—অধমকে মাপ করিবেন। এখন চিনিতে পারিয়াছি, আর ত' ছাড়িব না; আমার একটা উপায় আপনাকে করিতেই হইবে। আমি নিরুপায় হইয়া কেবল পথে পথে ঘুরিয়া সময় নষ্ট করিতেছি; যথার্থ কাজ কিছুই হইতেছে না। হরিদ্বারের এক মহাপুরুষ আশ্বাস দিয়াছিলেন—সময়ে দেখা করিয়া

আমার জীবনের পথ মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়াছিছেন—কিন্তু কই, এখনও ত' তিনি আসিতেছেন না! প্রভু! আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে—আর সময় নষ্ট করিতে পারি না, এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত। এই বলিয়া রামেশ্বর মহাপুরুষের পায়ে গড়াইয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ অতিথিশালায় মৌনী হইয়া থাকিতেন কিন্তু আজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—বৎস! এই যে আমি বহুপূর্ব্ব হইতে তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি; তবে এতদিন যে ধরা দিই নাই—সে কেবল তোমার মন পরীক্ষার জন্য—তোমার কীর্ত্তি-কলাপ দেখিবার জন্য; বৎস! তোমার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি উপযুক্ত পাত্র—পত্নী নির্ম্মলার সঙ্গে তুমি আদর্শ সংসারই পাতিয়াছ, নির্ম্মলা মহা-ভাগ্যবতী সতী। আজ মা তোর প্রতি সুপ্রসন্না, তিনি আমাকেই আজ তোর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। চল্, বৎস! আজ তোকে ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া সংসারের অতীব দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী করি সংসারে এখন কিছুদিন থাকিয়া তোর পিতার কীর্ত্তি—অতিথিশালাটীকে আরও একটু পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত কর—অর্থাদি আরও সংগ্রহ করিয়া উহার স্থায়ীত্ব দৃঢ় কর—তারপর মাতৃদর্শনে তোর পরকালের পথ মুক্ত করিয়া দিব।

রামেশ্বর। প্রভু! এখনও কি কাদা ঘাঁটিতে হইবে?

মহা। কাদা না ঘাঁটিলে মাছ ধরা হয় না, মানুষ কর্ম্মযোগে দৃঢ় না হইলে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, এখন তোমার অনেক কর্ম্ম বাকী—তোমার দ্বারা জগতের অনেক হিতসাধন হইবে—সে কার্য্যের যে এই সূত্রপাত হইয়াছে বৎস!

রামেশ্বর। প্রভু! আপনি ত' কাছে কাছে থাকিবেন?

মহা। বৎস! আমাদের অবধূত আশ্রমের নিয়মানুসারে একবার

প্রকাশ হইলে, লোকে জানিতে পারিলে আর তথায় থাকা নিষেধ। তোমাকে কার্য্যে পাকা করিয়া দিয়া দুই একদিনের মধ্যে আমিও স্থানান্তরে যাইব; সময় হইলে ঘটনাচক্রে আবার এইরূপে দেখা হইবে।

রামেশ্বর আর কোন কথা বলিলেন না। মহাপুরুষের কথায় তিনি গঙ্গার পূত সলিলে অবগাহন করিয়া পুত্র যেমন পিতার পাছু পাছু গমন করে, রামেশ্বরও সেইরূপ ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন।

যখন তাঁহারা দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন রজনী ভোর হইল। পাখীগণ কুলায় বসিয়া প্রভাতী আলাপ করিতে লাগিল—ঘাটে দুই একজন করিয়া লোক সমাগম হইতে লাগিল। আজ গঙ্গাস্নানের যথার্থ ফল ফলিবে বলিয়াই বুঝি রামেশ্বরের নিদ্রা হয় নাই—রাত্রি প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়াই বুঝি গভীর রাত্রির নির্জ্জন যামে বাটী হইতে বাহির হইয়া মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিলেন—তাঁহার বহুদিনের আরাধ্যপদ লাভ হইল। পাগলা বাবা আজ আত্মপরিচয় প্রদানে কৃতার্থ করিলেন।

অবধূত আশ্রম—মুক্তির অবস্থা—সাধনার শেষ সীমা। এ সময় তাঁহারা যে কি অবস্থায় থাকেন, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। তাই সাধারণ-লোকচক্ষে তাঁহারা পাগল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রামেশ্বরও শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে অবধূত লক্ষণ পড়িয়াছেন :—

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম্॥

এই শিবস্বরূপ অবধূতে এই সকল লক্ষণ সম্যকরূপে বর্ত্তমান। বিনা যানে জলের উপর ভ্রমণ করা বা আকাশ-মার্গে উড্ডীন হওয়া আর ইঁহার পক্ষে বেশী কথা কি, প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগী ত' সহজেই এ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে!

আজ রামেশ্বরের হৃদয়ে যে কি আনন্দের তুফান বহিতেছে—তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম,—যাহার এ সৌভাগ্য ভোগ হইয়াছে, তিনি বলিতে পারেন—আজ তাঁহার কি সুদিন।

গৃহ-প্রবেশের সময় অবধূত বলিলেন—রামেশ্বর! আমি পূর্ব্বের ন্যায় মৌনীই থাকিব—আর কথা কহিব না, তুমি দেব-গৃহে আজ ভাল করিয়া পূজার উদ্যোগ কর—তোমাদের উভয়কেই আজ সিদ্ধমন্ত্র প্রদানে ক্রমদীক্ষিত ও অভিষিক্ত করিব। আর তোমাদের গৃহে যতগুলি চণ্ডীর পুঁথি আছে, সমস্ত একত্র করিয়া ঐ ঘরে লইয়া যাইও। রাবণ বধের সময় হইতে চণ্ডী অশুদ্ধ আছে—সাধারণে তাহা জানে না—এই জন্য আমি উহার মধ্যে একখানি সংশোধন করিয়া তোমার হাতে দিব—উহা পাঠ করিলে বিগত জীবন ব্যক্তিও জীবন পাইবে—তবে তাহার জন্য তুমি কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবে না। প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লোকের উপকার করিবে—ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান উপকরণ। এইরূপে ধর্ম্ম করিলে মায়ের কৃপায় অন্য প্রকারে তোমার অর্থ আপনি যুটিয়া যাইবে—তাহার দ্বারা তুমি বংশের কীর্ত্তিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উত্তরকালে পরমা সিদ্ধিলাভ করিবে। তুমিও যেমনি তোমার পত্নীটীও ঠিক অনুরূপা যুটিয়াছে, মায়ের কৃপা না হইলে কি এমন মনোরমা ভার্য্যা লাভ হয়? অবধূত পূর্ব্বের ন্যায় পাগলের মত অতিথিশালায় প্রবেশ করিলেন।

রামেশ্বর ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে অন্দরে প্রবেশ করিয়া চুপে চুপে নির্ম্মলাকে এই শুভ সংবাদ দিলেন। নির্ম্মলা শুনিয়া আশ্চর্য্য ভাবে, মুগ্ধ-প্রাণে বলিলেন—এই পাগলই কি আমাদের আরাধ্য দেবতা? তবে এতদিন কোন প্রকার সেবার ত্রুটী হয় নাই ত'?

রামেশ্বর। পিতার নিকট পুত্রের ত্রুটী ত' পদে পদেই, তবে

পিতা সে ক্রটী ধরেন না—তাহ'লে ছেলে বাঁচতে পারে না—বড় হ'তে পারে না। ওসব মহাপুরুষ দয়ার আধার—সামান্য ক্রটীতে উঁহারা কখনও বিচলিত হন না, তবে এতদিন ধরা দেন নাই—কেবল আমাদের গতিবিধি-কার্য্য-কারণ অনুসন্ধানের জন্য। আজ আমাদের সৌভাগ্য, তাই ধরা দিলেন। এখন তাঁহার অনুমতিমত কার্য্য কর।

হাতে স্বর্গ পাইলে লোকের এত আনন্দ হয় না। পতি যাঁহার জন্য অহরহঃ কেবল চিন্তাগ্রস্ত, মনমরা হইয়া কালযাপন করিতেন—আহার-বিহারে সুখবোধ করিতেন না, আজ তাঁহাকে ঘরে বসিয়া পাওয়া গিয়াছে। পতির সুখেই ত, সতীর সুখ—তার পর পতিপদতলে বসিয়া সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ অবধূতের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ—ইহা স্বপ্নাতীত ঘটনা! নির্ম্মলা আমোদে আটখানা হইয়া পূজা-গৃহে উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

গুরুর কৃপা।

নির্ম্মলা আজ দুই দিন হইল পিতৃগৃহ হইতে আসিয়াছেন। সেখানে তাঁহার বৌদিদি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন—নির্ম্মলার বড় আশা হইয়াছিল মন্ত্রগ্রহণ করিবেন—মনে আশার সঞ্চার হইতে না হইতেই—মা তাঁহার সাধ পূর্ণ করিলেন—ভক্তের প্রতি ভগবতী যে চির-সদয়া!

দাক্ষায়ণী ও ভুবনেশ্বরী বধূমাতার মন্ত্রগ্রহণ হইবে শুনিয়া, তাহারা গৃহকর্ম্মাদিতে মন দিলেন গোবর্দ্ধন তড়িতের সহিত হাট-বাজার করিয়া আনিল। বিরূপাক্ষ আজ গুরু ও গুরুপত্নীর সাহায্যার্থে দেবকর্ম্মে নিযুক্ত - পুষ্পচয়ন, পূজোপকরণ আনয়ন, যথাস্থানে তাহাদের সংরক্ষণ করিয়া অতি সত্বর আয়োজন করিয়া দিলেন। রামেশ্বর সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবদেবীর পূজা সারিয়া লইলেন।

বেলা দশটার পর পাগলা বাবা পূজা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্থিত দেব-দেবী এই জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যেন আনন্দে শত বাহু বিস্তার করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আজ বহুদিন পরে দেব-দেবীর সম্মুখে পূজায় ধ্যানরত হইলেন। বহুদিন এমন করিয়া তিনি মাতৃচরণে অর্ঘ্য প্রদান করেন নাই, কারণ এ অবস্থা এখন আর তাঁহার নয়। ধ্যান ধারণা উপাসনা করিয়া এখন তাঁহাকে এত কষ্টে দেবীর দর্শনলাভ করিতে হয় না, এখন তিনি সদা-সর্ব্বদা মায়ের কাছে কাছে রহিয়াছেন; চাহিলেই দেখিতে পান—সর্ব্বভূতে তাঁর মা আনন্দময়ী বিরাজমানা! যাহার এই অবস্থা, সে আর পূজা করিয়া সময় নষ্ট

করিবে কেন? তবে গৃহস্থের মঙ্গলের জন্ম কার্য্য করিতে হইলে ইহা যে করিতেই হইবে--নতুবা শিক্ষা হয় কই? অবধূত পূজায় বসিলেন—এ পূজার বিধি-ব্যবস্থা এক স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ পূজকের পূজায় দেবীর এমন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না, এমন সজাগভাবে তিনি পূজকের পূজা গ্রহণ করেন না—আজ যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া, মা আমার পাগল ছেলের প্রাণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এক একবার মায়ের প্রতিমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নাদস্বরে "শ্যামা" বলিয়া ডাকিতেছেন, আর সেই প্রাণের ডাকে যেন দেবী হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তের সেই প্রেম-ভক্তি-মাখা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন।

গৃহে আর কেহ নাই—সাধক সুখাসনে সমাসীন, রামেশ্বর ও নির্ম্মলা তাঁহার পাশ্চাৎ অবস্থিত, বিরূপাক্ষ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন যদি কিছু আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিবেন। অবধূত রামেশ্বরের ইষ্টমন্ত্র জানিয়াছিলেন—দেবীর নিকট সেই বীজমন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন। কাণের ভিতর দিয়া সেই বীজমন্ত্রের মহাশক্তি মর্ম্মে প্রবেশ করিলে, রামেশ্বরের শিরায় শিরায় যেন কি একটা বৈদ্যুতিক-শক্তি সঞ্চার করিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেহ কণ্টকিত, প্রাণ পুলকিত এবং হৃদয় স্তম্ভিত করিতে লাগিল। কর্ম্মী সাধক রামেশ্বরের এ শক্তি ধারণ করিবার শক্তি ছিল—তিনিও নানাপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা দেবী-প্রসাদ লাভ করিয়া হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাই এ মন্ত্র-ধারণে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু কর্ণ দিয়া এ মন্ত্র মর্ম্মে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, গুরুদেব তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। নির্ম্মলাও বিমুগ্ধ হইয়া চৈতন্য হারাইলে, অবধূত তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইবামাত্র কি এক গুরুতর শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া, তিনি হৃত-চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্ত

হইলেন; তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মহাশক্তির অংশরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

তারপর অবধূত একবার অতিথিশালায় গিয়া, অতি বিনম্রভাবে উপস্থিত কয়েকজন কৌলের অনুমতি লইয়া রামেশ্বর ও নির্ম্মলাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পীঠশক্তিগণের পূজা করিলেন। তারপর অষ্টদিকপালের পূজা; তারপর বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া যথাশাস্ত্র সূর্য্যার্ঘ্য; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ইহাদের পূজা করা হইল। তারপর পঞ্চবর্ণের অক্ষত দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিয়া তাহার উপর মঙ্গলময় ঘট স্থাপিত করিলেন, তীর্থ-সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া নবরত্ন তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর ঐঁ বীজ উচ্চারণ করিয়া ঘটের উপর পঞ্চপল্লব স্থাপন করিলেন। তার উপর স্ত্রীঁ হ্রীঁ মন্ত্র দ্বারা মৃন্ময় পাত্রে আতপতণ্ডুল, নারিকেল ফলসহ রক্ষা করিয়া ঘট স্থাপনা করিলেন। রক্তবস্ত্রে উহা মণ্ডিত করিয়া স্থাঁ স্থীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ স্থিরীভব বলিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। পরে অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস করিয়া ধূপ-দীপ প্রদান সর্ব্বভূত বলিপ্রদান করিলেন। তার পর রামেশ্বর দ্বারা অর্চ্চিত ঘটে ইষ্টদেবীর পূজা করাইয়া ক্লীং হ্রীং স্ত্রীঁ জপ করাইয়া সেই ঘট চালনা করিলেন —উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদঃ। ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে। অবধূত শিষ্য ও শিষ্যাণীকে উত্তরাভিমুখে বসাইয়া সেই পবিত্র জল দ্বারা এই মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া, সমস্ত দেব-দেবীর নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন—তারপর ক্রমদীক্ষার নিয়ম বলিয়া দিলেন। পাঠক! তন্ত্রান্তরে এ সকল নিয়ম পাঠ দেখিয়া লইবেন—ইহার সবিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না।

এই মহাকার্য্য শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। তার পর কৌলগণের ভোজন—অপরাপর সকলের ভোজন-কার্য্য সমাধা হইলে, অবধূত রামে-

শ্বরকে লইয়া ভোজনে বসিলেন। রামেশ্বর আজ আনন্দে ভোরপুর—ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহার নাই; বহুদিনের ইচ্ছা আজ ফলবতী হইয়াছে। যাহা হইবার আশা ছিল না—মা আজ কৃপা করিয়া সেই সাধ পূর্ণ করিলেন—ইহাতে সাধকের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না কিন্তু প্রভুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—ভোজনে বসিলেন। আর নির্ম্মলা মা অন্নপূর্ণা-রূপে তাঁহাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

আজ কৌলাগ্রগণ্য এ অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, তাঁহাকে দেখিলে আর সে পাগল বলিয়া বোধ হয় না। অবধূত প্রসাদ করিয়া যাহা দিতেছেন, রামেশ্বর অমৃতজ্ঞানে তাহাই ভোজন করিতেছেন—ইহাতে শোধিত সুরা, মৎস্য, মাংসও ছিল—রামেশ্বর নিরামিষভোজী হইলেও, এ প্রসাদ গ্রহণে দ্বিরুক্তি করিলেন না। তাঁহাদের ভোজন সমাধা হইলে, নির্ম্মলা পুত্র কোলে করিয়া সেই অমৃতোপম প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—দেবতার আরতি করিয়া রামেশ্বর বিল্বতলায় গুরুদেবের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি আজই এ স্থান ত্যাগ করিবেন—তাই চণ্ডীর পুঁথিগুলি একটী পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার আসন-সমীপে রক্ষা করা হইল।

অবধূত সেই মহাশক্তির কীর্ত্তিকাহিনী-সমন্বিত চণ্ডীর পুঁথিগুলিকে মস্তকে ধারণ করিয়া একে একে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। সেই আট দশখানি পুঁথির মধ্যে একখানি বাছিয়া লইয়া তাহার মধ্যে গুপ্তভাবে কোথায় কি সংশোধন করিয়া দিলেন এবং রামেশ্বরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! এই আমি দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীখানি তোমার হস্তে প্রদান করিলাম। যে কোন কামনা করিয়া তোমার এ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিবে—তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে—এই চণ্ডীপাঠে তোমার অর্থাদিরও অভাব হইবে না; তবে কাহারও নিকট আকাজ্ক্ষা করিও না, পরের

উপকারই করিবে—তবে কেহ যদি সন্তুষ্ট হইয়া কিছু প্রদান করে—তাহা যত অল্পই হউক, মায়ের দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবে। তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ইহা তোমার নিকট থাকিবে, তারপর ইহা কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি ভিন্ন অপর কেহ ইহা পাঠ করিতে পাইবে না।

আর এক কথা—আজ হইতে তোমার রাজসিক বা বীরভাবের সাধনা আরম্ভ হইল। তামসিক বা পশুভাব তোমার তিরোহিত হইল, ভূলোক-মর্ত্ত্যে ছিলে—একপদ অগ্রসর হইয়া ভুবর্লোকের অধিকারী হও, এইবার মর্ত্ত্যে মনুষ্যোচিত কার্য্য কর তাহা হইলে স্বর্গলোকে যাইবার ভাবনা থাকিবে না। তোমার অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে, সাধনায় তোমার আর পঞ্চমকার তত আবশ্যক হইবে না; তবে পূজার উপচার-রূপে ব্যবহার করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিবে। সংসার-কার্য্য এবং পরোপকারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যদি অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়, সাধনায় যদি মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তি যদি একান্তই সে সময় জাগ্রত না হইয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি না করেন - তবে যেরূপ নিয়ম বলিয়া দিলাম, সেইরূপ প্রথায় সংশোধন করিয়া পূজার আসনে উপবেশন করত, মাত্র দুই তোলা শক্তিস্বরূপা মহাশক্তির চরণামৃত পান ভোজন করিবে। যদি সহজেই মন মাতৃমুখী হয়, কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া প্রাণে অসীম পুলক প্রদানে তোমার ইষ্ট আরাধনায় শক্তি প্রদান করেন—তাহা হইলে উহা স্পর্শ করিবে না। সময়ের অপেক্ষা কর, দান ও পরোপকারে চিত্তশুদ্ধি আরও বিশেষরূপে সাধিত হউক, সময়ান্তরে আসিয়া আমি শক্তি-সাধনায় অর্থাৎ শব-সাধনায় সুসিদ্ধ করিয়া তোমাকে মায়ের কোলে তুলিয়া দিয়া যাইব - তাহার এখনও কিছুদিন বাকী আছে; তুমি সাধনা কর—তীর্থাদি ভ্রমণ করা ত' এ আশ্রমের একটী মহাব্রত,

সময় পাইলে তাহার অনুষ্ঠান করিবে—আমার জন্ম চিন্তা করিও না, সময় হইলেই আমি ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইব। উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি গুরুর লক্ষ্য চিরদিন সমানভাবেই থাকে—আমি যেখানে থাকি—তুমি কার্য্যে উন্নতি করিতেছ কিনা—আমি তাহা জানিতে পারিব। যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গেলাম—ইহার বিন্দুমাত্র অবহেলা করিও না, কালে আবার দেখা হইবে।

তখন যামিনী ঘোরা, পাড়ার লোক নিশুতি হইয়াছে, কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। অবধূত উঠিলেন—স্থান-ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। রামেশ্বর কাঁদিতে লাগিলেন, নির্ম্মলা পায়ে পড়িয়া চক্ষের জলে সে আরাধ্য-পদ ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। সাধক তাঁহাদের তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন—মা! নির্ম্মলা, বৎস রামেশ্বর! এখন তোমাদের ভাবনা অপেক্ষা আমার ভাবনা বেশী, তোমাদের পারত্রিক উন্নতির ভার যখন লইয়াছি, তখন আমিই গুরুতর দায়ীত্বে আবদ্ধ; কান্না কি, আমাকে দায়ে পড়িয়া দেখা দিতে হইবে, তবে তোমরা কার্য্য করিও—কার্য্য করিবার ভার তোমাদের উপর—না করিলে পতন অনিবার্য্য, সে বিষয়ে আমার দোষ নাই। গুরু শিক্ষা দিবেন—শিষ্য তদনুসারে কার্য্য না করিলে দোষ কার?

রামেশ্বর ও নির্ম্মলা বলিলেন—প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদ এখন আমাদের সকল মঙ্গলের আলয়। আশা করি যে, আমরা ও পদ-প্রসাদে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইব।

"মা তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন—" এই বলিয়া অবধূত আর দাঁড়াইলেন না, বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। রামেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে কতকদূর গমন করিতে লাগিলেন। তারপর একটু অন্যমনস্ক হইলে একটী বৃক্ষের আড়ালে ঘনান্ধকারে অবধূত কোথায় মিলাইয়া গেলেন,

আর দেখিতে পাওয়া গেল না। রামেশ্বর বিষাদিতচিত্তে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

সে রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। অতিরিক্ত আনন্দে পতিপত্নী সেই বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্ম-কথায় আপনাদের সৌভাগ্যভাবনায় বিনিদ্রভাবে রজনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। আজ তাঁহাদের দেখিয়া সকলেই শিবশক্তির আবির্ভাব বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

বিরূপাক্ষ খুব উন্নত ছাত্র। লেখাপড়ায়ও যেমনি, ধর্ম্মকর্ম্মেও তেমনি মতিমান। ইনি এখন চতুষ্পাঠীর সমস্ত ভার লইয়াছেন। রামেশ্বরের দ্বারা এখন আর অধ্যাপনা-কার্য্য সুচারুরূপে সমাহিত হয় না, তিনি নিজের কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কোন শিষ্য চণ্ডীপাঠ করিতে বলিলে—তিনি গুরুর অনুমতিক্রমে সেই চণ্ডীখানি লইয়া এত তন্ময়ভাবে পাঠ করিতেন, যাহার ফলে শিষ্য-যজমানের খুব মঙ্গল সাধিত হইত। যে, যে কামনা করিয়া রামেশ্বরের দ্বারা চণ্ডী পাঠ করান, অচিরে তাহার সেই ফল লাভ হয়। সাধকের এই চণ্ডীপাঠ কোন স্থানে ব্যর্থ হয় না। ইহার জন্য অতি শীঘ্র তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। অর্থেরও আর অভাব রহিল না, ধর্ম্ম হইলেই অর্থ আপনি আসিয়া পড়ে, মায়ের কৃপায় সাধকের কিছুতেই অনটন থাকে না। তবে রামেশ্বর অষ্টমী চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তান্ত্রিক তিথিতে বাটীর বাহির হইতেন না, কায়মনে মাতৃ চরণে আপনাদের আবেদন-নিবেদন জানাইয়া প্রাণের পূজা প্রদানে দেবীর সন্তোষ-বিধান করিতেন। এখনকার পূজা আর পূর্ব্বের পূজা, এখনকার জপ আর পূর্ব্বের জপ, কত পৃথক্—রামেশ্বর তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

অতিরিক্ত আনন্দে পতিপত্নী সেই বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া নানাপ্রকার সৎকথায় বিনিদ্রভাবে রজনীযাপন করিলেন। (শক্তি-সাধনা ২৫৬ পৃষ্ঠা)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার পথে।

রাশি রাশি বই পড়িলে পণ্ডিত হওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানী হওয়া যায় না। গ্রন্থ পাঠে বাহিরের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানবান করিতে গ্রন্থের ক্ষমতা নাই, তবে প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু সাহায্য করে মাত্র। অধ্যাত্মজ্ঞানে উন্নতি করিতে অনেক সময়ে পণ্ডিত অপেক্ষা মূর্খকে অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ আর জড় বিজ্ঞান পঠন-সাপেক্ষ; জড়-বিজ্ঞানে আত্মার উন্নতি কিছুমাত্র হয় না, কেবল খাওয়া-পরা এবং সংসারসুখের মধ্যে ইহা নিবদ্ধ থাকে, যে সুখে সময় সময় বাধা-বিঘ্ন আসিয়া পড়ে, সুখের পরিবর্ত্তে আবার দুঃখ আনিয়া দেয়, কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে আবশ্যকমত সংসারের উন্নতি ত' হয়ই, ভিতরের উন্নতি এত হয়—যাহাতে তাহার অভাব-অভিযোগ কিছুমাত্র উপস্থিত হয় না, কাজেই পতনের সম্ভাবনাও অতি অল্প। জড়বিজ্ঞান, ক্ষণস্থায়ী, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চিরস্থায়ী, সংসার-লীলা-খেলা শেষ হইবার পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, সুখের নিদান-স্বরূপে সঙ্গের সাথী হয়, আর জড়বিজ্ঞান সঙ্গের সাথী হইলেও কর্ম্মরূপে পরজন্মে বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

নিষ্কাম কর্ম্মেই অধ্যাত্ম-জ্ঞানের উদয় হয়। পূর্ব্বে আমাদের ব্রাহ্মণগণ, ঋষি ও তপস্বিগণ পরার্থে কার্য্য করিতেন, স্বার্থের ভাব তাঁহাদের ছিল না। রামেশ্বরও স্বার্থের জন্য কোনও কাজ করেন না—গুরুদেব তাঁহাকে সে আদেশ প্রদান করেন নাই। কামনা-রহিত হইয়া লোকের উপকার

করিবে, তাহার বিনিময়ে কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না, তবে দয়া করিয়া যদি কেহ কিছু দেয়, তাহা মায়ের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া দরিদ্র অথবা সাধু-সেবায় ব্যয় করিবে। রামেশ্বর তাহাই করিতেন। সাধারণের হিতার্থে তিনি চণ্ডীপাঠ করিয়া বেড়াইতেন, লোকের তাহাতে পরম মঙ্গল সাধিত হইত, তাহার জন্য তিনি কিছু আশা করিতেন না, বহু দূরদেশ যাইতে হইলেও অম্লানবদনে কষ্ট সহ্য করিয়া গমন করিতেন এবং কার্য্য করিয়া তাহার শুভ ফল দেখাইয়া দিয়া, মহা আনন্দের সহিত রিক্তহস্তে চলিয়া আসিতেন, কেহ কিছু দিতে চাহিলে তিনি বলিতেন—বাবা! তোমার কার্য্য যে সফল হইয়াছে, মায়ের কৃপায় যে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, আমার পক্ষে ইহাই পরম লাভ, তবে তুমি যদি একান্তই পারক হও, কোন সৎকার্য্যে উহা ব্যয় করিও। আর তাহার জন্য যদি কেহ অতিরিক্ত অনুরোধ করিত, না লইলে ক্ষুণ্ণ হইত, তাহা হইলে তিনি বাটীতে পাঠাইয়া দিতে বলিতেন অথবা বিরূপাক্ষ সঙ্গে থাকিলে সেই গ্রহণ করিত এবং দেব-সেবায় বা অতিথি-সেবায় তাহা ব্যয় করিত। রামেশ্বর উহা স্পর্শ করিতেন না, বাটীতে আসিয়া পূজাহ্নিকের পর যৎসামান্য আহারে তৃপ্তি-সাধন করিতেন।

বহু দূরদেশে যাইতে হইলে বিরূপাক্ষ প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। গুরুদেবকে একাকী ছাড়িয়া দিতে তাহার প্রাণ চাহিত না। তবে কার্য্য-গতিকে কোনও কোনদিন রামেশ্বরকে একাকীও যাইতে হইত। সেদিন ছাত্রবর্গ বা পরিজনবর্গ রামেশ্বর ফিরিয়া না আসা অবধি জলগ্রহণ করিত না; নির্ম্মলা ত' নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু বেশী হইলে হান্‌টান্‌ করিয়া ঘরবার করিতেন, বৃদ্ধা পিসীমাতা ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, রামেশ্বর সকলের এমনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। যিনি বিশ্বজননী মায়ের এত প্রিয়, জগতে তিনি অপ্রিয় হইবেন কাহার?

রামেশ্বরের অমোঘ চণ্ডীপাঠের ফল যখন চারিদিকে জানা-শুনা হইয়া পড়িল, তখন বহুদূর হইতে লোকে বিপদাপদে তাঁহাকে চণ্ডীপাঠ করাইতে লইয়া যাইত। দুরারোগ্য ব্যাধি, যেখানে ডাক্তার-কবিরাজ কিছু করিতে পারিতেছে না, রোগী ক্রমশঃ মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হইয়া পড়িতেছে—রামেশ্বর চণ্ডীপাঠ করিয়া তাহাকে একদিনেই আরোগ্য করিয়া দিতেছেন, অথচ খরচও কিছু বেশী নাই। ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন, এই গুণে তাঁহার সুযশ মহত্ত্ব সত্বর চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তান্ত্রিক তিথি ছাড়া, রামেশ্বরও সে কার্য্যে গমন করিয়া মা চণ্ডিকার কৃপায় তাহাদের উপকার সাধন করিতে আসিতে লাগিলেন।

একদিন কাশীপুরের কোনও ধনবানের বাটীতে তাঁহার কার্য্য ছিল। তিনি কার্য্য সমাধা করিয়া বেলা আন্দাজ তিনটার সময় বাটী ফিরিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মকাল, রণ্ রণে রৌদ্র, এ সময় বাটীর বাহির হওয়া কাহারও সাধ্য নাই, বিশেষতঃ কলিকাতার রাস্তা, এখনকার মত দুইদিকে অট্টালিকা সমাকীর্ণ ছিল না, ছায়া-শীতল স্থানও এত ছিল না, যে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। কার্য্য শেষ হইলে রামেশ্বর আর কাহারও বাটীতে অবস্থান করিতেন না, যতই দূর এবং যত দুর্গম পথ হউক না কেন—বাড়ী চলিয়া আসিতেন।

আজও সেইরূপ আসিতেছেন। কিছুদূর আসিয়া দেখিলেন, একটী চৌরাস্তার উপরে একখানি খুব বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। কোন ভাগ্যবান ইহা প্রস্তুত করিতেছেন। বাড়ীখানি সম্পূর্ণ হয় নাই, তখনও অনেক রাজ মজুর খাটিতেছে। রামেশ্বর সেই দারুণ রৌদ্রে একটু বিশ্রাম করিবার জন্যই সেই অর্দ্ধ-নির্ম্মিত অট্টালিকার ছায়াতলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী আধাবয়সী বাবু, বোধ হয় এই বাড়ীর মালিকই হইবেন, একটী যুবকের সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের কার্য্য বুঝাইয়া দিতে বাহিরে আসিলেন এবং রামেশ্বরকে তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—ঠাকুর! ওখানে কেন, যদি দাঁড়াবে ত' এখানে এসো না? রামেশ্বর বলিলেন—না বাবা! আমি এখনি যাইব। অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, বড় রোদ লাগিয়াছে, তাই এই ধারে একটু দাঁড়াইয়াছি!

রামেশ্বরের নগ্নগাত্র এবং তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া বাবুটী মিস্ত্রিকে কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং কোথায় গিয়াছিলেন, কি কাজ করেন—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন—বাবা! ব্রাহ্মণের ছেলে কাজকর্ম্ম আর কি ক'র্ব্বো, শিষ্য-যজমান আছে, তাহাদের কল্যাণেই একরকম চলিয়া যায়।

পাঠককে এইখানে বাবুটীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাবুটীর নাম বিভূতিভূষণ মিত্র—সম্প্রতি কাশীপুরের জমীদার হরেন্দ্রনারায়ণের এলাকায় মোরাণ কোম্পানী যে পাটের কল করিয়াছিল, তাহার বড়বাবু হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। পূর্ব্বে খুব দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, এক্ষণে বিভূতিভূষণ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বিপুল অর্থব্যয়ে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। গরীবের ছেলে বড়লোক হইলে স্বভাবতই একটু গরম হইয়া থাকে এবং বিদেশীয় হাব-ভাবে পূর্ণ হইয়া নীচু দিকে প্রায়ই নজর দেয় না, সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদধারী লোককে তাহারা অসভ্য অথবা দরিদ্র ভাবিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে।

আজ শনিবার মিস্ত্রীদের কাজ বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি আফিস হইতে সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছেন। সঙ্গে যে যুবকটী রহিয়াছেন—তিনি বাবুর ভাগিনেয়, তাঁহারই অধীনে আফিসে চাকুরী করেন—

আজ আমার সহিত বাড়ী আসিয়া মিস্ত্রীদের খবরদারী করিতেছেন, ইহাকে বকিতেছেন—উহাকে কাজ হয় নাই বলিয়া ধমকাইতেছেন, যেন কত কাজের লোক। বাবুর মেজাজ বেশ কড়া, জোর গলায় কুলী-মজুরদের কাজের গাফিলাতীর জন্য মিস্ত্রীকে শাসাইতেছেন, এমন করিলে রোজ কাটা যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন। বাবুর হাঁকডাকে কুলী-মজুরগণ তটস্থ হইয়া প্রাণপণে স্ব স্ব কার্য্যে মন দিয়াছে। বাবু হ্যাটকোট-পরিধারী ওভার-কোটটী ও মাথার হ্যাটটী এক স্থানে রাখিয়া গ্যালিস ও নেকটাই-যুক্ত জামা পরিয়া এ-ধার ও-ধার করিয়া মিস্ত্রীকে কাজ বাতলাইয়া দিয়া—আস্তে আস্তে রামেশ্বরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন—সেখানে দক্ষিণদিক বেশ খোলা ছিল, হাওয়াও খুব প্রবলবেগে বহিতেছিল।

গায়ে হাওয়া লাগাইবার জন্য বাবু তথায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। খোলাগায়ের সেই টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণটী যেন কতই অযোগ্য; তথাপি তাঁহার দেহের লাবণ্য জ্যোতি দেখিয়া এবং বগলে একখানি পুঁথি দেখিয়া যেন একটু ঘৃণাসূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে ঠাকুর। এখন আস্চো কোথা থেকে? কি কাজে গেছলে?

রামেশ্বর তাহার ঐরূপ ব্যবহারে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না; এ রকম অবস্থার জীব তাঁহারও ঘরে আছেন—তাহার আচার ব্যবহার তিনি প্রত্যহই দেখিতেছেন—অতএব গা-সওয়া। ঘরের ছেলে পরের হ'য়ে গেলে—বেজায় বিদেশী-ভাবাপন্ন হ'লে মানুষের মস্তিষ্ক ঐরূপ বিগড়াইয়াই যায়, তাহার পর অর্থবান হইলে ত' কথাই নাই, সে আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। তাঁহার দাদারও যে এই ভাব, কাজেই কোন প্রকার ক্ষুণ্ণ না হইয়া বলিলেন—বাবা! এই কাশীপুরের বাবুদের বাড়ী চণ্ডীপাঠ ছিল—তাই গিয়েছিলাম; হরেন্দ্র আমার শিষ্য কিনা?

এই ব্রাহ্মণ হরেন্দ্রনারায়ণের গুরুঠাকুর জানিতে পারিয়া বিভূতিভূষণ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। হরেন্দ্র একজন মহাশিক্ষিত এবং মোরাণ কোম্পানীর সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেই হয়, বিভূতি যে হরেন্দ্রের গোলামের গোলাম, এ এত বড় একজন শিক্ষিত জমীদারের গুরু—বলে কি? তাহার এই অবস্থা! বিশ্বাস না হইলেও একটু নরম সুরে বলিলেন—আচ্ছা ঠাকুর! চণ্ডীপাঠে কি হয়?

সরল-প্রাণ রামেশ্বর বলিলেন—বাবা! যা মানস করিয়া চণ্ডীপাঠ করাইবে—তাহাই সিদ্ধ হইবে। হরেন্দ্রনারায়ণের বড় ছেলের অসুখ—কত বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখেছে, বাঁচবার কোন আশা ছিল না। দুইদিন চণ্ডীপাঠে সে সারিয়া গিয়াছে—উঠিয়া বসিয়াছে।

বিভূতিভূষণ এ সংবাদ আফিস হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলেন; একজন মহাপুরুষের দ্বারা সে কার্য্য হইয়াছে। ইনি যদি তিনি হন, তবে ত' যে সে লোক নহেন! তখন বিভূতি অতি নম্রস্বরে বলিলেন—ঠাকুর! আমার প্রতি একটু দয়া করিবেন কি?

রামেশ্বর বলিলেন—বাবা! আমি অতি সামান্য লোক, আমার দ্বারা তোমার এমন কি উপকার হইতে পারে—যে ক'চ্ছো!

বিভূতি। ঠাকুর! আপনার দ্বারা সব হইতে পারে, যদি দয়া করেন ত' বলি।

রামেশ্বর। বাবা! ক্ষমতায় কুলাইলে অবশ্যই করিব। কি কাজ বলো।

বিভূতি। দেখুন; আমার ভিতরের ঘর সমস্ত তৈয়ারী হ'য়ে গেছে, মনে করিতেছি—একবার চণ্ডীপাঠ করাব, যদি দয়া করেন; এমন লোক ত' আর পাব না, আপনার দেখা পেয়ে আজ ধন্য হ'লাম।

রামেশ্বর বিভূতিভূষণের মনের কথা কিছু বুঝিতে পারিলেন না,

বাহিরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—তার আর বিচিত্র কি? কিছু মানস করিয়া চণ্ডীপাঠ শুনিবে কি?

বিভূতি। আজ্ঞা হ্যাঁ! তা আছে বই কি?

রামেশ্বর। তা বেশ এতে আমি রাজী আছি।

বিভূতি। তবে কবে দয়া ক'র্বেন! আগামী কল্য হ'লে হয় না কি?

রামেশ্বর। তা হবে না কেন, তোমার সময় হইলেই হ'লো, আমার ত' আর আফিস কামাই ক'র্ত্তে হবে না।

বিভূতি। ঠাকুর! তাহা হইলে কাল রবিবার আফিসের ছুটী আছে।

রামেশ্বর। আচ্ছা! তাহাই হইবে, তুমি আয়োজন ক'রে রেখো, আমি প্রাতঃকালেই আসবো!

বিভূতি। আয়োজন কিরূপ করিয়া রাখিব?

রামেশ্বর। আয়োজন আর কি, তুমি হিন্দু, মায়ের পূজার আয়োজন জান না কি? অতিরিক্ত কেবল একটী মঙ্গল ঘট, এই গাছ থেকে একটী ডাব নারিকেল পাড়বে আর একখানি মায়ের শাটী আন্‌বে।

বিভূতিভূষণ নারিকেল বৃক্ষটীর প্রতি একবার চাহিলেন, মনে মনে কি ভাবিলেন। তারপর রৌদ্র একটু পড়িয়া আসিলে রামেশ্বর গৃহাভিমুখী হইলেন, বিভূতিভূষণ প্যাণ্ট-পরিধারী, কাজেই ছেলামের মত বহুকষ্টে একটু নত হইয়া প্রণাম করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ধন-গর্ব্বের পতন।

যাহারা কথার মত কাজ করে, যা বলে কাজে তার একতিল নড়চড় করে না, তাহারাই ত' কর্ম্মযোগী, তাহাদের কথায় এবং কাজেই লোকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কর্ম্মযোগী, পরোপকারপরায়ণ রামেশ্বর বিভূতি-ভূষণের বাটীতে চণ্ডীপাঠ করিবার জন্য কথা দিয়া আসিয়াছিলেন। সেই অনুসারে আজ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান সমাপন করি-লেন। গঙ্গা পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইয়া বিভূতিভূষণের বাটীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ বিরূপাক্ষও সঙ্গে আসিয়াছেন, বহুদিন দাদার কোনও সংবাদ পান নাই, আজ শিবাদহে তাঁহাদের বাটীতে একবার বিরূকে পাঠাইয়া সংবাদ লইবেন। এইজন্য প্রিয় ছাত্র বিরূ পাক্ষকে সঙ্গে আনিয়াছেন।

রামেশ্বর সদানন্দময় পুরুষ, জীবনে কখনও মনমরা হইয়া কালযাপন করেন নাই, সদাই হাস্যানন, প্রাণ সদাই আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর, এইজন্য সুখ-দুঃখ তাঁহার কাছে সমানভাবে পূজিত হয়। একদিনের জন্য সুখ কিম্বা দুঃখ তাঁহার সদানন্দ ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারে নাই!

ঘাটে উঠিয়া বিরূপাক্ষ বলিলেন—আপনার কাজ ত' বেলা পাঁচটার কমে শেষ হইবে না, আমি বড়বাবুর সহিত দেখা করিয়া এই ঘাটে অপেক্ষা করিব, কি আপনার কাছে যাব?

রামেশ্বর বলিলেন—না তুমি ঘাটেই অপেক্ষা কোরো, আমি কোন্

পথ দিয়া আসিব, তাতো বলতে পারি না, যদি দেখা নাই হয়, তুমি এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অপেক্ষা কোরো, ঘাটে আসিয়া দুইজনে একত্র বাটী যাইব। এই বলিয়া বিরূপাক্ষ পূর্ব্বমুখে ও রামেশ্বর উত্তর মুখে রওনা হইলেন। রামেশ্বর কখনও নীরবে পথ চলিতেন না, পাঠক তাহা জানেন, সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল তাই :—

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত।
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে মা, তরে গেলো পাপী কত।
একবার খুলে দে-মা চক্ষের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত'।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

বিভোর প্রাণে গাহিতে গাহিতে ঠিক বেলা আটার সময় বিভূতি-ভূষণের নূতন বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া, বিভূতিভূষণও অতি প্রত্যূষে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রামেশ্বরকে দেখিবামাত্রই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এখন ত' আর সাহেবের বেশ পরা নাই, কাজেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে কষ্ট হইল না।

রামেশ্বরের আদেশমত সমস্তই প্রস্তুত ছিল। অন্দরের একটী নিভৃত কক্ষ পরিস্কার করিয়া তাহাতেই পূজার আয়োজন হইয়াছিল। সাধক আসনে উপবেশন করিয়া দুই তিনবার তারা বলিয়া তার-স্বরে যে ধ্বনি

করিলেন, তাহাতেই সকলের দেহ কণ্টকিত—মন পুলকিত হইল। ভিতর বাটী সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে কাজ হইতেছে। বিভূতির ভাগিনেয় রাজমজুর খাটাইতে লাগিলেন।

রামেশ্বর পূজায় বসিবার পূর্ব্বে বিভূতিকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন এবং পবিত্রচিত্তে আসনে বসিয়া দেবী ভগবতী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে আদেশ দিলেন। বিভূতিভূষণ স্নানান্তে বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। সাধক পূজাদির পর ওঁ তৎসৎ বলিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন, বিভূতিভূষণ সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত—ভক্তিভাবে এই পাঠ শ্রবণ করিলে সকল মনস্কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে, তবে যদি কোন সাধকের দ্বারা মহামায়ার এই মাহাত্ম্য পাঠ করাইয়া শুনিতে পারা যায়, তাহা হইলে ত' কথাই নাই—হাতে হাতে ফল অনিবার্য্য। রামেশ্বর একে সাধক, তায় অবধূত মহাত্মার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কার্য্যে রত, সকল স্থানেই ফল যে শুভজনক হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ?

আজ এক বৎসর হইল, রামেশ্বর যেখানে যেখানে চণ্ডীপাঠ করিয়াছেন, অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাহার ফল লাভ হইয়াছে, মা সিদ্ধেশ্বরী সকল ভক্তেরই মনোবাসনা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামেশ্বরকে সাক্ষাৎ দেবতারূপে পূজা প্রদান করিতেছেন। মায়ের কৃপায় এবং শ্রীগুরুর চরণাশীর্ব্বাদে রামেশ্বরের চণ্ডীপাঠ একবারও ব্যর্থ হয় নাই।

হৃদয় বীণা-নাদ সুরে বাঁধিয়া, তাহার সহিত চণ্ডীর সুর মিলাইয়া পাঠ করিতে পারিলে বনের পশু যখন বশ হয়, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যখন তাহারা তন্ময়ভাবে সে মধুর সুর-সুধা পানে উন্মত্ত হয়, তখন মানুষের

কাণে এ সুর পৌঁছিলে সে ত' গলিয়া যাইবেই, অনবরত দেহ কণ্টকিত হইয়া নয়ন ভক্তি-অশ্রু-প্লাবিত হইবেই ত'?

রামেশ্বর মাতৃভাবে বিভোর হইয়া, প্রাণের সুরে সুর মিলাইয়া তদ্গত চিত্তে শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য পাঠ করিতে লাগিলেন। সে মধুর সুর যতদূর বিস্তৃত হইল—তথাকার বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র—পৃথিবী পবিত্রাদপি পবিত্র ভাব ধারণ করিল। সাধকের বাহ্যজ্ঞান নাই—প্রাণভরা মাতৃনামে তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন, আর বিভূতিভূষণ যত বুঝুন আর নাই বুঝুন, সেই পবিত্র স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে করযোড়ে বসিয়া আছেন, এমন মনোমোহন সুর, মাতৃনামের এমন পবিত্র স্বরলহরী তিনি জীবনে কখনও শ্রবণ করেন নাই।

তখন বেলা প্রায় একটা, নিদাঘ মধ্যাহ্নের দারুণ রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, গাছের একটী পাতাও নড়ে নাই—বৈশাখের প্রকৃতি বিষম গুমোট ভাব ধারণ করিয়া জীব-জীবনে ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। চাতক ফটিক জল, ফটিক জল করিয়া অস্থির, তথাপি আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই। চারিদিক যেন দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন সময় মড় মড় করিয়া বাহিরে কি একটা পতনের ভীষণ শব্দ হইল। বিভূতি কাঁপিয়া উঠিলেন, সিদ্ধাসনে সাধক কিন্তু তন্ময়, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই; এখন গাত্রে অগ্নিস্পর্শ হইলেও বোধ হয়—তাঁহার সেই বিভোর ভাব তিরোহিত হইবে না, এমনি মনেপ্রাণে ঐক্য করিয়া রামেশ্বর মাতৃমহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। পশ্চাতে শ্রোতা বিভূতিভূষণ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন, যত বিভোর না হইলেও প্রাণ যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঠিক সেই সময়ে বিভূতির ভাগিনেয় আসিয়া অতি সন্তর্পণে মামার কাণে বলিল—মামা! গাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিভূতির হৃদয়

করিলেন, তাহাতেই সকলের দেহ কণ্টকিত—মন পুলকিত হইল। ভিতর বাটী সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে কাজ হইতেছে। বিভূতির ভাগিনেয় রাজমজুর খাটাইতে লাগিলেন।

রামেশ্বর পূজায় বসিবার পূর্ব্বে বিভূতিকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন এবং পবিত্রচিত্তে আসনে বসিয়া দেবী ভগবতী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে আদেশ দিলেন। বিভূতিভূষণ স্নানান্তে বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। সাধক পূজাদির পর ওঁ তৎসৎ বলিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন, বিভূতিভূষণ সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত—ভক্তিভাবে এই পাঠ শ্রবণ করিলে সকল মনস্কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে, তবে যদি কোন সাধকের দ্বারা মহামায়ার এই মাহাত্ম্য পাঠ করাইয়া শুনিতে পারা যায়, তাহা হইলে ত' কথাই নাই—হাতে হাতে ফল অনিবার্য্য। রামেশ্বর একে সাধক, তায় অবধূত মহাত্মার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কার্য্যে রত, সকল স্থানেই ফল যে শুভজনক হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ?

আজ এক বৎসর হইল, রামেশ্বর যেখানে যেখানে চণ্ডীপাঠ করিয়া-ছেন, অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাহার ফল লাভ হইয়াছে, মা সিদ্ধেশ্বরী সকল ভক্তেরই মনোবাসনা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামেশ্বরকে সাক্ষাৎ দেবতারূপে পূজা প্রদান করিতেছেন। মায়ের কৃপায় এবং শ্রীগুরুর চরণাশীর্ব্বাদে রামেশ্বরের চণ্ডীপাঠ একবারও ব্যর্থ হয় নাই।

হৃদয় বীণা-নাদ সুরে বাঁধিয়া, তাহার সহিত চণ্ডীর সুর মিলাইয়া পাঠ করিতে পারিলে বনের পশু যখন বশ হয়, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যখন তাহারা তন্ময়ভাবে সে মধুর সুর-সুধা পানে উন্মত্ত হয়, তখন মানুষের

কাণে এ স্বর পৌঁছিলে সে ত' গলিয়া যাইবেই, অনবরত দেহ কণ্টকিত হইয়া নয়ন ভক্তি-অশ্রু-প্লাবিত হইবেই ত'?

রামেশ্বর মাতৃভাবে বিভোর হইয়া, প্রাণের স্বরে স্বর মিলাইয়া তদ্গত চিত্তে শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য পাঠ করিতে লাগিলেন। সে মধুর স্বর যতদূর বিস্তৃত হইল—তথাকার বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র—পৃথিবী পবিত্রাদপি পবিত্র ভাব ধারণ করিল। সাধকের বাহ্যজ্ঞান নাই—প্রাণভরা মাতৃনামে তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন, আর বিভূতিভূষণ যত বুঝুন আর নাই বুঝুন, সেই পবিত্র স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে করযোড়ে বসিয়া আছেন, এমন মনোমোহন স্বর, মাতৃনামের এমন পবিত্র স্বরলহরী তিনি জীবনে কখনও শ্রবণ করেন নাই।

তখন বেলা প্রায় একটা, নিদাঘ মধ্যাহ্নের দারুণ রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, গাছের একটী পাতাও নড়ে নাই—বৈশাখের প্রকৃতি বিষম গুমোট ভাব ধারণ করিয়া জীব-জীবনে ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। চাতক ফটিক জল, ফটিক জল করিয়া অস্থির, তথাপি আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই। চারিদিক যেন দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন সময় মড় মড় করিয়া বাহিরে কি একটা পতনের ভীষণ শব্দ হইল। বিভূতি কাঁপিয়া উঠিলেন, সিদ্ধাসনে সাধক কিন্তু তন্ময়, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই; এখন গাত্রে অগ্নিস্পর্শ হইলেও বোধ হয়—তাঁহার সেই বিভোর ভাব তিরোহিত হইবে না, এমনি মনেপ্রাণে ঐক্য করিয়া রামেশ্বর মাতৃমহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। পশ্চাতে শ্রোতা বিভূতিভূষণ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন, যত বিভোর না হইলেও প্রাণ যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঠিক সেই সময়ে বিভূতির ভাগিনেয় আসিয়া অতি সন্তর্পণে মামার কাণে বলিল—মামা! গাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিভূতির হৃদয়

স্তম্ভিত—দেহ কণ্টকিত, অত্যাশ্চর্য্য ভাবে তীব্র আগ্রহের সহিত বাধা দিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন, পাছে সাধকের সাধন-কার্য্যে কোন ব্যাঘাত হয়। ভাগিনেয় হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রামেশ্বরের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই—বরং পুঁথি যত অগ্রসর হইতেছে, হৃদয়ে দেবীমাহাত্ম্য তত গাঢ়তর রূপে অঙ্কিত হইতেছে, ততই তিনি আত্মহারা হইয়া দেবীর নাম-সাগরে ভাসাইয়া যাইতেছেন। সম্পূর্ণরূপে সাধক যখন মাতৃপদে সর্ব্বস্ব দান করে—তখন তাহার নিজস্ব কিছু থাকে না, কাজেই বাহিরের কিছু তাহার ঐকান্তিকতায় বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হয় না।

বিভূতিভূষণ থতমত খাইয়া গিয়াছেন—তাহার প্রাণে যে কি ভাব জাগিয়াছে, তাহা তিনিই জানেন, মনে মনে করিতেছেন—এই পোষাক-পরিচ্ছদ-বিহীন ব্রাহ্মণ ত' অতি দরিদ্র দেখিতেছি কিন্তু ইহার ক্ষমতা ত' অতুলনীয়, ইনি চণ্ডীপাঠের বলে মনে করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাইত করিতে পারেন—ওঃ! চণ্ডীপাঠের কি মহিমা, ব্রাহ্মণের কি অতুলনীয় শক্তি!

বেলা চারিটার সময় চণ্ডীপাঠ শেষ হইল। সাধক অচ্ছিদ্রাবধারণ করত পুঁথিখানি বন্ধন করিয়া মায়ের আরত্রিক কার্য্য শেষ করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন। বিভূতিভূষণ চণ্ডিকার পদে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইলেন। রামেশ্বর হাসিমুখে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন—গৃহে যাইবার জন্ম উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বিভূতি-ভূষণ! তুমি যে কামনা করিয়া চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিলে—তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক ফল লাভের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে কি?

বিভূতিভূষণ চণ্ডীপাঠের মহিমা ও ব্রাহ্মণের সাধন-শক্তি দেখিয়া

স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি তটস্থ হইয়া করযোড়ে বলিলেন—ঠাকুর! আপনার ন্যায় সাধকাগ্রগণ্য মহাত্মা যার উপকার করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন—তাহার মনস্কামনা কি অসিদ্ধ থাকিতে পারে? যাহা হউক, দয়া করিয়া যদি এত করিলেন—তবে একটু বসুন—কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কৃতার্থ করুন।

রামেশ্বর বলিলেন—আমার জলযোগের এখনও সময় হয় নাই—, বাড়ীতে পূজা না সারিয়া জলযোগ করা হইবে না। এখন তুমি বল—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে কি না—তাহা হইলেই আমি প্রফুল্ল মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারি।

বিভূতি বলিল—ঠাকুর! তা কি হয়—সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রলেন, একটু জলযোগ না করিয়া এতটা পথ যাওয়া কি সঙ্গত?

রামেশ্বর। বাবা! এরূপ হাড়াভাঙ্গা পরিশ্রম আমরা প্রত্যহ ক'রে থাকি, ইহা আমাদের সহ্য আছে, আমরা ত' আর শোলার পুতুল নই যে, মাতৃনাম করিয়া পরিশ্রমের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল—এ সকল আমাদের নিত্যকর্ম্ম; এ সকল মোক্ষকার্য্যে ব্রাহ্মণ কখনও শ্রান্তি বোধ করে না; যেদিন তাহা করিবে—সেদিন হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে—সমাজে অধর্ম্মের করাল ছায়া পতিত হইয়া দেশ নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার সে বিষয় কোন চিন্তা নাই। আমি এইরূপই করিয়া থাকি। তাহার জন্য কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি না, এক্ষণে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে কিনা বল? বেলা যাইতেছে, আমি আর দেরি করিব না।

বিভূতি বলিল—আজ্ঞা হাঁ! আপনার কৃপায় আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে, আমি ধন্য হ'য়েছি; চণ্ডীপাঠের ক্ষমতা যে এতদূর—তাহা আজ জান্‌লাম।

রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—মনের সঙ্কল্প বা বাসনা যতক্ষণ সিদ্ধ

না হয়—ততক্ষণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন কি মানস করিয়াছিলে, বলিলে দোষ হইবে না।

বিভূতিভূষণ তখন করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—দাসের বাস করিবার বাটী-ঘর কিছুই ছিল না, এতদিন বহুকষ্টে কাল কাটাইতেছিলাম, এক্ষণে আপনাদের কৃপায় এই বাড়ীখানি তৈয়ারী করিতেছি, ভিতরের মহল সমস্ত সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; বাহিরের মহলটী প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু উহার মাঝখানে ঐ নারিকেল গাছটী থাকায় চকের ঘরখানি প্রস্তুত হইতেছিল না, ফলে ফুলে গাছটীকে কাটিতেও পারি না, কারণ নারিকেল গাছ কাটীতে নাই—লোকের মুখে শুনিয়াছি। আর উহা ঘরের মধ্যে রাখিলে এত টাকা খরচ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণও বৃথা হয়—কোন বাহারই হয় না। মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল। তাই আজ উহার বিনাশ-সাধনের সঙ্কল্প করিয়া আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইলাম। আপনার অপূর্ব্ব সাধনশক্তিবলে এবং চণ্ডীপাঠ-মাহাত্ম্যে কিয়ৎক্ষণ হইল গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আপনার অতুলনীয় ক্ষমতা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।

এই কথা শুনিয়া রাগে রামেশ্বরের আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল—তিনি রাগে হুতাশন-সম জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি পাষণ্ড! এই শুভ বৈশাখ মাসের দিনে আমার দ্বারা ব্রহ্মহত্যা করাইলি! গাছের মধ্যে নারিকেল গাছ যে ব্রাহ্মণ, এইজন্য উহাকে কাটিতে নাই—শাস্ত্রের নিষেধ। তুই জানিয়া শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া আনিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত করাইলি? হাঁরে হতভাগ্য! এত নীচ প্রবৃত্তি কেন? আজ যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করতিস্, তাহা হইলে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় যে আজ তোর সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্ণপ্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া তোকে রাজা করিয়া দিত। তোর যেরূপ নীচ নজর, মায়ের নামে প্রাণে উচ্চাশার

সঞ্চার না হইয়া যখন হীনবৃত্তি চরিতার্থ করিবার তোর এত আশা এবং সেইজন্য একজন নিরীহ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে একটী মহাপাপে লিপ্ত করিবার জন্য যখন এত বাসনা, তখন এ কার্য্যে তোর শুভ হওয়া সম্ভবপর নয়!

এই বলিয়া রামেশ্বর তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন। বিভূতি কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। দ্বিজজাতি রাগিয়া যেমন অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া যান, মিনতি করিলে তেমান জলের মত শীতল হইতেও তাঁহাদের বেশীক্ষণ লাগে না, তাঁহারা এমনি ক্ষমাময়, তাঁহাদের প্রাণ এত দয়ার আধার। বিভূতি যখন কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিতে লাগিল, তখন রামেশ্বর বলিলেন—এ সকল কাজে বংশ থাকে না। যে কার্য্য করিয়াছ—তাহাতে নির্ব্বংশ হইবারই কথা, তবে যখন না বুঝিয়া অর্থমদে মত্ত হইয়া এ কার্য্য করিয়াছ, তখন আর উপায় কি? এক্ষণে সে বিষয়ে তোমার কোন ব্যাঘাত হইবে না, প্রাণে প্রাণে সকলে জীবিত থাকিবে কিন্তু তোমার ধনের অহঙ্কার আর থাকিবে না! এই বলিয়া রামেশ্বর আর দাঁড়াইলেন না; দ্রুতপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ঘাটে আসিয়া দেখিলেন—বিরূপাক্ষ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রামেশ্বর সাগ্রহে দাদার, বৌদিদির ও ভবানীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিরূপাক্ষ বলিলেন—কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, সে বাড়ীতে চাবি দেওয়া—কেহই নাই। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তিনি অফিসের কাজে হাজারিবাগে বদলী হইয়া গিয়াছেন। মহিম বাবু এখানে আছেন কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন—কোথায় যান, কখন আসেন—তাহা কেহ বলিতে পারে না। রামেশ্বর বড় আশা করিয়াছিলেন—আজ দাদার সংবাদ পাইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। সমস্তই মায়ের ইচ্ছা ভাবিয়া দুইজনে নৌকা পার হইয়া গৃহে আগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উদারতা।

বিভূতিভূষণের অদৃষ্ট-চিন্তা করিয়া কোমল-প্রাণ রামেশ্বরের মন বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। মা! তোমার অবুঝ ছেলে না বুঝিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে দয়া কর। বাড়ীতে আসিয়া ইষ্টদেবতার পূজাদি সমাপন করিয়া রামেশ্বর সেদিন আর নিদ্রা যাইলেন না। বিভূতিভূষণের জন্য, প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষনাশে সে যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন— তাহার জন্য একাগ্রমনে দুই সহস্র জপের সঙ্কল্প করিলেন। "জপাৎ সিদ্ধিঃ" ইহাতে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়—জপের ফল অবশ্যম্ভাবী! নিজের যাহা হয় হউক, ছোঁড়াটা ধনেপ্রাণে মারা না যায়, অর্থের মোহে না হয় একটা পাপ কাজই করিয়া ফেলিয়াছে।

নারিকেল বৃক্ষ-নাশের ফলশ্রুতি শুনিয়া বিভূতির প্রাণ বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় তাহার বিশুষ্ক বদন দেখিয়া রামেশ্বরের প্রাণে মায়ার সঞ্চার হইয়াছিল। ধার্ম্মিক-প্রাণ একজনের অশুভ দেখিলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। টাকা যাক আর থাক, এখন ছোঁড়াটা ছেলে-পিলে নিয়ে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে হয়। এই জন্য তিনি আজ জপে বসিয়াছেন, প্রাণের ডাকে মাকে উদ্বোধিত করিয়া বিভূতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনার যাহা হয় হউক, বিভূতির যেন কিছু না হয়, মা! ধর্ম্মকর্ম্মে সে এই নূতন মন দিয়াছে; এই সময় দাগা পাইলে—সে আর ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই মানিবে না—মা! তোমার সই অবুঝ ছেলেকে রক্ষা কর, তবে দর্পহারিণী তুমি—তার অর্থের দর্প-

তেজ ভাঙ্গিয়া দাও কিন্তু প্রাণে মেরো না, এই ক'রো মা! বলিয়া রামেশ্বর সমস্ত রাত্রি বিভূতির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহাপ্রাণ রামেশ্বরের প্রাণ চিরদিনই পরের জন্য এমনি ব্যাকুল! নিজের যাহাই হউক পরে ভাল থাকিলেই তিনি সুখী—ইহাই মহাপ্রাণতার চরম দৃষ্টান্ত।

শুনা যায়—এক বৎসরের মধ্যে বিভূতির চুরী ধরা পড়িয়া চাকুরীতে জবাব হইয়াছিল, তারপর ঐ বাড়ী আর প্রস্তুত করিতে হয় নাই; উহা বিক্রয় করিয়া পরিজন সহ প্রাণে প্রাণে একপ্রকার বাঁচিয়া আছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ত' মানুষ ভোগ করেই—ইহজীবনের কর্ম্মফলেও উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইয়া সময়ে সময়ে মানুষকে অশেষ কষ্ট পাইতে হয়। বিভূতিভূষণ জীবনে আর উন্নতি করিতে পারে নাই, তবে রামেশ্বরের ন্যায় সরল-হৃদয় সাধকের কৃপায় তাঁহার সংসারের কাহাকেও অকালমৃত্যুর কবলে পড়িয়া ইহসংসার ত্যাগ করিতে হয় নাই।

রামেশ্বর পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। এমন সময় তাঁহার প্রিয়-শিষ্য ডেপুটী অনাথশরণের ভৃত্যের সহিত পথে দেখা হইল। সে রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র হাতে দিল এবং বলিল—কর্ত্তামশাই আজ একবার দয়া করিয়া তাঁর বাটীতে পায়ের ধূলা দিতে বলিয়াছেন। আচ্ছা, তুমি এখন বাটীতে এস, পূজাহ্নিক সারিয়া যাহা হয় করিব—বলিয়া রামেশ্বর অগ্রসর হইলেন—ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

বাড়ী গিয়া হস্ত-পদ ধুইয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। অনাথশরণ লিখিতেছেন—গুরুদেব! আজ আপনার একজন ভীষণ শত্রু বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে—সে মহিমচন্দ্র, এখন তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি; আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া, মিছামিছি

আপনার নামে নালিশ করিয়া, টাকা ফাঁকি দিয়া, দুর্বৃত্ত এবার যে বিপদজালে পড়িয়াছে, বোধ হয় এ যাত্রা তাহার আর উদ্ধার নাই। সে খুনের দায়ে জড়িত; মোকর্দ্দমা আমারই নিকট হইতেছে, তাহার তদ্বির করিবার কেহ নাই—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; এক্ষণে আপনার দাদা কোথায়! বিনা তদ্বিরে বেচারা কি সত্যসত্যই ফাঁসিকাটে ঝুলিবে? এইজন্য আপনাকে জানাইলাম। বহুদিন চরণ-দর্শন পাই নাই—অন্ত একবার দয়া করিয়া আসিলে—ভাল হয়।

পত্র পাঠ করিয়া রামেশ্বর কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহিম যে তাঁহার সহিত শক্রতা করিয়াছিল, তাঁহার ঘোর অপমান করিয়াছিল— সে সকল কথা রামেশ্বরের আদৌ মনে নাই এবং সেজন্য সে বিপদে পড়ুক—সাধুস্বভাব রামেশ্বরের তাহা ইচ্ছা নহে। মহিম তাঁহার একজন আত্মীয়, খুনের দায়ে পড়িয়াছে, বিনা তদ্বিরে ফাঁসি যাইবে, তাহাও কি কখন হয়? বাটীর সকলে শুনিলেন—নির্ম্মলা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। মহিম ফাঁসি গেলে সকলেই বলিবে—ঐগো, অমুকের সম্বন্ধীর ফাঁসী হইল—এ অপমান রাখিবার জায়গা নাই। দোষী হয়, সাজা পাক—কিন্তু বাস্তবিক যদি দোষী না হয়, আর বিনা তদ্বিরে তাহার জীবন নষ্ট হয়—তাহা হইলে কম কষ্টের কথা নহে।

পতিপত্নীতে তখন বিচলিত হইয়া একপ্রকার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। রামেশ্বরের প্রাণ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি চারিটী আহার করিয়া লইলেন এবং ভৃত্যটীকে খাওয়াইলেন। তারপর তড়িৎকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটীর বাটী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তড়িৎ শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—ছোটবাবু! সেদিনকার কথা কি মনে নাই। হতভাগা আপনাকে কি বিপদে ফেলিয়াছিল—কিরূপ অপমান করিয়াছিল। আপনি যান—আমি আর সে হতভাগাটার মুখ দেখিব না।

মামলা-মোকর্দ্দমায় তড়িৎ খুব পাকা লোক, তাহাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে কোন কাজই হইবে না। অতএব রামেশ্বর বলিলেন—তড়িৎ, সে না বুঝিয়া যদিই একটা খারাপ কাজ ক'রে থাকে—তাহা হ'লে কি এমন বিপদে তাকে রক্ষা ক'র্ত্তে হবে না? চল যাই দেখি, মা কি করেন?

ছোটবাবুর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় তড়িৎ আজীবন পাইয়া আসিয়াছে, আজ নূতন নহে। শত্রুকে মিত্রের মত দেখা রামেশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার প্রতি ঘোরতর শত্রুতাচরণ করিলেও তিনি ভুলেও একদিনের জন্য তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। রামেশ্বর যে মহিমের এ বিপদ শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন না, তাহা ঠিক, তবে এখন প্রাণের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি কোথায় গেলো? তড়িৎ আর কোনও কথা বলিলেন না, রহস্যটা বুঝিবার জন্য, মহিম কি মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তড়িৎ ছোটবাবুর পশ্চাদনুসরণ করিল।

সেদিন রবিবার—অনাথশরণ বাটীতেই আছেন; রামেশ্বর বৈকালে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটী গুরুদেবকে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। রামেশ্বর নিজের কুশল প্রদান পূর্ব্বক তাহার বাটীর সকলে কে কেমন আছে—কাজকর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আসনোপবিষ্ট হইলে ডেপুটী মহিমের গুণের কথা সমস্ত বলিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর মহিমের জন্য মহাচিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রিয়-শিষ্য ডেপুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি সে সত্যসত্যই দোষী না হয়, কেবল অর্থের অভাবে বা বিনা তদ্বিরে মারা যাইবে? তুমি তাহার এজাহার লইয়া কিরূপ বুঝিলে? ডেপুটী বলিলেন—মহিম যে খুবই

করিয়াছে তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই, বোধ হয় ষড়যন্ত্রে পড়িয়া কোন শত্রুপক্ষের দ্বারা এইরূপ হইয়াছে, তাহার মত লোকের শত্রুর ত' অভাব নাই? সে যখন আপনার ন্যায় লোককে বিপদে ফেল্‌তে চায়, তখন দর্পহারী তাহার এ দর্প রাখিবেন কেন? এইজন্য তাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছেন, যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমি দেখিয়া শুনিয়া তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়া দিয়াছি।

রামেশ্বর। বাবা! সে যে আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, সেজন্য আমি দুঃখিত নহি। এক্ষণে সে যদি পাপী না হয়, তাহা হইলে বিনা তদ্বিরে ফাঁসি যাইবে—এর কি কোনও উপায় নাই?

ডেপুটী। অর্থব্যয় ও তদ্বির করিয়া দেখিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারে।

রামেশ্বর। আচ্ছা, বাবা! তবে তুমি তড়িৎকে সমস্ত বুঝাইয়া কিরূপ তদ্বির করিতে হইবে বলিয়া দাও, টাকা খরচের জন্য ভাবনা নাই। একটা নিরীহ জীবের জীবন রক্ষার জন্য না হয় কিছু টাকা খরচ হইবে।

অনাথশরণ গুরুদেবের স্বভাব জানিতেন। তাঁহার ন্যায় পর-দুঃখ-কাতর মহাত্মা কি আর জন্মায়! পরের হিতসাধনের জন্য নিজের সমূহ ক্ষতি করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ; কিন্তু নির্দ্দোষী ধার্ম্মিকের জন্য তিনি এইরূপই করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রাণ এত উদার, এত মহান্ মন এত উচ্চ।

শীঘ্রই দায়রার বিচার আরম্ভ হইবে। আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তড়িৎ একদিন গোপনে মহিমের সহিত হাজতে দেখা করিয়া সমস্ত সন্ধান লইলেন। তাহার পক্ষে কেহ নাই; বিনাদোষে তাহাকে ফাঁসি যাইতে হইতেছে, দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে ছোটবাবু তড়িৎকে লইয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিতেছেন দেখিয়া কৃতজ্ঞতার

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সে তড়িৎকে সমস্ত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। মহিম বলিল—বড় ভট্টচার্জী মহাশয় যখন বদলী হইয়া হাজারীবাগ গমন করেন—তখন আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক বলিয়াছিলেন কিন্তু আমার কি দুর্ম্মতি হইল, আমি কিছুতেই তাঁহাদের সহিত গেলাম না।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার পাটের বড় মহাজন বৃন্দাবন বাবুর ছেলে রামকমলের সহিত আমার আলাপ হয়, এতদিন তাহার সহিতই বাবুয়ানা, ইয়ারকী করিয়া বেড়াইতাম—বাসায় প্রায়ই যাইতাম না। যে স্ত্রীলোকটী খুন হইয়াছে, সে আমাকে বড়ই ভালবাসিত—আমি প্রায়ই তাহার বাড়ীতে থাকিতাম, বাসায় যাওয়া প্রায়ই হইত না। রামকমল আমার সহিত তথায় যাইত এবং তাহাকে হাত করিবার জন্য সে অত্যন্ত চেষ্টা করিত, আমার অসাক্ষাতে আসিয়া তাহাকে বিস্তর টাকা দিত কিন্তু তথাপি সে আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া এবং টাকা দেওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতি বিরক্তিভাব দেখিয়া, সে আমাকে ঐস্থানে যাইতে নিষেধ করে কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িতে পারিলাম না। একদিন আমি মনোহরপুরে আমার বাটী বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহের জন্য গিয়াছি। পর দিন রাত্রে আসিব—এইরূপ কথা ছিল। ইত্যবসরে রামকমল সদলবলে আসিয়া সেইদিন রাত্রে উহার বাড়ীতে আড্ডা গাড়ে, প্রচুর পরিমাণে সকলে মদ খায়। যখন রাত্রি একটা, আমি আসিয়া দেখি, বাড়ীর মধ্যে কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। ঝি-টী দোকান হইতে খাবার আনিতে গিয়াছে। এদিকে আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম—স্ত্রীলোকটী গোঁ গোঁ করিতেছে, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। রামকমল আমাকে দেখিয়া মহিম মোহিনীকে খুন করিলে গো, খুন করিলে গো বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীগণ আমার কাপড়ে

জামায় রক্ত মাখাইয়া দিয়া পলায়ন করিল। তখন ঝি বাটীর মধ্যে আসিতেছিল, রামকমল তাহাকে বলিল—মহিম আসিয়া মোহিনীর ঘরে আমাদের দেখিয়া রাগে তাহার গলায় ছোরায় এক চোপ দিয়াছে; দেখ্‌গে যা—বোধ হয় সে এতক্ষণ পঞ্চত্ব পেয়েছে। সেও তখন চীৎকার করিয়া খুন খুন করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম, তারপর পাড়ার লোকজন ও পুলীশ আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল। তড়িৎ ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়, আমি নিষ্পাপ, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে বোধ হয় আমাকে ফাঁসীকাটে ঝুলিতে হইল এই বলিয়া সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—কি ঝকমারী ক'রেই আমি দিদির সঙ্গে যাই নাই, তাহা হইলে আমায় আর এ বিপদে প'ড়তে হ'তো না।

তড়িৎ অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহার খণ্ডন করিবে কে? তুমি কাহারও নিকট খুন করিয়াছ, বলিয়া স্বীকার কর নাই ত'?

মহিম। অনেক চেষ্টা, অনেক মারামারি করিয়াছে, তথাপি আমি এজাহারে কোথাও স্বীকার করি নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া তড়িৎ চলিয়া আসিল। অনাথশরণ ডেপুটী হইলেও গুরুর শিষ্য ত' বটেন? তিনিও অনুমান করিয়াছিলেন—মহিম ষড়যন্ত্রে পড়িয়া এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারও দয়া হইল। তড়িৎকে মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে বলিয়া এবং খরচের জন্য ভাবনা নাই বলিয়া রামেশ্বর দেবীপুর গমন করিলেন। তড়িৎ খুব পাকা লোক, অতীব বুদ্ধিমত্তার সহিত ইহাতে যোগদান করিল, তাহার দুঃখ হইল, বাস্তবিক একটা ব্রাহ্মণের ছেলে, বিনাদোষে প্রাণ হারাইবে, না হয় দুষ্ট-চরিত্র কিন্তু খুন করিল একজন, আর প্রাণ যাবে আর একজনের? দেখা যাক ভগবান্ কি করেন।

জগতে অর্থে কিনা হয়, তড়িৎ প্রথমতঃ অতি গোপনে মোহিনীর বাটীর দিকে হাত করিল। তাহার নিকট বৃন্দাবনের বাটির ঠিকানা লইয়া ছদ্মবেশে তথায় সন্ধান হইল—রামকমল কোথায়! রামকমল কলিকাতায় নাই জানিতে পারিয়া, তাহার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল। হঠাৎ দেশত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? মোহিনীর বাটীর দাসীও বলিয়াছে, সে মহিমবাবুকে খুন করিতে দেখে নাই। যখন সে খাবার আনিতে যায়, তখন তিনি আসেন নাই, কেবল রামকমল ও তাহার বন্ধুগণই ছিল। তার পরদিন তড়িৎ মনোহরপুরের কাছারীতে গিয়া, মহিম যে খুনের দিন বৈকাল বেলা জমি রেজেষ্টী করিয়া বিক্রয় করিয়াছে, তাহার নকল লইয়া চলিয়া আসিল।

আদালতে মোকর্দ্দমা উঠিবার পূর্ব্বে তড়িৎ উকীলগণের নিকট ঐ সকল নজীর উপস্থিত করিল। তাহারা সকলেই তদ্বিরকারক তড়িতের প্রশংসা করিয়া বলিল—এবার আর কোন ভয় নাই, আসামী বেকসুর খালাস হইবে। মশাই! তদ্বির না করিলে কি মোকর্দ্দমা জিতিতে পারা যায়? তড়িৎ উকীলদের মুখে শুনিল—মহিম ইহার মধ্যে প্রাণের দায়ে প্রায় চারি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই, পরের হাতে টাকা পড়িলে—এইরূপই হয়। এখন তাহার হাতে আর টাকা নাই, আর তদ্বির করিবার পাকা লোকও নাই! গোড়ায় আপনার মত লোক জুটিলে কি আর সে দায়রা সোপর্দ্দ হইত?

বাস্তবিক দায়রা আদালতে প্রথম দিন মোকর্দ্দমা উঠিলে জজ সাহেব উকীলগণের সওয়াল জবাব শুনিয়া অনেকটা সন্দেহই করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তড়িতের সংগৃহীত নথী পত্র প্রদান মাত্রেই হাকিম মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া মহিমকে বেকসুর খালাস দিলেন। কারণ মনোহরপুর কলিকাতা হইতে অনেক দূর, সেখান হইতে এত শীঘ্র আসিয়া

একজনকে খুন করা অসম্ভব। আর অন্য প্রমাণ পত্র কিছু নাই। তারপর রামকমলের নামে ওয়ারেন্ট বাহিরের হুকুম দিয়া জজ সাহেব সেদিনকার মত আদালত ত্যাগ করিলেন।

মহিম বেকসুর খালাস হইয়া বাহিরে আসিল, তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ যথেষ্ট হইয়াছে, এইবার সে যাহাতে ঐ বদ্ অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত থাকে, তড়িৎ তাহার জন্য বিশেষ উপদেশ দিল। কিন্তু প্রাণ যাহার পাপে একবার লিপ্ত হইয়াছে, মদ ও বেশ্যার নেশা যাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে, সে যে একেবারে তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে—তাহা ত' বিশ্বাস হয় না। তবে উপস্থিত সে ছোটবাবুর নিকট ও তড়িতের নিকট যারপরনাই কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল—তড়িৎ! বিপদেই আপন পর চিনিতে পারা যায়। এই বিপদে যদি ছোটবাবু টাকা খরচ না ক'র্ত্তেন আর তুমি যদি আমার হ'য়ে তদ্বির না ক'র্ত্তে, তা হ'লে এ যাত্রা কিছুতেই আমার প্রাণ বাঁচতো না। যাহা হউক ভগবান তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

তড়িৎ বলিল—চলনা মহিম। আর কল্‌কাতায় কেন, দেবীপুরে ছোটবাবুর কাছে থাক্‌বে। সে সাধুপুরুষের কাছে থাক্‌লে তোমার চরিত্রও শুধরে যাবে, আর খাওয়া পরারও কষ্ট হবে না।

মহিম মনে মনে কি ভাবিল—সতী নির্ম্মলা ও সরলচিত্ত রামেশ্বর তাহার প্রতি সদয় হইলেও সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? সে যে চিরকাল তাহাদের শত্রুতা করিয়াছে। তড়িৎকে বলিল—দেখ তড়িৎ! কিছুদিন পূর্ব্বে হাজারীবাগে মায়ের বড় ব্যায়রাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এই বিপদে পড়িয়া যাওয়া হয় নাই—তাঁর জন্য মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে—আমি আজিই তথায় যাইব। তুমি ছোটবাবুকে আমার কোটী কোটী নমস্কার জানাইও, আর তোমাকে কি বল্‌বো, যে পরিশ্রম করিয়াছ—

তাহার পুরস্কার জগতে নাই। সেখান হইতে আসিয়া একদিন দেখা করিব। এই বলিয়া মহিম আর দাঁড়াইল না—সন্ধ্যাকালে কলিকাতার কোলাহলপূর্ণ কোলে কোথায় মিশিয়া গেল।

রামেশ্বর প্রত্যুপকার প্রার্থনা করেন না—তিনি উপকার করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করেন। তড়িৎও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া এইরূপ মহাভাবের আভাস পাইয়াছিল। সেও এতদিনের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইয়াছে; এমন একটা বিষম কাজে কৃতকার্য্য হইয়াছে দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেদিন কলিকাতায় ডেপুটার ভবনে অবস্থান করিল। অনাথশরণ তড়িতের মোকদ্দমা চালাইবার কৌশল দেখিয়া খুব তারিফ করিয়া বলিলেন—তড়িৎ! তুমি এ বিষয়ে খুব পাকা বটে।

পরদিন আহারাদি করিয়া তড়িৎ দেবীপুরে মোকদ্দমা জয়ের সংবাদ দিলেন রামেশ্বর আসিয়া অবধি মায়ের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া কেবল মহিমের মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। ছেলের আবদার মা শুনিয়াছেন —মহিম বেকসুর খালাস হইয়াছে. শুনিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে আনন্দময়ীর ধ্যানে বসিলেন। মিত্রের জন্য ত্যাগস্বীকারে মহত্ত্ব কোথায়! শত্রুকে মিত্র বলিয়া ভাবা, তাহার জন্য অকাতরে ত্যাগস্বীকারই মহাপুরুষের লক্ষণ! রামেশ্বর মহিমের এই মোকদ্দমায় অকাতরে প্রায় হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

— —

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উপনয়ন।

ইহার পর প্রায় সাত আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। চণ্ডী-সিদ্ধ রামেশ্বর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে চণ্ডীপাঠে কত লোকের কত উপকার করিয়া গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তবে এমন করিয়া আর কতকাল কাটিবে? এইবার প্রিয় পুত্রের উপনয়ন দিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইবার মনস্থ করিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া না আসিলে ত' গুরুদেবের প্রধান আদেশ প্রতিপালন করা হইবে না; তিনি যে বলিয়াছিলেন—সাধকত্ব লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গমস্থল হিন্দুর যাবতীয় তীর্থ সকল একবার ভ্রমণ করিয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য. বয়স হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে কর্ত্তব্য প্রতি-পালন হইল কই? ইহা প্রতিপালন না করিলে প্রভু ত' দেখা দিবেন না, আমার শেষ-জীবনের কার্য্য মাতৃ-দর্শনের উপায় ত' বলিয়া দিবেন না। কতকাল আর মাতৃহারা হইয়া ভব-ঘোরে এইরূপ করিয়া বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইব?

রামেশ্বরের পুত্র ভবানন্দ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া শেঠের কোলে এখন নয় বৎসর পদার্পণ করিয়াছে। এতাবৎকাল আর তাঁহাদের কোন পুত্রাদি হয় নাই। রামেশ্বর ও নির্ম্মলার ইহাই প্রথম ও শেষ ফল, বোধ হয় আর কোনও পুত্রাদি তাঁহাদের হইবে না। বহু তপস্যার ফলে যে এ মধুময় ফলটি দেব-আশীর্ব্বাদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে!

যে বৃক্ষে ফল অল্প হয়, তাহাই সুন্দর ও সুস্বাদু, বেশী হইলে সবগুলি সমান হয় না, অকালে নষ্ট হয় এবং কটু তিক্ত প্রভৃতি নানা আস্বাদযুক্ত হইয়া রসনার অতৃপ্তিকর হইয়া পড়ে। কিন্তু এখানে তার আর ভাবনা নাই।

ভবানন্দকে যে দেখে সেই ভালবাসে—তাহাকে কোলে করিয়া কত আদর করে, বুঝি এমন ননীর পুতুল, গুণের আকর, সৌন্দর্য্যের আধার পুত্ররত্ন তাহারা আর কোথাও দেখে নাই। না হইবে কেন, অমন বাপ, অমন মা যার, তাদের ছেলে এমন সুন্দর ও মধুর গুণমণ্ডিত না হইলে যে বেদবিধি সব মিথ্যে হবে। এই আট নয় বৎসরের বালক, দেখিলে যেন চৌদ্দ পনের বৎসরের বলিয়া বোধ হয়—এমনি পুষ্টায়তন। অন্য ছেলে হইলে এখন তাহার মুখে ভাল বোল্ ফোটে না কিন্তু ভবানন্দ এই বয়সে বিরূ-দাদার কাছে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রায় শেষ করিয়াছে। তার পর সে যখন তাহাদের গৃহ-বিলম্বিত মহিষমর্দ্দিনীর ছবি দেখিয়া পিতার নিকট শ্রুত সেই মূল স্তোত্রটী সুর করিয়া পাঠ করিত—

অয়ি গিরিনন্দিনি, নন্দিতা মেদিনী
বিশ্ববিনোদিনি নন্দসুতে।
গিরিবর-বিন্ধ্য-শিরসি নিবাসিনি,
বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুসুতে।

ভগবতি হে শিতিকণ্ঠে কুটুম্বিনি,
ভূরি কুটুম্বিনি ভূরি কৃতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি
রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে। ১

সুরবরবর্ষিণি দুর্দ্ধরধর্ষিণি
দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে।
ত্রিভুবনপোষিণি, শঙ্করতোষিণি
কিল্বিষমোষিণি, ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি
দুর্ম্মদ-শোষিনি সিন্ধুসুতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি
রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।

তখন সকলে অবাক হইয়া থাকিত। নির্ম্মলা বেল তলায় বসিয়া বালকের সেই তালে তালে নাচ আর সুরলয়ে স্তবপাঠ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে বুকের মাঝে পুরিয়া লইয়া, সেই রক্তিমাভ গণ্ডে বারবার স্নেহের এত চুম্বন করিতেন—তবু যেন আশা মিটিত না। মায়ে-পোয়ের সে আদর ভালবাসা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া বলিত—শিবদুর্গার ছেলে ও গণেশ জন্মেছে; বিদ্যে সাধ্যে বেশী না হ'লে মান্‌বে কেন? আহা, বাপ-মায়ের কোল্‌-জোড়া হ'য়ে বেঁচে থাক, আমরা আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্ব্বো। তারপর দেবানন্দ ও উমাকালীর উদ্দেশ করিয়া সদুঃখে বলিত—এই সময় যদি ঠাকুর-ঠাকরুণ বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁদের কত আনন্দ; নাতির অল্প-বয়সে এ বাহাদুরী দেখে কত সুখ পেতেন। অপর রমণী অমনি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিত—আহা! তা আর নয়- টাকার সুদ, এর বাড়া কি আর কিছু আছে দিদি?

আহারের পর দুপুর বেলা যখন রামেশ্বর টোলে পড়াইতে যাইতেন। ভিতর বাটীতেও সেই সময় ধর্ম্মকর্ম্মের বাজার বসিত। পাড়ার মেয়ে-ছেলেরা আসিয়া সতী নির্ম্মলা ও ব্রহ্মচারিণী দাক্ষায়ণীর কাছে কত

উপদেশ শুনিত। শেষে তাহারা বাটী যাইবার সময় দাক্ষায়ণী ভবানন্দকে আর একবার মায়ের স্তবপাঠ করিতে বলিলে বালক নাচিতে নাচিতে তাহার স্বভাবসিদ্ধ সুর-সংযোগে উক্ত স্তব পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়া দিত।

পুত্রটীর উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন কবিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বিবাহ হউক আর নাই হউক, পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করা পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কর্ত্তব্যপালন না করিয়া তিনি ত' তীর্থ-ভ্রমণে যাইতে পারিবেন না, আসিতে কত বিলম্ব হইবে—তাহার ত' স্থিরতা নাই।

পূজনীয়া পিসীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া রামেশ্বর পাড়ার পূজনীয় ব্যক্তিগণের অনুমতি লইলেন। সকলেই সরল-প্রাণে ভবানন্দের উপনয়ন-কার্য্যে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রাণের পুত্র ভবানন্দের উপনয়নে নির্ম্মলার আনন্দের সীমা নাই। তিনি পাড়ার সমবয়সীগণকে এ আনন্দের সংবাদ প্রদান করিতে ছাড়িলেন না।

সেবার পঞ্জিকায় কয়েকটী দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রামেশ্বর তাহারই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া মাঘমাসের শুভদিনটীই স্থির করিলেন। উপনয়নে খুব ধূম হইবে; মাতুল কমলেশ্বর ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবেন, তার পর পিতার ত' আছেই। তড়িৎ প্রভু-পুত্রের উপনয়নের হাট-বাজার করিতে লাগিল। বিরূপাক্ষ, গৃহাদি সংস্কার ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল। এ কার্য্যে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা অগ্রেই করা হইয়াছে, দরিদ্র-গণকে খাদ্যাদির সহিত একখানি করিয়া কাপড় ও কিছু অর্থ দেওয়া হইবে—মাতামহ মহানন্দ এইরূপই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজেই তাঁহার অনুমতি অনুসারে কার্য্যের আয়োজন হইতে লাগিল। যাঁহাদের নিকট যাওয়া উচিত এবং বেশী দূর নয়, রামেশ্বর এইরূপ আত্মীয়গণের

নিকট স্বশরীরে উপস্থিত হইলেন; তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল—রামেশ্বর! তোমার ছেলের পৈতে হবে—আমরা অবশ্যই যাব। তারপর যাহাদের পত্র দিতে হইবে, যথাসময়ে তাহাদিগকে পত্র দেওয়া হইল।

নির্ম্মলার ছেলের পৈতা—মহানন্দ সপরিবারে আসিয়াছেন, তবে এখনও দেবীপুরের ভবনে আসেন নাই। কমলেশ্বর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মচারীর দ্বারা ভবানীপুরে যে বাড়ী কিনিয়াছিলেন, সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মহানন্দ তত যাওয়া-আসা করিতে পারেন না, কমলেশ্বর আদরের ভাগিনেয়ের উপনয়নে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিবেন, কাজেই প্রায় তাঁহাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে মাঝে মাঝে গঙ্গা পার হইয়া দেবীপুরে আগমন করিতে হয়। যেদিন নিজে আসিতে না পারেন সেদিন কর্ম্মচারী শ্রীনিবাস দ্রব্যাদি লইয়া আসে। শ্রীনিবাস বাবুর সহিত তড়িতের বড় ভাব। রামেশ্বর তড়িৎকে উহার সহিত আলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তড়িৎ বলিল—ইনিই ত' বড়বাবুর ভবানীপুরের বাটী খরিদ করিয়াছিলেন! সেই সময়ে ইহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। বাবুরা কেহ কলিকাতায় আসেন নাই—ইহার মারফতেই কার্য্য হইয়াছিল। তখন জানিতে পারি নাই যে, মহানন্দ বাবু আপনারই শ্বশুর। তা বেশ হইয়াছে, বলিয়া রামেশ্বর কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। পাড়ায় সামাজিক বিতরণ হইবে—ব্রাহ্মণ শূদ্র কেহই বাদ পড়িবে না। আর ভোজন ব্যাপারের ত' কথাই নাই। সেইরূপ উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীনিবাসবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া মুটে করিয়া দ্রব্যাদি রাখিয়া যান। অথবা ভৃত্য গোবর্দ্ধন যাইয়া সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে লইয়া আসে। এইরূপে প্রায় পনর দিন হাট-বাজার করিতেই সময় অতিবাহিত হইল।

ক্রমে শুভদিন সমাগত। আজ উপনয়নের দিন, শিরোমণি ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় গুরুদেব থাকিলে কি আনন্দই হইত কিন্তু কোথায় তিনি? সংসার বিরাগী অবধূত পৃথিবীর কোন স্থানে ঘুরিতেছেন—কে জানে; তাঁহার থাকিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ত' নাই!

শিরোমণি ঠাকুর মন্ত্র পড়াইলেন। রামেশ্বর পুত্রের উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভবানন্দ নব ব্রহ্মচারী রূপে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া সকলের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। পিতামাতা, ঠাকুরমা প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষা দান করিলেন। তারপর "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যাপার আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ মহানন্দ এ সকল কাজে খুব পরিপক্ক, পুত্র কমলেশ্বরের সহিত আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছেন। মাধুরী পুত্রের সহিত প্রাণের নির্ম্মলার এ মহৎ কার্য্যে যোগদান করিতে ছাড়েন নাই; তিন দিন থাকিতে আসিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম গুছাইয়া লইয়াছেন। আসেন না কেবল রামেশ্বরের শাশুড়ী সৌদামিনী; তখন জামাতৃগৃহে শাশুড়ীর আগমন প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল না; তিনি জননীর সহিত ভবানীপুরের বাটীতেই অবস্থান করিয়া যাহাতে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়, তাহার জন্য ঠাকুর-দেবতার নিকট মানসিক করিতেছিলেন।

হাজারীবাগের পথ-ঘাট কাহারও জানা ছিল না। এইজন্য রামেশ্বর দাদার নিকট যাইতে পারেন নাই। খুব কাকুতি মিনতি করিয়া দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; নির্ম্মলাও বড় যাকে প্রাণের আবেদন জানাইয়া অনেকগুলি পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের এখানে আসা ত' পরের কথা, সর্ব্বেশ্বর বা প্রমোদা সে পত্রের ভাল-মন্দ একটা উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা ইহাতে প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছেন। যাঁহাদের কাজ, তাঁহারাই যদি না আসিলেন, প্রাণের

ভবানী যদি কাকার এ কাজে যোগদান না করিল, তাহা হইলে প্রাণে আঘাত লাগিবারই ত' কথা কিন্তু কি করিবেন—উপায় ত' নাই! তবে কালকাতায় হেমলতার বাড়ীতে রামেশ্বর স্বয়ং যাইয়া তাহাকে আনিয়াছিলেন। জামাইটীও অতি সৎ ছেলে—সে দুই তিন দিন ছুটি লইয়া খুড়া মহাশয়ের এ আনন্দে যোগদান করিয়াছিল। এখানে নির্ম্মলা মেয়ে-জামাইকে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—শ্বশুরবাড়ীতে তাহারা সেরূপ আদর কখনও পায় নাই।

বামনদেবের উপনয়নের মত ভবানন্দের উপনয়নে কেহ বাদ পড়ে নাই। আশে পাশে পাঁচ সাতখানি গ্রামে দুই তিন দিন কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নাই। এ কার্য্যে নারদের কার্য্য করিয়াছিলেন—বিরূপাক্ষ; রামেশ্বরের নিকট চিরাভ্যস্ত হইয়া তিনি যে লোকজন খাওয়াইতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন; এ সকল কার্য্যে দরিদ্রের সেবা করা বিশেষ দরকার, এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিরূপাক্ষ দীন-দরিদ্রের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ভবানন্দের উপনয়নের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রগণের নিমন্ত্রণ যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের আদর অভ্যর্থনারও কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল---ভট্টচার্য্যী মহাশয়ের ছেলের মতই কার্য্য হ'য়েছে; এরূপ আদর-যত্ন আমরা বহুদিন কোথাও পাই নাই। অতিথিশালায় অতিথি এ কয়দিন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পুরুষানুক্রমে বৈবাহিক-বাটীর কার্য্য-কারণ, দেবতা ও অতিথি-সেবায় তাঁহাদের ঐকান্তিকতা এবং বন্দোবস্ত দেখিয়া মহানন্দ বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিবাহের সময় রামেশ্বর যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, ঘুণাক্ষরেও তাহা মিথ্যা নহে। এমন সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়া মহানন্দ বাস্তবিকই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন।

পূর্ব্বে পনর দিন এবং শেষেও পনর দিন ধরিয়া কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল। তার পর একে একে আত্মীয়-স্বজন স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিল। মহানন্দও বেহান ঠাকুরাণী দাক্ষায়ণীর নিকট বিদায় হইয়া ভবানীপুরের বাটীতে গমন করিলেন। মাধুরী পুত্রের সহিত এখনও নির্ম্মলার নিকট কিছুদিন থাকিবার জন্য শ্বশুরের অনুমতি লইয়াছিলেন। মহানন্দ তাহাতে নারাজ হন নাই। কমলেশ্বর দুই একদিন অন্তর দেবীপুরে আসিয়া তাহাদের সংবাদ লইতেন। ভাগিনেয় ভবানন্দের শ্রীমুখ না দেখিলে কমলেশ্বর থাকিতে পারিতেন না, সে মুখে কি একটা সৌন্দর্য্য-ভাতি অহরহঃ প্রতিভাত রহিয়াছে, যাহা দেখিলে কমলেশ্বরের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিত, মধ্যে মধ্যে ভাগিনেয়কে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না।

উৎসব প্রায় এক মাস হইল—শেষ হইয়াছে, তথাপি এখনও ডাকে ডাকে কত দরিদ্র আসিতেছে, রামেশ্বর তাহাদের সন্তুষ্ট করিতেছেন—বিরক্তি কিছু মাত্র নাই।

একদিন কমলেশ্বর গরীব-দুঃখীকে দান করায় কি ফল জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—দ্বারাগঞ্জে একজন লোক ছিল—সে কাহাকেও দান করিত না, বলিত ওরা মহাপাপী, ভগবান সেই জন্য উহাদের ঐ রকম কষ্ট দিচ্ছেন—উহাদের সাহায্য ক'রলে ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য করা হয়—এ কেমন কথা ভাই, আমি ত' লোকটার কথা শুনে অবাক্ হ'য়েছি।

রামেশ্বর। হইবারই ত' কথা; সে অতি পাষণ্ড, তাই অমন কথা বলেছে। ভগবান স্বয়ংই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।" দাতার দান-কার্য্যে সহায়তা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য উহারাই ত' দেবদূতরূপে মর্ত্ত্যে বিচরণ

করিতেছে। উহারা না থাকিলে দাতার দান-কার্য্য সফল হইত না। দানই যে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। দান ছাড়া কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবার প্রথা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাও কি? হিন্দুর এমন কার্য্য নাই—যাহাতে দীন-দুঃখীকে দান করা নিষেধ আছে।

কমলেশ্বর। আচ্ছা উহারা ত' পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলে ঐরূপ হইয়াছে—উহাদের সাহায্য করা, তাহা হইলে ত' দোষ?

রামেশ্বর। আর তুমিও ত' পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দাতা হইয়াছ, উহারা যদি না থাকে—তাহা হইলে তোমার দাতা হ'য়ে জন্মানই যে বৃথা; দান কাকে ক'র্ব্বে? বড়লোক ত' আর তোমার এক পয়সা বা দুই পয়সা দান নিতে আস্‌বে না। আর "দরিদ্রান্ ভর" বলিয়া শাস্ত্রের আদেশ। শাস্ত্র বড়লোককে দিতে বলেন নাই।

কমলেশ্বর। তা বটে, তবে এক একজন অমন কথা বলে কেন?

রামেশ্বর। সে নিতান্ত আহাম্মুক তাই ঐ কথা ব'লে কেবল পাপ সঞ্চয় করে। দিতে না পার, চুপ ক'রে থাক্‌লেই হয়—অপরের কার্য্যে বাধা দিয়ে পাপ করা কেন? দিবার ইচ্ছা থাকিলেও তোমার ঐ কথা শুনে যদি দাতা দান না করেন, ত' পাপ হইবে কার? একটা চলিত কথায় বলে—"দাতা দান করে—বখিলের বুক ফাটে।" ইহা কি তাই নয়? তুমি যেমন ভাল কর্ম্মফলে দান করিবার জন্ম জন্মেছ, ওরাও তেমনি মন্দ কর্ম্মফলে তোমার কাছে উহা লইবার জন্ম জন্মেছে। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে বাঁধাবাঁধি, তুমি না দিয়ে থাকৃতে পার না! আঁধার না থাকিলে যেমন আলোক-সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না, তেমনি দরিদ্র না থাকিলে ধনীর বা দাতার সৃষ্টি হইত না। এ সকল মহামায়ার সৃষ্টিবৈচিত্র্য—একের জন্ম আর একটীর উদ্ভব হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য এত মনোরম হ'য়েছে। নতুবা একঘেয়ে একটানা স্রোতে পড়িয়া জীবন যে দুর্ব্বহ হইত! দরিদ্র

এত নিন্দার পাত্র কিসে? দুঃখীকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিবার কিছুমাত্র কারণ নাই আমাদের চেয়ে উহারা মায়ের অতি প্রিয়পাত্র; যে ছেলেটী অতি গরীব, মায়ের মায়া-মমতা তার প্রতি তত বেশী, উপায়ক্ষম ছেলের উপর মায়ের তত দৃষ্টি থাকে না, তিনি জানেন ও উপায় উপার্জ্জন ক'রেছে—ভাল থাক্‌বে। এ বড় গরীব, ইহাকেই দেখি। মার প্রাণের টান তার দিকেই বেশী হয়। গরীব ছেলের কাছেকাছেই মা থাকেন—পাছে তার কোনও কষ্ট হয়। আমাদের অপেক্ষা মা ওদের খুব কাছে।

যেখানে সেখানে, বনে বাদাড়ে প'ড়ে রাত কাটায়—তুমি আমি তা পারি কি? ভাল ঘরে, ভাল বিছানায় শুয়ে যে ছটফট্ ক'রতে হয়! আর ওরা ধূলিশয্যায় শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়। মা ওদের চক্ষে চক্ষে রাখেন—হিংস্রজন্তুর কবল থেকে রক্ষা করেন। ওরাও মায়ের এই বিশাল বক্ষে শুয়ে কিছুমাত্র যাতনা অনুভব করে না।

কমলেশ্বর। তবে গরীব হওয়াই ভাল।

রামেশ্বর। মন্দই বা কিসের; মায়ের কাছে কাছে থাকবার জন্য, অনবরত তাঁর স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার জন্য গরীবত্ব ত' স্পৃহণীয়। বড়লোক কয়জনের তা থাকে? এই জন্যই ত' পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী ভগবানের নিকট দুঃখ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিখ-গুরু মহাত্মা নানক অনবরতই ত' ব'লতেন—"বাবা! থোড়া গরীবি দে দেও" স্পৃহণীয় না হইলে, ভগবানের কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহাকে বাঁধিবার পন্থা না হ'লে, কেন তাঁরা এ প্রার্থনা ক'র্‌তেন?

কমলেশ্বর। ভাই! তোমার কাছে থেকে আজ আমার একটী মহা সন্দেহ দূর হ'লো; আমিও মনে মনে গরীবদিগকে বড় ঘৃণা ক'রতেম—আজ আমার সে সন্দেহ ভঞ্জন হ'লো। আমিও এবার নিজপুত্র প্রবোধের উপনয়নে দরিদ্র-সেবা বিশেষ ক'রে ক'র্‌ব।

রামেশ্বর। সে কার্য্য কত দিনে হবে ভাই ?

কমলেশ্বর। এ বৎসর আর হ'লো না, যোড়া বৎসর—মেয়েলী হিসাবে এ বৎসর উপনয়ন দিতে নাই। আগামী বৎসরে সমাধা ক'র্‌বার মনস্থ ক'রেছি।

রামেশ্বর। যা হউক ভাই! অনেকগুলি গিয়ে গিয়ে প্রবোধ এত বড় হ'য়েছে—এই মঙ্গল। মা উহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

কমলেশ্বর। ভাই, সে ত' তোমারই আশীর্ব্বাদ—তুমি আমাকে পাপ-পথ থেকে ফিরিয়ে না দিলে কি ছেলে-পিলে হ'তো? যতদিন আমি সাহেবী ধরণে চলেছিলাম—ততদিন যত ছেলে হ'য়েছে; দুই তিন মাস যেতে না যেতেই মরেছে। এবার তুমি আমাকে সুপথে আনিয়েছ বলিয়াই প্রবোধ আমাদের আনন্দবর্দ্ধন ক'র্‌ছে।

রামেশ্বর। ভাই, কেহ কিছু করে না। জগৎকর্ত্রীর হস্ত জগতের সকল কাজে ব্যাপৃত; আমি করি, তুমি কর, এ কথা কেবল অজ্ঞানীরাই ব'লে থাকে।

এই বলিয়া রামেশ্বর উঠিলেন—পূজার সময় হইল আর বসিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়; তিনি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভবানন্দ এতক্ষণ পিতার কাছে বসিয়া মামার সহিত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, কতক বুঝিতেছিল··কতক না বুঝিয়া হাঁ করিয়া শুনিতেছিল। পিতা উঠিয়া গেলে সে বিরূদাদার কাছে পড়িতে গেল। কমলেশ্বর আহারাদি করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—আজ আর বৈকালে আসিব না, বাবার শরীরটা বড় ভাল নাই; এই কয় দিন পরিশ্রম করিয়া তিনি একটু অসুস্থ হইয়াছেন।

যাইবার সময় নির্ম্মলা বলিয়া দিলেন—দাদা! কাল যেন বাবার সংবাদটা পাই। কমলেশ্বর "আচ্ছা" বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বন্দোবস্ত।

প্রাণে একবার বিরাগ ভাব আসিলে—তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। রামেশ্বর এতদিন নির্লিপ্তভাবে সংসার-কার্য্য করিতেছিলেন; এখন গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনের জন্য, তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য আর সংসার-কার্য্যেও যেন তত আস্থা নাই। কর্ম্মযোগী রামেশ্বর যাহা কিছু করেন—ভাল হউক, মন্দ হউক তাহার ফলাফল সমস্তই মাতৃ-চরণে সমর্পণ করিয়া থাকেন—এইজন্যই এত শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। এ সমস্তই মায়ের—এ সংসার মায়ের—পুত্র-পরিজন সমস্তই মায়ের, তবে যে তিনি ইহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন, সে কেবল তাঁহার অনুমতিক্রমে। তিনি আদেশ করিয়াছেন, এ কাজে মাই তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; কর্ত্রীর আদেশ প্রতিপালন না করিলে তিনি রাগ করিবেন—এইজন্য করা, তাঁহার আমিত্ব ইহাতে কিছু নাই, ফলের আকাঙ্ক্ষাও তিনি কিছুমাত্র করেন না। নির্লিপ্ত কর্ম্মযোগী যেরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কার্য্য করেন, রামেশ্বরের সংসার-কার্য্যও ঠিক সেই রকমের।

সংসারের সকলেই এখন বেশ পাকা হইয়াছেন—আত্মীয়-স্বজন যাহারা এখন সংসারের মেরুদণ্ড-স্বরূপ; তাহাদের দ্বারা সংসার চলিলে এখন আর কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি কিছু-দিন অবসর লইয়া দেশ-ভ্রমণে যাইবার জন্য সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তড়িৎকে টাকা-কড়ির কথা সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন, কোথায় কি পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া খরচ-পত্র করিবে, সমস্ত

শিখাইয়া দিলেন। প্রাণের ছাত্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদেরই আত্মীয়, ইহার আর কেহ নাই, এখন সে রাশ্বেরেরই সংসারভুক্ত; আর সে যেরূপ পাকা হইয়াছে, তাহাতে এ সংসারের ভার সে সহজেই বহন করিতে পারিবে। তাহাকে দেবসেবা, অতিথি-সেবা ও পুত্র ভবানন্দের ভার অর্পণ করিলেন। যাহাতে পুত্রটী ধর্ম্মপথগামী হয় এবং লেখাপড়া শিখিতে পারে, বিরূপাক্ষকে বার বার সে বিষয় উপদেশ প্রদান করিলেন।

তার পর রজনীযোগে পত্নী নির্ম্মলাকে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—নির্ম্মলা! আমি বিবাহের সময়ই তোমাকে এ কথা জানাইয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, তুমিও জান গুরুদেব আমাকে তীর্থভ্রমণের আদেশ দিয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। আমি সংসার ত্যাগ করিতেছি না—তবে এখন কিছু-দিনের জন্য নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিব। হিন্দুদিগের পবিত্র কীর্ত্তি সকল সন্দর্শন করিয়া হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করাই ইহার উদ্দেশ্য। তার পর গুরুদেবের সহিত দেখা করা; আজ বহুদিন হইল সে পাদপদ্ম না দেখিয়া প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এখানে আনাই আমার গৃহ-ত্যাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব তুমি আমাকে বিদায় দাও—আমি গৃহ-বহির্গমন করি। তাঁহার দর্শন জন্য তোমারও ত' মন চঞ্চল হইয়াছে?

স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে শুনিয়া পতিপ্রাণা নির্ম্মলা প্রথমে শোকে মুহ্যমানা হইয়াছিলেন, কথা শুনিতে না শুনিতেই সেই ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু যখন শুনিলেন— তিনি একেবারে গৃহত্যাগ করিতেছেন না, গুরুদেবকে খুঁজিয়া গৃহে আনাই এ তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য; অথচ ইহার জন্য তীর্থ-দর্শনও হইবে, তখন তিনি কথঞ্চিৎ ধরা-গলায়, কিছু ভয়া আওয়াজে বলিলেন—

গুরুদেবের দর্শন জন্য মন ত' উতলা হইয়াছে কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে বলিয়া যে প্রাণটা আরও অস্থির হইয়া পড়িল। বিবাহের সময়ে তুমি এ কথা বলিয়াছিলে, তাহা জানি কিন্তু এত শীঘ্র তাহা ত' বুঝিতে পারি নাই ?

রামেশ্বর বলিলেন—নির্ম্মলা ! শরীর এখন বেশ পটু আছে, পথ-ভ্রমণে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আরও বেশী দিন গত হইলে শরীর ত' জরা-ব্যাধির অধীন হইতে পারে, তখন এ কষ্টকর কার্য্য কেমন করিয়া সমাধা করিব ? আর প্রভুর আদেশ তুমি ত' শুনিয়াছ, তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া আসিলে তবে অন্য কার্য্যের আধিকারী হইতে পারিব। অতএব ইহাই সুসময়, তুমি হৃষ্টচিত্তে বিদয় দাও।

হিন্দু-স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, সংসারে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্যই পতিপত্নী-সম্মিলন, অতএব স্বামীর ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বাধা দেওয়া সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নহে ; বাস্তবিক মায়ের কৃপায় শরীর এখন কর্ম্মক্ষম, পথ অতিবাহিত করিতে কোন কষ্ট হবে না, শরীর ভগ্ন হইলে আমিই বা কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব ! গুরুদেব যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন এই সময়েই তাহা করা কর্ত্তব্য। নির্ম্মলা বলিলেন—যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর, ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেওয়া আমার উচিত নয়। তবে বেশী বিলম্ব ক'রোনা, যতদিন তুমি বাহিরে থাকিবে, ততদিন আমাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যত শীঘ্র পার প্রভুকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিবে। সংসারীর পক্ষে এইজন্য সন্ন্যাসী-গুরু শাস্ত্রনিষিদ্ধ, আশা মিটিয়ে পাদপদ্ম পূজা করা হয় না বল্লেই হয়।

রামেশ্বর বলিলেন—শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বটে কিন্তু বহু ভাগ্যবান না হইলে এমন ব্রহ্মভাবের ভাবুক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে গুরুরূপে লাভ করা যায়

না। গুরুপুরোহিত এত নকড়া-ছকড়া হওয়া ভাল নয়, গুরু বা পুরোহিতের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব থাকা চাই—অনবরত নিকটে পাইলে, প্রতি পদে তাঁহাদের দর্শন হইলে যেন তত শ্রদ্ধা থাকে না, এ ভাব স্বভাবতই হইয়া থাকে, বেশী মেশামিশিতে ঘৃণার ভাব উদ্রেক হয়ই। গুরু বা পুরোহিত গৃহীর দেবতা, দরকারের সময় পাইলেই যথেষ্ট হইল। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সময় তাঁহাদের সহায়তা লাভ, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণই আবশ্যক, নতুবা সংসারের সামান্য খুটিনাটীতেও কি দেবতাকে আনাইয়া ধান ভানাইতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁহাদের দেবত্ব বজায় থাকে কই? নির্ম্মলা বলিলেন—একথা একশো বার। মাথার মণি মাথায়ই থাকিবেন, দেখিবার প্রার্থনা করিলে তবে দেখা পাওয়া চাই, নতুবা প্রাণে পূজার ভাব আস্‌বে কেন? দাদারও আমার তাই মত।

রামেশ্বর। তোমার দাদা ও বউদিদি কাহার নিকট হতে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছেন---কই তাহা ত' তুমি ব'ল্‌লে না। কেবল বলিলে—এবার তাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন।

নির্ম্মলা। এই সেদিন দারাগঞ্জে গিয়ে দেখ্‌লাম দাদা ও বউদিদি মন্ত্র জপ ক'রছেন। তাঁদের গুরুকুলে কেউ নাই কিনা, তাই কালী-ঘাটের নকুলেশ্বর-তলায় যে বিমলানন্দ সন্ন্যাসী থাকেন, তিনি এখন তাঁদের গুরু হ'য়েছেন। তাঁরই আদেশে ত' দাদা ভবানীপুরে বাড়ী কিনেছেন। হ্যাগা! শুন্‌ছি নাকি, ওবাড়ী বড়ঠাকুরের ছিল? তড়িৎও তাই বলে—দাদার যে কর্ম্মচারিটী আসিয়াছিল, বাড়ী খরিদ সূত্রেই ত' তড়িতের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হ'য়েছে। তোমাদের বিষয় তুমি কি জান না?

রামেশ্বর। না নির্ম্মলা, আমি কখনও দাদার উপর কোন কথা

কই নাই—তিনি পূর্ব্বে কি করিয়াছেন, না করিয়াছেন—আমি কিছু খোঁজ রাখি নাই। তড়িৎ ও দাদাই সব ক'র্ত্তেন। তবে যখন দাদা বিষয় হস্তান্তর করেন—তখন তড়িৎ আমাকে আপত্তি করিতে বলেছিল কিন্তু পাছে তিনি মনঃকষ্ট করেন—এইজন্য উহা গ্রাহ্য করি নাই।

নির্ম্মলা আর কোনও কথা কহিলেন না, মনে মনে বলিলেন—দেবতা আর কাহাকে বলে? মামলা-মোকর্দ্দমায় পাপ সঞ্চয় না করিয়া যে অকাতরে আপনার গণ্ডা ত্যাগ করিতে পারে—সেই ত' মহাপুরুষ, এই গুণেই ত' দাসী ওপদে চির-বিক্রীতা।

রামেশ্বর পত্নীকে সন্তুষ্ট করিয়া পিসীমাতার নিকটে গেলেন। তাঁহাকে তীর্থ-ভ্রমণের কথা বলিলে—তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—আচ্ছা যাহোক তুই বারমুখো ছেলে বাবা। কেবলই হেথা সেথা; এই সেদিন এত দেশ ঘুরে এসেও কি আশা মিটলো না। মানুষ ছেলে-পিলে ছেড়ে জীবনে কতবার দেশভ্রমণে যায়? তোর এক অনাসৃষ্টি কাণ্ড; অত বারমুখো হওয়া কি ভাল—তাহ'লে ছেলেপিলে মানুষ ক'রবি কেমন ক'রে, এখন যেন একটী, যখন আরও দু'একটী হবে—আমি মরে যাবো, তখন এই স্বভাব বদ্ধমূল থাকলে—তুই ক'র্‌বি কি?

প্রাণের এমনি টান, দাক্ষায়ণী আর কিছুতেই রামেশ্বরকে চক্ষের অন্তরাল ক'র্ত্তে চান্ না—তাহার ত' সময় হ'য়ে আস্‌চে; রাম যদি কোন দূর দেশে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে আর দেখা হবে না। পুত্র ত' নাই—মৃত্যু-সময় তোর হাতের আগুনও পাব না? দাক্ষায়ণী এই জন্যই ভাবিতেন এবং এই জন্যই তিনি এত ঘন ঘন তাঁহার তীর্থভ্রমণে বাহির হইবার পক্ষপাতী হইতেন না।

রামেশ্বর বলিলেন—পিসী-মা! পূর্ব্বে তোমার জন্য আর আমার তীর্থভ্রমণ হ'লো কই? একে শরীর অসুস্থ ছিল—তার উপর বিবাহ

বিবাহ ক'রে তুমি আমাকে পাগল ক'রেছিলে—সেইজন্য বিবাহ ক'রে আর কোথাও যেতে পারলাম না। এখন ত' আর তোমায় একা থাক্‌তে হবে না বাপু! বাসুদেব কাছে রইলো—নির্ম্মলা রইলো, তবে আর ভাবনা কি? তীর্থভ্রমণ ক'রে না এলে গুরুদেব অন্য উপদেশ দিবেন না, বলে গেছেন—এইজন্য যেতে হবে, আরও যেতে হবে—তাঁকে খুঁজে আন্‌বার জন্য—তিনি ত' আর একস্থানে থাকেন না?

হিন্দুগৃহের ব্রহ্মচারিণী কখনও কাহাকেও ধর্ম্মে আস্থাবিহীন করেন না—বরং উত্তেজিত করাই তাঁহাদের স্বভাবের প্রধান কার্য্য। রামেশ্বর সেই সাক্ষাৎ শিবতুল্য অবধূতকে আবার গৃহে আনিবে শুনিয়া তিনি বলিলেন—বাবা! যখন গুরুদেবকে আন্‌তে যাচ্ছিস্—তখন আর কি ব'লবো, তবে বেশীদিন থেকো না।

রামেশ্বর বলিলেন—না পিসীমা! বেশীদিন থাক্‌লে চল্‌বে কেন; ঘরের এত কাজকর্ম্ম রয়েছে, বেশীদিন থাক্‌লে সব অচল হ'য়ে যাবে—তা কি আমি বুঝি না, তবে তড়িৎকে ও বিরুকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; যতদিন না আমি আসি—ততদিন উহারা বেশ চালাতে পারবে।

দাক্ষায়ণী আর কোন কথা কহিলেন না—নিমরাজী গোছের ভাব প্রকাশ করিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন। পিসীমার মত করাই রামেশ্বর অত্যন্ত শক্ত মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়ের কৃপায় তাঁহার অনুমতি পাইয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে বাহিরে আসিলেন। তখন বাসুদেব সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসিয়াছিল। পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া রামেশ্বর বলিলেন—কিরে বাবা! এত রাত্রি অবধি পড়া শেষ হয় নাই?

পিতা তীর্থভ্রমণে যাইবেন—শুনিয়া বাসুদেবের পড়ায় আজ তত মন বসে নাই—তাই পাঠ মুখস্থ করিতে এত দেরি হইয়াছিল। পুত্র

বলিল—বাবা! আজ সকাল থেকে মনটা কেমন হ'য়ে গেছে—তাই ভট্টির দুইটী শ্লোক কিছুতেই আয়ত্ত ক'র্ত্তে পারছিলাম না, বিরুদাদা যত বুঝান, আমি ততই বুঝ্‌তে পারি না, এমন আর কোন দিনও হয় নাই—মনটা এত চঞ্চল। হাঁ বাবা! আপনি কবে তীর্থভ্রমণে যাবেন?

রামেশ্বর বুঝিতে পারিলেন—আমি যাইব বলিয়া বাসুর মন এত খারাপ হ'য়ে গেছে; নতুবা অমন মেধাবী ছেলে, ভট্টির কয়েকটা শ্লোক সমস্ত দিনে মুখস্থ ক'র্ত্তে পাল্লে না। তিনি পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—বাসু! আমি তীর্থে যাব ব'লে বোধ হয়—অত্যন্ত ভাবনা হ'য়েছে?

পুত্র পিতাকে দেবতার মত ভয়ের সহিত মান্য করিত; তাহার কথার প্রতিবাদ করা বা গমনে বাধা দিবার সাধ্য এখন তাহার হয় নাই—সে নাবালক! ভালমন্দ সে কি বুঝে, তথাপি পিতার সে আরাধ্য-পদ চক্ষের অন্তরাল হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া বালক সমস্ত দিন মনমরা হইয়াছিল। যাহার জন্য দুঃখ-শোক উপস্থিত হয়—সেই প্রাণের কথাটী যদি কেহ টানিয়া বলে—তাহা হইলে অতিরিক্ত আনন্দে সে আর চক্ষের জল রাখিতে পারে না; পিতা মনের কথা টানিয়া বলিয়াছেন দেখিয়া—বাসুদেব হাপুস-নয়নে কাঁদিয়া ফেলিল। সে যে জীবনে পিতা ছাড়া কখন হয় নাই?

রামেশ্বর সেই নবনীতনিন্দিত আত্মজকে বুকের মাঝে আবরিয়া সাহসসূচকস্বরে বলিলেন—ও কি গো বাবা! বেটা ছেলে; এত অধীর হয় কি? আমি যে তোমার উন্নতির জন্য গুরুদেবকে আন্‌তে যাচ্ছি—তুমি ত' সে দেবতাকে দেখ নাই—তিনি ঘরে এলে তোমার বুদ্ধিশক্তি আরও বাড়বে, পড়া মুখস্থ ক'র্ত্তে আর তিলমাত্র দেরী হবে না,

যা শুন্‌বে—তৎক্ষণাৎ তাই শিখ্‌তে পারবে; তোমার জন্যেই ত' যাচ্ছি বাবা!

যে যে কাজ করে—তাহার সহায়তা হইবে—অর্থাৎ বাসুদেবের মেধাশক্তি খুব বাড়বে—গুরুদেব আসিলে সে খুব লেখাপাড়া শিখ্‌তে পারবে—না জানি গুরুদেব কেমন এবং কত বড় পণ্ডিত, বাবা তাঁহাকে আন্‌তে যাচ্ছেন, শুনিয়া বালক শোক সম্বরণ করিল এবং বলিল—বেশীদিন থাকবেন না, তা'হ'লে আমি ঘরে থাকৃতে পারবো না, গুরুদেবকে নিয়েই চলে আস্‌বেন। "তা আর বল্‌তে" বলিয়া রামেশ্বর পূজাগৃহে প্রবেশ করিলেন। মায়ার একমাত্র আস্পদ পুত্রের নিকট অব্যাহতি লাভ করাও তাঁহার পক্ষে শক্ত হইত—মা আজ তাহাও সহজ করিয়া দিলেন—তবে আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখে কে? হৃষ্টচিত্তে রামেশ্বর পূজায় বসিলেন—বাসুদেব জননীর নিকট আহার করিতে গমন করিল।

আজ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে শিবশক্তির মিলন করিয়া রামেশ্বর কিয়ৎক্ষণ সেই সুধাপানে বিভোর হইয়া রহিলেন। তারপর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—মা! কিছুদিন তোমার সংসার তুমি চালাইয়া লও, আমি গুরুদেবের অন্বেষণে কল্য বাটীর বাহির হইব। তোমার জিনিষ—তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া কিছুদিন অবসর গ্রহণ করিলাম। সুস্থশরীরে যেন তীর্থভ্রমণ করিয়া ফিরিতে পারি এবং অচিরে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়া আমার শেষ-জীবনের কাজ-কর্ম্ম সকল যেন সমাধা করিতে পারি! রামেশ্বর যেন অলক্ষিতে শুনিলেন—তুই যা বাবা, নির্ম্মলা আছে।

নির্ম্মলা সাক্ষাৎ শক্তি, সে সংসার-কার্য্যে সুনিপুণা তাহার ন্যায় গম্ভীর-প্রকৃতির স্ত্রীলোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এত অল্প

বয়সে—অমন কোমলাঙ্গী হইলেও সে একধারে পুরুষ-প্রকৃতির গুণ-সম্পন্ন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—সে বেশ করিতে পারে; পাষণ্ড পাপীর প্রতি সে যেমন খড়্গহস্ত; সদাচারী পুণ্যাত্মার প্রতি সে তেমনি চিরশান্তিময়ী; পাপীর চক্ষে সে যেমন ভীষণা-ভয়ঙ্করী; আর পুণ্যাত্মার চক্ষে সে তেমনি কমনীয়া স্নেহময়ী! শাস্ত্র বলেন -প্রত্যেক পুরুষে এবং স্ত্রীতে স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। পুরুষের বামভাগ স্ত্রীশক্তি-সম্পন্ন এবং দক্ষিণভাগ পুংশক্তিসম্পন্ন; স্ত্রীলোকের দক্ষিণভাগ পুং-শক্তি-সম্পন্ন আর বামভাগ স্ত্রীশক্তিসম্পন্ন—এইজন্য পুরুষের বামে স্ত্রী বসিলে –পতি-পত্নীর মিলন হয়, আর সেই জন্য পুরুষের বামভাগে স্ত্রীর বসিবার স্থান– শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন!

স্ত্রীজাতি মাত্রেই শক্তির অংশ; বিশেষতঃ সতী স্ত্রীর ক্ষমতা দৈব-শক্তির অপেক্ষাও বেশী। অতএব কুৎসিৎ ভাবে পরস্ত্রী দর্শন করিয়া কামকটাক্ষপাত করিলে বিশ্বজননীর অপমান করা হয়–স্ত্রীজাতির অঙ্গে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করিতেছে—ভগবান সদাশিব ত' বলিয়াছেন :—

"যস্যা অঙ্গে মহেশানি সর্ব্বতীর্থানি সন্তি বৈ ॥"

স্ত্রীজাতিই যে সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তি—ইহার অন্তরালে যে আমার পরমেশ্বরী আনন্দময়ী জগৎপালিনী শক্তি বিরাজিতা, কামভাবে দর্শন করিলে–অনন্ত নরকভোগ হইবে না ত' কি? চণ্ডমুণ্ডবিঘাতিনী ভগবতী চণ্ডিকা ত' শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নিজেই বলিয়াছেন :—

বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ।

শক্তি-সাধনা।

শিবই শক্তি—শক্তিই শিব। অতএব এমন শক্তি যার ঘরে—তার গৃহত্যাগের ভাবনা কি—ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার বাধা-বিঘ্ন কেমন করিয়া হইতে পারে?

রামেশ্বর সাহসবদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস-ভরা প্রাণে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। তখনও একটু রাত্রি আছে—তিনি বিল্বতলায় বসিয়া অপরাপর দিনের মত গাহিলেন:—

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পড়ে, আবাদ ক'র্‌লে ফল্‌তো সোণা।
মায়ের নামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে ত' যম যাবে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান না,
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরু রোপণ ক'রেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না,
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রাম প্রসাদকে ডেকে নেনা।

গান শেষ না হইতেই নির্ম্মলা ভৈরবীবেশে মায়ের শাণিত ত্রিশূল আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন—"প্রভু! সোণাই ফলিবে' যখন মায়ের নামে বেড়া দেওয়া হইয়াছে, তখন ভয়ই নাই; শ্রীগুরুদত্ত বীজ জপমালা করিয়া বাহির হউন। ইষ্টসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইবে না; রামেশ্বর শক্তিস্বরূপিণী নির্ম্মলার হস্ত হইতে ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সংসার-ভাব আর তাঁহাকে জড়াইতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শোক-যন্ত্রণা।

সকল স্থানের জলবায়ু সকলের সহ্য হয় না। বহুদিন এলাহাবাদের খোলা বায়ুতে বাস করিয়া কলিকাতার ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানের বদ্ধবায়ু মহানন্দের সহ্য হইল না; ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল কিন্তু এখানে যখন বাড়ী খরিদ করা হইয়াছে, তখন ত' সময়ে সময়ে না থাকিলে চলিবে না! কমলেশ্বরের ইষ্টদেব বিমলানন্দ যখন কালীঘাটে রহিয়াছেন —সে নিজের পারত্রিক উন্নতির জন্য যখন এখানে অবস্থান করিতেছে, তখন তিনিও দারাগঞ্জের কাজকর্ম্ম বিশ্বাসী কর্ম্মচারীগণের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিমলানন্দ প্রত্যহই কমলেশ্বরের নিকট আসিয়া থাকেন। সময় পাইলে কমলেশ্বরও নকুলেশ্বর-তলায় গুরুদেবের নিকট যাইয়া ভজন-সাধনের গূঢ়তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া ধন্য হন। রামেশ্বর কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন—তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। তিনি তাঁহার আত্মীয় হইলেও প্রকারান্তরে গুরু পদবাচ্য; তাঁহার গৃহত্যাগে মহানন্দ ও কমলেশ্বর কথঞ্চিৎ বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যহই প্রায় নির্ম্মলা ও বাসুদেবের সংবাদ না লইলে আর চলে না, কিন্তু রামেশ্বর যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে সংসারের কোন কষ্ট নাই। দেবীপুর হইতে ভবানীপুর বেশী দূর নহে; মাধুরী সময়ে সময়ে ননদিনীর সেই শান্তিময় আশ্রমে যাইয়া ইচ্ছামত শ্রান্তি দূর করেন; নির্ম্মলাও পিতামাতাকে দেখিতে আসেন, তবে বেশীদিন থাকিতে পারে না। কারণ গৃহে দেবসেবা, অতিথিসেবা রহিয়াছে, বেশীদিন থাকিলে চলিবে কেমন করিয়া?

রামেশ্বর না থাকিলেও নির্ম্মলার থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহার অনুমতি না পাইলে ত' কেহ কোনও নূতন কাজ করিতে পারিবে না। দাক্ষায়ণীকে কোন কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বৌমার ওজর দেন, এ বৃদ্ধ বয়সে নিজে কোন দায়ীত্ব লইতে চাহেন না। এইজন্য নির্ম্মলা আসেন—কালীমাকে দর্শন করেন, হয় ত' একদিন থাকিয়া, পরদিন চলিয়া যান। কর্ত্তা-গৃহিনী সংসারের মেরুদণ্ডস্বরূপ দুইজন একেবারে না থাকিলে সংসার অচল হইয়া পড়ে।

মহানন্দের বয়স অনেক হইয়াছে। খুব সন্তর্পণে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়া, অনাচার অত্যাচার হইতে দূরে থাকিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়াছেন—তাই এত বয়সেও তাহা একপ্রকার ঠিক রহিয়াছে কিন্তু আর থাকে না; জরা-বার্দ্ধক্যে সে পুরাতন গৃহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, খোঁচাখুঁচী দিয়া আর চলে না! আজ পেটের অসুখ, কাল জ্বর, পরশু সর্দ্দিকাশী প্রভৃতিতে বৃদ্ধ ক্রমশঃ জড়সড় হইয়া পড়িতে লাগিলেন—তথাপি আনন্দ-ভাব কিছুমাত্র তিরোহিত হইল না, তিনি প্রত্যহ আদিগঙ্গায় স্নান করতঃ মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাবা নকুলেশ্বরের পূজা সমাপন করতঃ গৃহে আসিতে লাগিলেন। তবে পূর্ব্বে যেরূপ সহজে, বিনা কষ্টে তিনি ভবানীপুর হইতে কালীঘাটে যাইতেন—আজকাল আর তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না, সামান্য কষ্টে বেশী কষ্ট অনুভব হয়। পথে স্থানে স্থানে দুই একবার বসিতেও হয়। এইজন্য কমলেশ্বর বলিতেন—বাবা! আপনি আর প্রত্যহ মার বাড়ী যাবেন না—এ জনাকীর্ণ কলিকাতা সহর, চারিদিকে গাড়ীঘোড়া কোন দিন কি চাপা পড়িবেন? আমি প্রত্যহ মায়ের চরণামৃত আপনাকে আনিয়া দিব।

মহানন্দ সেই দিন হইতে আর বাটীর বাহির হইলেন না। কমলেশ্বর সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আজ্ঞাবর্ত্তী দাসের মত দেবসেবায় নিয়োজিত

হইলেন। সৌদামিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হৃদয় দেবতার পরিতোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হয়—কালের কটাক্ষ কি সেবাশুশ্রূষায় এড়াইতে পারা যায়?

মহানন্দ ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হইলেন। কমলেশ্বর ডাক্তার কবিরাজের বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন—বাবা! কালের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে ডাক্তারে কি করিবে! আমার সময় হইয়াছে; এ সময় বৃথা ডাক্তার কবিরাজে অর্থব্যয় না করিয়া, সেই অর্থ দীনদরিদ্রকে দানের ব্যবস্থা কর, আর দয়াময় বিমলানন্দকে প্রত্যহ আসিয়া আমার নিকট গীতাপাঠ করিতে অনুরোধ কর। রামেশ্বর কাছে থাকিলে—আমাকে কাহারও শরণাপন্ন হইতে হইত না কিন্তু তিনি ত' নিকটে নাই?

কমলেশ্বর গুরুদেবকে পিতার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি স্বীকৃত হইয়া প্রত্যহ গীতাপাঠ শুনাইতে লাগিলেন। গীতাপাঠে বিমলানন্দও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৃদ্ধ আপনার শেষ সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া চিত্তকে বিষয়-আশয় হইতে কেন্দ্রীকৃত করিয়া পরকাল-চিন্তায় নিযুক্ত করিলেন; বহুদিন ধর্ম্মভাবে থাকিয়া মহানন্দের চিত্ত সংযত, মন স্ববশে আয়ত্ত হইয়াছিল, সামান্য চেষ্টাতেই মন মনের মত হইয়া বৃদ্ধের পরলোকের পথে সাহায্য করিতে লাগিল।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে বিমলানন্দ গীতাপাঠ শ্রবণ করাইয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। বাড়ীর সকলের আহার হইয়া গিয়াছে। সেদিন আত্মার যে বিনাশ নাই—আত্মা যে নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যময়; ইহা যে অজর, অমর, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য বিমলানন্দ নিজের যোগশক্তির দ্বারা বৃদ্ধকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

মহানন্দের দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে—আত্মা অবিনাশী তাহার ক্ষয়-ব্যয়

নাই। যাহা কিছু দেহেরই হয়—শরীরই সমস্ত সহ্য করে। আত্মার সহিত এ সকলের কোনও সম্বন্ধ নাই। দেহের মধ্যে আত্মাই সব; তাহাকে জানিতে পারিলেই, পরমাত্মাকে জানা হইল—ইনিই ব্রহ্মময়ী—তিনি আমাদের এত কাছে কাছে—এই হৃদয়ের মাঝে রহিয়াছেন কিন্তু আমরা কত দূরে ভাবিয়া নানাপ্রকার কষ্টসাধ্য সাধনার দ্বারা তাঁহাকে পাইবার জন্ম ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করি, হায়! একবার ভাল করিয়া দেখিনা যে, মা আমাদের তিলেকের জন্ম কাছছাড়া নহেন। বাজীকরের মেয়ে লীলাখেলা করিবার জন্ম আমাদের নিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু আর ত' হইবে না—ব্রহ্মময়ী আর তা পারিবে না—এই বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সকলেই কাছে বসিয়া আছেন; রোগের বাড়াবাড়ি শুনিয়া নির্ম্মলাও দেবীপুর হইতে পিতাকে দেখিতে আসিয়াছেন; তিনি ও মাধুরী—সকলেই বৃদ্ধের সেবায় নিরত। মহানন্দ কিয়ৎক্ষণ পরে একবার "ব্রহ্মময়ী তারা" কই মা—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কমলেশ্বর আসিয়া বলিলেন—বাবা! কষ্ট হচ্ছে কি? মহানন্দ সে কথায় কাণ দিলেন না; পথের সঙ্গী পাইলে সে যেমন আগ্রহ প্রকাশ করিয়া যাইবার জন্ম তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে, মহানন্দও তেমনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এই যে মা রয়েছে—চল যাই—আমাকে ফেলে যেও না। আমি পথ জানি না; অজানা পথে তুমি আমার বল-বুদ্ধি ভরসা, দাঁড়াও মা দাঁড়াও!

পিতার এই অভাবনীয় মৃত্যুকালীন উক্তি শুনিয়া কমলেশ্বর নয়নজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। তিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে লাগিলেন—আজন্ম যিনি ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া কাটাইয়াছেন—শেষ সময়ে তিনি মায়ের নজর-ছাড়া হতে পারেন না—এই জন্ম ধর্ম্মের কালাকাল নাই। নির্ম্মলা বলিলেন—বাবা যে আমার সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, তিনি (স্বামী লক্ষ্য

করিয়া) বলিতেন—বাবা, একজন মহাপুরুষ, সংসারে এমন লোক এখন আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তবে বাবার মৃত্যু কি অজ্ঞানীর মত যেমন তেমন ক'রে হবে ?

কোন উদ্বেগ নাই—যন্ত্রণার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই—মহানন্দ একবার সকলের দিকে চাহিলেন ; নির্ম্মলা ও কমলেশ্বর মাথার কাছেই বসিয়াছিলেন—আবেশ' ভরা চক্ষে একবার চাহিয়া বলিলেন— "যাই যাই—দাঁড়া মা" আর কোন কথা বলিলেন না ; বৃদ্ধের সেই হাসিমাখা মুখ, মলিনতাশূন্য দেহ পড়িয়া রহিল—প্রাণপাখী মহাশূন্যে কোথায় পলাইয়া গেল—কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারিল না—মানব-চক্ষুঃ ইহার সন্ধান কখনও করিতে পারে না ; সেই অজানা স্থানের নিরাকরণ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। যিনি মুক্তপুরুষ ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি এত বিভোর—সে সুখে এত তন্ময় যে, ভাষার সাহায্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনিই জানেন—মৃত্যু কত সুখের ; মুক্তপুরুষই জানেন—এ মরণের সুখ কত মধুর—কত শান্তিপ্রদ। তাই মৃত্যুসময়ে কান্নার পরিবর্ত্তে তাঁহারা হাসেন, দুঃখের পরিবর্ত্তে তাঁহারা সানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন ; মৃত্যুকালীন তাঁহাদের সেই প্রশান্ত ভাব দেখিলে মৃত্যু যে ভীষণ ভীতিপ্রদ—তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; দানবীর মহানন্দেরও তাহাই হইল। মৃত্যুসময়ে সকলের সহিত দেখা হইল—কেবল প্রাণের জামাতার সহিত দেখা হইল না। সেই শাক্ত-ভক্ত সাধকের দর্শন জন্য মহানন্দ বিশেষ চঞ্চল হইয়াছিলেন, কিন্তু মা তাঁহার সাধ মিটাইলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

কমলেশ্বর পিতার শ্রাদ্ধ-কার্য্য খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। অধ্যাপক-বিদায়, কাঙ্গালী-বিদায়—তার পর ভোজন ব্যাপারের ত' কথাই নাই। অর্থ যখন প্রচুর, মহানন্দ যখন অজস্র উপার্জ্জনের পথ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—আর কমলেশ্বর যখন সেই গদীতে বসিয়া এখন যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন—তখন শ্রাদ্ধ-কার্য্যে কার্পণ্য করিবেন কেন? অহিন্দু হইলেও বা এ সকল কার্য্যে অবহেলা করিতে পারিতেন, কিন্তু কমলেশ্বর গোঁড়া হিন্দু, পিতার শ্রাদ্ধ তিনি হিন্দুর বেদবিধি অনুসারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুসম্পন্ন করিলেন।

গ্রহ যখন বিগুণ হয়, অদৃষ্টচক্র যখন মন্দ দিকে ঘুরিতে থাকে, তখন চারি দিকেই নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্টের সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ এ বৎসর কমলেশ্বরের মহাগুরু নিপাতের বৎসর, কত কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কমলেশ্বর অতীব সাবধানের সহিত চলিলেও, তাহার হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার বৃদ্ধা দিদিমা নানাপ্রকার জটিল পীড়ায় জড়াইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা—ঔষধাদি কিছু খাইবেন না, কাজেই দুই এক প্রকার জানিত মুষ্টিযোগে তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না; একমাস রোগ-ভোগ করিয়া বৃদ্ধা জামাতার পন্থানুসরণ করিলেন।

কমলেশ্বর দুঃখভারগ্রস্ত হৃদয়ে আবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিলেন। দিদিমা বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদের সংসারে শরীর পাত

করিয়াছেন; বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই; অতএব কমলেশ্বর জননীর দ্বারা তাঁহারও যথাশাস্ত্র ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ান্তে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। জননীর মৃত্যুতে সৌদামিনীর কোন প্রকার আক্ষেপ না থাকে, কমলেশ্বর সেই জন্য কোন প্রকার ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু তাহাতেই কি কুগ্রহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—গ্রহরাজের তাহাতেই কি মনস্তুষ্টি হইল ?

তিনি এইবার তাঁহার প্রাণের প্রাণ পুত্র প্রবোধচন্দ্রকে লইয়া টানা-টানি আরম্ভ করিলেন। বালক প্রবোধচন্দ্র জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইল; কিছুতেই এ জ্বর আর সারে না। কমলেশ্বর ও মাধুরী নয়নের মনি প্রবোধচন্দ্রকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন-কার ভাল ডাক্তার দুর্গাচরণকে পুত্রের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত করি-লেন। সৌদামিনী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের পৌত্র প্রবোধের শিয়রে বসিয়া অহোরাত্র সেবা করিতে লাগিলেন এবং মা কালীকে প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন—মা আর কেন! যথেষ্ট হ'য়েছে, বালক-বালিকার আশার ধন প্রবোধকে রক্ষা কর—যদি কিছু ত্রুটী হয়ে থাকে, তাহা হইলে কমলেশ্বর ও মাধুরীকে শোক-সাগরে না ভাসাইয়া আমাকে নাও, আমি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ ক'র্‌ছি। কিন্তু সে প্রার্থনা দেবদেবী কাহারও কাণে পৌঁছিল না, প্রবোধের পীড়া এত চিকিৎসাতেও বাগ মানিল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। বাঙ্গালীর মধ্যে এত বড় ডাক্তার দুর্গাচরণ কিছুই করিতে পারিতেছেন না, সামান্য জ্বরে আজ প্রায় একুশ দিন বালক শয্যাগত; জ্বর কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছেন না।

মৃত্যু-রোগের যে ঔষধ নাই—অর্থবানের তাহা ধারণায় আসে না, তাঁহারা মনে করেন—বুঝি আরও বেশী টাকা খরচ করিয়া ডাক্তার

আনিলে রোগী আরাম হইবে। বিশেষতঃ পিতামাতার প্রাণ এমনি করুণা-মুগ্ধ যে, পুত্রের কষ্ট তাঁহারা কিছুতেই দেখিতে পারেন না। অর্থ থাকিলে ত' কথাই নাই, ইহার জন্য টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত; আর যাঁহাদের টাকা নাই, তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও পুত্রের চিকিৎসা করাইতে ছাড়েন না। পুত্র-স্নেহ পিতামাতার এমনি হাড়ে হাড়ে জড়িত।

একমাত্র পুত্র, বংশের তিলক প্রবোধের জন্য কমলেশ্বর ও মাধুরীর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, যে যাহা বলিতেছে, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন। সকলে বলিল—দেখ, দুর্গাচরণ ভাল ডাক্তার হইলে কি হইবে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্মরণ-শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে, তাই তিনি এই সামান্য জ্বর-রোগের ঔষধ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, অযথা রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন। কমলেশ্বর বাবু, আপনি এক কাজ করুন, ডাক্তার গুড়ীবকে একবার লইয়া অসুন! দুর্গাচরণ থাকুন না, তাহাতে ক্ষতি কি?

ডাক্তার গুডীব তদানীন্তন—ইংরাজ-মহলে খুব বড় চিকিৎসক। দরিদ্র লোক তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিত না কিন্তু কমলেশ্বর ত' তাহা নহেন, অর্থের ত' তাঁহার অভাব নাই! তিনি বলিলেন—আচ্ছা! তাহাই করুন, আপনারা তাহাকেই ডাকিয়া আনুন, যত টাকা লাগে তাহাই দিব। কমলেশ্বর একমাত্র পুত্রের পীড়ায় একেবারে অধৈর্য্য এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এত ধর্ম্মবিশ্বাস এত সহিষ্ণুতা একেবারে কোথায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; যে যাহা বলিতেছে—বালকের মত তাহাই সম্পাদন করিতেছেন। মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে বালক, যুবক বা বৃদ্ধ যিনিই হউন—কেহ যে তাহাকে রাখিতে পারে না, মৃত্যুর করাল-গ্রাস হইতে ফিরাইবার ক্ষমতা যে

কাহারও নাই, শাস্ত্রপাঠী কমলেশ্বর তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় অসহিষ্ণু পিতামাতার অপরিণামদর্শিতা দোষে বৈদ্য-সঙ্কট হইয়াও পুত্র বহুকষ্ট পায়, শেষে নানাবিধ ঔষধে বিষ-ক্রিয়া করিয়া তাহাকে কালের কোলে ফেলিয়া দেয়। এখানেও বুঝি তাহাই হয়।

দুর্গাচরণ ত' দেখিতেছেনই, মধ্যে মধ্যে আরও কত প্রকার চিকিৎসা হইতেছে। তাহার পর যখন সকলে বলিল—একবার ডাক্তার গুডীবকে আনিলে ভাল হয়। কমলেশ্বর আর ভিন্ন মত করিলেন না, যত শীঘ্র প্রাণের পুত্র রোগমুক্ত হইয়া উঠিয়া বসে, ততই তিনি চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, শরীরের আসান হয়।

বন্ধু-পুত্রের পীড়ায় জনৈক বন্ধু কাতর হইয়া ডাক্তার গুডীবকে আনিলেন। সাহেব আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল—আমি আশ্চর্য্য হইলাম—দুর্গাচরণের ন্যায় একজন বিজ্ঞ ডাক্তার এই সামান্য জ্বর ছাড়াইতে পারেন নাই, বৃথা রোগীকে এতদিন ভুগাইতেছেন, তোমাদের বাঙ্গালীর ভিতর অনেক অনেক ডাক্তার এইরূপ টাকার লোভ সম্বরণ ক'র্ত্তে না পেরে, রোগীকে বৃথা কষ্ট দিয়ে, আপনার নাম খারাপ করে। তার পর সাহেব রোগীর অপরাপর অবস্থা এবং কতদিন রোগ হইয়াছে, পথ্যাদি কি হইতেছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বর-ত্যাগের ঔষধ ব্যবস্থা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুর্গাচরণের গাড়ী আসিয়া কমলেশ্বরের দরজায় লাগিল। ডাক্তার নামিয়া সদর-মহলে প্রবেশ করিয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন—ডাক্তার গুডীব আসিয়াছেন, কমলেশ্বর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, বন্ধুটী কাছে বসিয়া আছে। রোগী সেই খোলা বারাণ্ডায় পূর্ব্বের ন্যায় শুইয়া আছে। দুর্গাচরণের সহিত চখোচোখী হওয়ায়, কমলেশ্বর একটু অপ্রতিভ হইলেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বড়ই ঠোঁট-কাটা ছিলেন, স্পষ্ট কথা বলিতে তিনি

ছাড়িতেন না—তা তিনি গুরুই হউন না কেন। কমলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া দুর্গাচরণ বলিলেন—বলি কিহে কমলেশ্বর! শীগ্‌গির শীগ্‌গির নির্ব্বংশটা হবার জন্ম এত চেষ্টা কেন? নির্ব্বংশ যে হবে তা ঠিক, তবে আমি দেখছিলাম, তুমি ছেলেমানুষ আর তোমার ঐ একমাত্র ছেলে—পয়সাও যথেষ্ট আছে, কিছুদিন অতিবাহিত হ'লে রোগের ভোগ কমিলে, যদি কিছু সুরাহা হয়, তখন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিব। এই আশায় কেবল ঘূর্ণী বাতাসে পতিত মাঝির মত হাল ধরিয়া চলিয়াছিলাম—নাড়াচাড়া কিছু করি নাই—পাছে ভরা-ডুবি হয়। এখন তুমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে হচ্ছো, তা' আর আমি কি ক'র্ব্বো। এই বলিয়া দুর্গাচরণ পুনরায় গাড়ীতে উঠিতে যান, এমন সময় ডাক্তার সাহেব দুর্গাচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দুর্গাচরণ, তুমি কি বলছো! উঠে এসোনা?

দুর্গাচরণ সাহেবের বাহাদুরী দেখিতে অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠিয়া গেলেন এবং বলিলেন—জ্বর অতিশয় বাঁকা, জোর করিয়া ছাড়াইলেই রোগীর মৃত্যু হইবে। যদি না হয়, দুর্গাচরণ আর ডাক্তারী করিবে না। নতুবা আমি আর জ্বর ছাড়াইতে পারিতাম না। তবে একটা লোক নির্ব্বংশ হবে বলে তাহা করি নাই।

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি ক্ষেপেছ! এই দেখ আমি জ্বর ছাড়াইয়া দিতেছি। এই বলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—প্রথম মাত্রা, দ্বিতীয়, তৃতীয় মাত্রা সেবনেই রোগীর অজস্র ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল; রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল;—তারপর ঘাম বন্ধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ক্রমশঃ নাড়ী লোপ পাইতে লাগিল—মৃত্যু-লক্ষণ সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গাচরণ বলিলেন—কমলেশ্বর এই নাও, দেখলে। বলিয়া তিনি আর

দাঁড়াইলেন না। সাহেব ডাক্তারও বিষণ্ণ মনে দুর্গাচরণের পাছু পাছু প্রস্থান করিলেন। বাড়ীতে কান্নাগোল উঠিল।

মণিহারা ফণিনীর প্রায় মাধুরী ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল! কমলেশ্বর পাগলের মত শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন—চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন—বক্ষ তাড়না করিয়া এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন। সৌদামিনী "দাদা রে এই কি তোর মনে ছিল ভাই" বলিয়া নাতিকে বুকের মাঝে আবরিয়া রাখিতেছেন—মাধুরী আসিয়া শাশুড়ীর কাছ থেকে পুত্রকে টানিয়া বলিতেছেন - মা! দাও, আমার প্রবোধ যে অনেকক্ষণ কিছু খায় নাই—বাপের আমার গলা যে শুখাইয়া গিয়াছে, দাও কিছু খাওয়াই? নির্ম্মলা দুই একদিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন—তিনি কেবল হাতে কামড়াইতেছিলেন— এই সময় যদি তাঁহার পতি দেশে থাকিতেন— তিনি যদি চণ্ডীপাঠ করিতেন—তাহা হইলে কি আর এমন দুর্দ্দৈব ঘটিতে পারিত—তিনি যে এখন এখানে নাই—সকলই অদৃষ্ট! নির্ম্মলা এই হৃদয়-বিদারক শোক-দৃশ্য দেখিয়া, দাদা ও বৌদিদির সরল প্রাণে বিধাতার শোকশেল হানা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কোন মহাপাপে আমার পিতার এমন পবিত্র বংশ আজ নির্ব্বংশ হইতে চলিল— তাঁহার জ্ঞানে ত' তিনি এ বংশে এমন কোনও গুরুতর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন নাই—যাহার দ্বারা তাহার পরিণাম এত ভীষণ হইবে। নির্ম্মলা বাসুদেবকে সঙ্গে আনেন নাই— সে বিরুদাদার ও ঠাকুরমার কাছে দেবীপুরেই আছে।

মাধুরী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া নির্ম্মলাকে ধরিয়া বলিল— ঠাকুর-ঝি! এই আমার বাবা আস্তে আস্তে কথা কচ্ছিল—আর যে কথা কইছে না—আর কি কথা কইবে না ভাই? আমার বাবা কি আমাকে ছেড়ে চলে গ্যালো, আমি কি দোষ করেছি, নির্ম্মলা; সে

ঠাকুর-জামাইকে যে বড় ভালবাসতো, এখন তিনি কই, চণ্ডীপাঠ হবে নাকি? পুত্র শোকাতুরা জননীর এ প্রলাপোক্তি শুনিলে পাষাণ ভেদ হইয়া যায়। নির্ম্মলা ত' কোমল-প্রাণা, কি বলিয়া বৌদিকে সান্ত্বনা করিবেন—আপনিই কাঁদিয়া আকুল হইলেন—দুইজনে গলা ধরিয়া বালকের গুণগান করিয়া কাঁদিতে বসিলেন। কমলেশ্বর পাগলের মত বাড়ীর মধ্যে বাক্স পেঁটরায় প্রবোধের যে সকল মহামূল্য দ্রব্য ছিল—সেই সকল বাক্স ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া একত্র জড় করিতে লাগিলেন; তারপর কি বুঝিলেন—দৌড়িয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। পুত্র-শোকের তুল্য শোক আর নাই—এ শোকজ্বালায় যে জ্বলিয়াছে, সেই জানে—ইহার ভীষণতা কতই ভীষণতম!

————

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অঘটন ঘটন।

বেলা তখন দুইটা, শোকাতুর জনক-জননীর নিকট হইতে তাহাদের বক্ষের ধন ছিনাইয়া লইতে কেহই সাহস করিতেছেন না। পাছে হিতে বিপরীত হয় কিন্তু আর কতক্ষণ শবদেহ পড়িয়া থাকিবে; যতই থাকিবে—ততই ত' শোক বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না!

কমলেশ্বর কোথায়! বুঝি এ নিদারুণ সংবাদ গুরুপদে জানাইতে দৌড়িয়াছে। কাছেই বিমলানন্দ স্বামীর আশ্রম—কমলেশ্বর তথায় আসিয়া এই সর্ব্বনাশের বার্ত্তা গুরুপদে নিবেদন করিয়া ঠিক বালকের ন্যায় হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরু বিমলানন্দ সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী হইলেও প্রাণোপম শিষ্যের এই মর্ম্মবিদারী দুর্ঘটনার বিষয় শুনিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু বিধাতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নরজগতে সাধ্য কার? তিনি কি বলিবেন—কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কমলেশ্বর কিন্তু তাহার পদধারণ করিয়া নীরবে কেবল অশ্রুবির্জ্জন করিতে লাগিলেন —এবং বলিতে লাগিলেন—গুরু! কি মহাপাপে আমার অদৃষ্ট এমন ভাঙ্গিয়া গেল—আমি ত' জীবনে এমন মহাপাপ কিছুই করি নাই—যার জন্য আমাকে ভীষণ পুত্র-শোকে জর জর হ'তে হবে? ঠাকুর! আর যে আমার নাই—ঐ যে আমার সবে ধন নীলমনি, আমি কেমন ক'রে ঘরে যাব! এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া—সকল শোকের অতীত—পরম জ্ঞানী বিমলানন্দও বিচলিত হইয়া কমলেশ্বরের মুখপানে ছলছল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শিষ্যের হস্তটী আপন হস্তে

লইয়া কটাক্ষ করিয়া দেখিলেন—হস্তরেখায় ত' এমন দুর্দ্দৈব কিছু লেখা নাই তবে কোন্ পাপে এ মনস্তাপ? বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ স্থির চিত্তে কত কি ভাবিলেন—তার পর চুপে চুপে বলিলেন—কমল! একটা কাজ ক'র্ত্তে পারিস্?

কমল। কি কাজ প্রভু! কি কাজ ক'র্‌লে এ শোক জ্বালা নিবে যায়, এ যে জ্বলে যাচ্চে ঠাকুর!

বিমলা। পারবে কি? বড় শক্ত কাজ।

কমল। পুত্রশোকের কাছে, এমন কি শক্ত কাজ আছে যা আমি ক'র্‌তে পার্ব্বো না! বাঘের মুখে, সাপের গর্ত্তে অথবা প্রাণ দিলেও যদি প্রবোধ বাঁচে—তাও ক'র্ত্তে এ পা পেছুবে না—কি বলুন?

বিমলানন্দ কাণে কাণে বলিলেন—কালীঘাটে যে একটা পাগ্‌লা ঘুরে বেড়ায়—দেখেছিস্ ত'?

কমল। হাঁ দেখেছি; প্রত্যহ সকালে ছুতো হাড়ি ক'রে সব দোকানে ভিক্ষে করে, নেংটা থাকে, একটা কুকুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তাকে জানি।

বিমলা। ঐ পাগল বড় সহজ নহে—ওকে চেনবার লোক লোকালয়ে নাই; আর ওর সঙ্গ করাও কাহারও সাধ্য নয়? ও অতি রুক্ষ-স্বভাব কিন্তু ভিতর ওর কোমলতাময়—সাক্ষাৎ ভগবান্ বল্‌লেও হয়—মহাযোগী, ঈশ্বর-জানিত লোক। যদি কোন প্রকারে ওকে প্রসন্ন ক'র্‌তে পারিস্, তাহ'লে তোর ছেলে বাঁচে!

কমলেশ্বর অতীব আগ্রহ সহকারে বল্‌লেন—কেমন ক'রে কি ক'র্ত্তে হবে বলে দিন।

বিমলা। সন্ধ্যার সময় ও আর কোথাও বেরোয় না, কেওড়াতলার শ্মশানে, হাড়ির ঘরে বসে থাকে। সেই সময় ওর পায়ে যদি জড়িয়ে

প'ড়তে পারিস্, আর ও যদি প্রসন্ন হয়, তাহ'লে মরা প্রবোধ নিশ্চয়ই বাঁচতে পারে। তবে ওকে ধর্‌তে গেলে, প্রথমে মার-ধোর অনেক অমানুষিক লাঞ্ছনা সহ্য ক'র্‌তে হবে!

কমল। ঠাকুর! পূর্ব্বে ত' বলেছি, প্রাণ দিলেও যদি হয়—তা ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত—লাঞ্ছনা ত' কোন্ ছার!

বিমল। আচ্ছা, তবে এক কাজ কর, বাড়ীতে গিয়ে কান্নাকাটী সব চুপচাপ করে দে। বাড়ীতে কেউ যেন ঢুকে না, তুই যে কি কর্‌ছিস, তাও যেন কেও জান্‌তে না পারে। বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ ক'রে, সব চুপ ক'রে বসে থাক্‌গে যা, আর এখন দাহ করিস্‌নি!

কমল। তা যেন না কর্‌লুম, তারপর কি ক'র্ব্বো?

বিমল। সন্ধ্যার সময় তুই চুপে চুপে গিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধর্‌বি, হাজার মার-ধোর ক'ল্লেও ছাড়িস্‌নি, দেখ যদি তোর বরাৎ সুপ্রসন্ন হয়, যদি অবধূত ভগবানের দয়া হয়, তাহ'লে তোর ছেলে এ যাত্রা রক্ষা পাবেই পাবে। ঐ সকল মহাপুরুষের ক্ষমতা দেবতা অপেক্ষাও বেশী, উঁহারা ইচ্ছা ক'র্‌লে অঘটন ঘটাতে পারেন।

দিবসের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে, বেলা আর বেশী নাই। সান্ধ্য তিমির ধরণীতল ছাইবার উপক্রম করিতেছে, দিবাকর অনেকক্ষণ হইল পৃথিবীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র আল্‌বালে ডুবিয়া পড়িয়াছেন। তখনও শবদাহের জন্য কেহ কোন উদ্যোগ করে নাই। কমলেশ্বর উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাড়ী গিয়া জননী ও ভগিনীর নিকট গুরুদেবের পরামর্শ-কথা চুপে চুপে উত্থাপন করিলেন। সৌদামিনী হাতে চাঁদ পাবার মত আহ্লাদে বলিলেন—"তা দেখ না বাবা! মহাপুরুষের কৃপা হ'লে কি না হয়?"

নির্ম্মলা মনে মনে বলিলেন—ইনি কোন্ পাগল—আমাদের আরাধ্য-

দেব ত' নয়। নতুবা এমন সাধ্য এখন কার? তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন গুরুদেবের কৃপায় তাই হউক দাদা। দেখ না—মেরে তো আর ফেল্‌তে পার্‌বেন না। মাধুরীর এ সকল কথায় কাণ নাই—তিনি একধারে পড়িয়া শোকাবিষ্টচিত্তে কেবল কাঁদিতেছেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি কান্নার বিরাম নাই। বাড়ীর সকলে নীরবে দরজা বন্ধ করিয়া শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কমলেশ্বর গুরুর কথামত সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনাকে লুকাইয়া শ্মশান ঘাটে উপনীত হইলেন, কেওড়াতলার শ্মশানের সেই ঘোর অন্ধকার যেন গিলিতে আসিতেছে, তখন কোন শব দাহ হইতেছে না. কাহারও সাড়া শব্দ নাই, সেই ভীষণ হইতেও ভীষণতার মধ্যে কমলেশ্বর একাকী পশ্চিমদিকের বৃক্ষতলে অগ্রসর হইলেন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, তবে অন্ধকারের আবছায়ায় দেখিতে পাইলেন—একজন কালো মুস্কো জোয়ান অজানুলম্বিত দীর্ঘকায় পুরুষ ধ্যানে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটী অন্ধকারের প্রতিমূর্ত্তি ভীষণ সারমেয় তাহাকে দেখিবামাত্র ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল!

কমলেশ্বরের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই—তিনি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া গিয়া সেই মহাপুরুষের চরণ দুইটী জাপটিয়া ধরিলেন।

মহাপুরুষ আচম্বিতে এই নির্জ্জন স্থানে তাহার আসনে অন্য লোককে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"কে তুমি এখানে কেন? এখনি চলে যাও। না হ'লে ভয়ানক শাস্তি পাবে?" কমলেশ্বর তাহাতে বিচলিত না হইয়া বলিলেন—"শাস্তি আর কি দেবেন—যথেষ্ট পেয়েছি, এখন শাস্তি থেকে যাতে মুক্তি পাই তা করুন—ঠাকুর! আমি আপনাকে চিনেছি—আপনি মেরে ফেল্‌লেও আর সরছি না, আমার একটা উপায় আপনাকে ক'র্ত্তেই হবে—নইলে পা ছাড়বো না।"

পাগল—পাগল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আঁচড়াইতে কামড়াইতে লাগিল; ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল—আরও কত প্রকার নির্য্যাতন করিল, কমলেশ্বর তথাপি পা ছাড়িলেন না. কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল বলিতে লাগিলেন—আমার একটা উপায় ক'র্ত্তেই হবে, আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি—পাগলামী ক'রে ফাঁকী দিলে চল্‌বে না, আর না হয় আমাকে মেরে ফেলুন--আপদ চুকিয়া যাক। পাগল বড়ই বিপদে পড়িল—কমলেশ্বর নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়াছেন—এত নির্য্যাতনেও ভ্রুক্ষেপ নাই, পাগলের সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এক পাও টলিলেন না। বরং আরও দৃঢ়তর করিয়া পা জড়াইয়া ধরিলেন।

এই সব লোক যেমন সত্বর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জ্বলিয়া উঠেন, তেমনি সত্বর শীতল হইয়া পড়েন। কমলেশ্বরের সহ্যগুণ দেখিয়া, তাহাকে অচল অটলভাবে এই ভয়ানক নির্য্যাতন সহ্য করিতে দেখিয়া মহাপুরুষ জল হইয়া গেলেন, স্থির হইয়া বসিয়া বলিলেন,—"আমি এতদিন মায়ের কোলে বেশ সুখে কাটাইতেছিলাম—কোনও দুঃখ কষ্ট ছিল না, এইবার তুই শালা আমাকে তাড়ালি দেখ্‌ছি; ইহা নিশ্চয়ই মায়ের ইচ্ছা নতুবা তুই শালা কেমন ক'রে সন্ধান পেলি? আচ্ছা, কি হ'য়েছে বল, পা ছাড়।"

কমলেশ্বর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—বলিলেন—বাবা! আমার ঐ একমাত্র ছেলে, হয় উহার জীবন দান করুন, নয় আমাকেও উহার সঙ্গী করুন। আমি আপনার মত মহাপুরুষের হাতে জীবন দান ক'রে, আমার প্রবোধের সঙ্গে সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে জগৎ থেকে চলে যাই। মহাপুরুষ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—কোন কথা কহিলেন না; তার পর প্রবুদ্ধ হইয়া "তারা তারা" বলিয়া নাদস্বরে দিগন্ত কাঁপাইয়া বলিলেন—তুই বেটী বড় বদ্; আমার দ্বারা এই কাজটী

না করালে আর হ'তো না; আচ্ছা! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তার পর কমলেশ্বরের গাত্রে হাত বুলাইয়া অতি ধীর ভাবে বলিলেন—"আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি, খুব চুপে চুপে তোর ছেলেকে এইখানে রেখে যা, কেউ যেন জান্‌তে পারে না; কেউ যেন দেখ্‌তে পায় না। আর শক্তি-সাধনার জন্য এক ঘটি গঙ্গাজল; ফুল—আর কিছু কারণ. কিছু মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিস্‌। রাত্রে আমি যে কি করিব—তাহাও যেন গোপনে দেখিতে আসিস্ না; এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিস্‌ না। কাল সকালে আসিয়া তোর ছেলে নিয়ে যাস্‌—আমাকে কিন্তু আর দেখিতে পাইবি না। তোর জন্যই এত দিন পরে আমাকে মায়ের কোল ছাড়া হ'তে হ'লো।" আর কোন কথা বলিলেন না।

হাতে স্বর্গ পাওয়াও বোধ হয় সম্ভব—কিন্তু মৃতের জীবন দান কেহ কি কখন শুনিয়াছে—ইনি কি তবে সাক্ষাৎ ভগবান্‌। কমলেশ্বর আনন্দে দিশেহারা হইয়া গৃহে গমন করিলেন—মহাপুরুষের পবিত্র হস্তস্পর্শে তাহার গাত্র বেদনা তিরোহিত হইয়াছে। কি এক অভাবনীয় আনন্দ-পুলক-হিল্লোলে তাহার দেহ ভরিয়া গিয়াছে, সে আনন্দ—সে সুখ—সে শান্তি, মর্ত্ত্যের নহে—স্বর্গের। তাই কমলেশ্বরের ভাব এত রমণীয়. প্রাণের উৎসাহ এত অভাবনীয়।

বাড়ীতে আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সকলকে কাঁদিতে বা তাহার কার্য্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া—কমলেশ্বর পুত্রের সেই বস্ত্রাবৃত মৃতদেহ কোলে করিয়া একাকী চলিলেন—ঘোরতর অন্ধকারে পদতলে আঘাত লাগিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। পুত্রকে কোলে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন—মহাপুরুষের ইঙ্গিত মত শবদেহ তথায় রক্ষা করিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে নকুলেশ্বরতলায়

বিমলানন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন। বিমলানন্দ এতক্ষণ তাহারই আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। কমলেশ্বরকে দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হ'লো বাবা! কার্য্য সফল হইয়াছে কি?"

কমলেশ্বর আনন্দ-গদ্‌গদ-চিত্তে গুরুদেবের পদে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা হইতে এখন পর্য্যন্ত পাগলের কাছে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। বিমলানন্দ শুনিয়া বলিলেন,—"আর কোন চিন্তা নাই—পুত্র জীবিত হইবে। ঐ সকল মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্, উঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র, তবে ঐ সকল লোক প্রায়ই এ প্রদেশে থাকেন না, কারণ এখানে থাকিলে উঁহাদের কাজের বড় ব্যঘাত হয়। তবে তোমার জন্যই বোধ হয় মা ভগবতী উঁহাকে এতদিন এখানে রাখিয়াছিলেন।"

কমল।—উনি বলিলেন—কাল্ আর আমাকে কালীঘাটে দেখিতে পাইবে না।

বিমলা।—প্রকাশ হইলে আর উহাঁরা সে স্থানে থাকেন না। পাছে আবার কোন ব্যাঘাত ঘটে। উহাতে তপঃক্ষয় হয় ত'?

কমল।—ঐ প্রকার ভগবৎপদবাচ্য অবধূতগণেরও কি তপঃক্ষয়ের ভয় আছে?

বিমলা।—তপঃক্ষয়ের ভয় কার না আছে বাবা! নচেৎ সহজে স্বীকার হন না কেন? আর এ কি একটা যে সে কাজ; নিজের কত শক্তি ক্ষয় ক'র্‌লে তবে একজনের জীবন দেওয়া যায়! উহাঁদের তপের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; তাই একটু আধটু গেলে ভয় হয় না—সহজেই কিছু-দিনের মধ্যে আবার সঞ্চয় করে নিতে পারেন। এ ত' আর তোমার আমার মত গরীবের ভাণ্ডার নয় যে সদাই অভাব—সদাই হাহাকার।

সঞ্চয় কিছু নাই, অথচ খরচ খুব বেশী। ইঁহারা সাধন-শক্তি এত সঞ্চয় ক'রেছেন, যে কিছু দিলে বেশী ক্ষতি হয় না—দুই চার মাস খাটিলেই আবার যাকে তাই হ'য়ে যায়। উহারা কি সামান্য, মানবাকারে ভগবান্!

কমলেশ্বর ব্রহ্মভাবাপন্ন—ভগবৎশক্তিসম্পন্ন অবধূতের শক্তির কথা গুরুর কাছে আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সাধনপ্রভাবে মানুষ যে দেবতা হইতে পারে—মানবত্বের পর দেবত্ব যে তপস্যার দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে, এতদিনের পর কমলেশ্বর তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছেন—কেহ কোন কথা প্রকাশ ক'রো না—কান্নাকাটী করিয়া লোক জানাজানি ক'রো না, আমি কি করিতেছি, না করিতেছি, ঘুণাক্ষরে তাহা প্রকাশ না হয়। ঘর-দরজা বন্ধ ক'রে—সকলে চুপে চুপে থাক। মা যদি মুখ রক্ষা করেন, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বলিব। বাড়ীর সকলকে ঐ প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া কমলেশ্বর সমস্ত রাত্রি গুরুদেবের নিকট "ব্রহ্মশক্তি" বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন কিন্তু একটা বিষম উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা—কি হয়, কি হয় ভাব যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল—সে কোথায় যাইবে—কোন্ স্থানে থাকিয়া স্থির হইবে? তবে মানব যাহার আশ্রয়ে থাকিলে চির স্থির হয়—মনপ্রাণ আশা-বারি সিঞ্চনে পরিতৃপ্তি লাভ করে—কমলেশ্বর সেই ইষ্টপদতলে বসিয়া অতীব দুঃখের রজনী বিমল আনন্দে কাটাইয়া দিলেন।

প্রাতঃকাল হইল, বিমলানন্দ বলিলেন—কমল! এইবার যাও। আনন্দ ও ভয় একত্র জড়িত হইয়া কমলেশ্বরের হৃদয় তোলপাড় করিতেছে—তিনি পূর্ণ তেজে গুরুদেবের পদধূলি লইয়া, বিশ্বশক্তির আধারভূতা—কালীমায়ের মন্দির সাত বার প্রদক্ষিণ করত গম্ভীরভাবে

শ্মশানে উপনীত হইয়া কি দেখিলেন—দেখিলেন—তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রবোধ ভয়-বিহ্বল চিত্তে জড় সড় হইয়া কাঁদিতেছে; তাহার সেই মৃত্যু মলিন পাংশুবর্ণ বদনমণ্ডল নব-জীবনের জ্যোতি বিমণ্ডিত হইয়া হাসিতেছে; মহাপুরুষের কৃপাবারি বরিষণে সে দেহের লাবণ্য জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে।

কমলেশ্বর প্রাণপুত্রকে জীবিত দেখিয়া বিষম আগ্রহে দৌড়িয়া যাইয়া তাহাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া পিতা-পুত্রে কিয়ৎক্ষণ আনন্দের কান্না কাঁদিলেন। তার পর চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—সে লতা-পাতার ঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—সে পাগল, সে দেবাদিদেব শঙ্কর-সদৃশ পূজনীয় মহাপুরুষ আর তথায় নাই।

কমলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা প্রবোধ, তোমার জীবনদাতা এবং আরাধ্য দেবতা সেই পাগল কোথায় গেলেন?

তখনও প্রবোধের প্রাণ ভয়শূন্য হয় নাই। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—একজন ভীষণকায় কৃষ্ণবর্ণ লোক সমস্ত রাত্রি আমাকে খুব যত্ন করিয়া কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন; এই দেখুন—কত ভাল ভাল খাবার দিয়েছিলেন কিন্তু ভয়ে আমার প্রাণ শুখাইয়া গিয়াছে—আমি কিছুই খাই নাই। তার পর রাত্রি যখন প্রভাত হয়—সেই সময় তিনি বল্লেন—প্রবোধ! তুমি বসো, তোমার বাবা এখনি আস্‌বেন; আমি যাই। এই বলিয়া সেই যে তিনি অনেকক্ষণ চলে গেছেন—কই আর ত' এলেন না; বাবা, বাবা! আমার এখানে আস্‌বার কারণই বা কি?

কমলেশ্বর পুত্রকে বলিলেন—তাঁহার কৃপায় তুমি প্রাণ পাইয়াছ। রাত্রিতে তিনি কেমন করিয়া তোমায় জীবিত করিলেন—তাহা কিছু জান কি, তাহার কোন ক্রিয়া দেখিয়াছ কি?

প্রবোধ না বাবা! তার কিছুই টের পাই নাই; তবে যতক্ষণ রাত্রি ছিল—সেই কালো চেহারা যেন কষ্টি পাথরের মত জ্বল্‌ছিল—মানুষের গায়ে এমন জ্যোতি আমি আর কখনও দেখি নাই; অমন মধুর কথাও কখন শুনি নাই। বাবা, বাবা! তিনি কে?

কমল। বাবা! তা যদি জান্‌তে পারতাম, তাহ'লে আর তোমার মৃত্যুতে এত কেঁদে আকুল হবো কেন, আর সে দেবতাই বা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবেন কেন? চল, এখন বাড়ী গিয়া কালীমায়ের পূজা দিই-গে।

এই বলিয়া পিতা-পুত্রে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কল্য রজনী-যোগে যে মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া কমলেশ্বর বিষম শোকে অধীর হইয়া শ্মশানে আসিয়াছিলেন, আজ ততোধিক আনন্দ চিত্তে সেই প্রাণের পুত্রকে জীবিত লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। ঈশ্বর-সদৃশ মহা-পুরুষের কৃপায় আজ কালীঘাটে অঘটন ঘটিয়া গেল, মৃতজীব প্রাণ পাইল।

এ কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না। তখন সকলে কালীঘাটের আনাচে কানাচে, পাগল যেখানে যেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত, যে গলি-ঘুঁজিতে ঘোরাফেরা করিত—অন্বেষণের সাড়া পড়িয়া গেল। চারি দিকে লোক ছুটীল কিন্তু সে দেবদর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম—পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া হেলায় হারাইলাম বলিয়া সকলে মহা দুঃখে হাতে কামড়াইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মাতৃপূজা।

পুত্রশোকে মৃতপ্রায় মাধুরী একমাত্র পুত্র প্রবোধচন্দ্রকে নবজীবনে কোলে করিয়া আনন্দে কিরূপ অধীর হইলেন—মহাপুরুষের কৃপা; তাঁহার ধর্ম্মতেজ দেখিয়া ধর্ম্মভাবে কিরূপ বিভোর হইলেন—তাহা ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য! এ অভাবনীয় অঘটন ঘটনা যাহার হইয়াছে—সেই জানে ইহা কত আনন্দপ্রদ। আমরা কেবল মানুষের অমানুষিক শক্তি দেখিয়া, সাধনবলের প্রবল প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবি, ভারতই কেবল এককালে এই শক্তি-সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল। হায়! কি ছিল আর কি হইয়াছে? মানুষের এমন দেবত্ব কেবল ভারতের সাধকই লাভ করিতে পারিয়াছে, তাই ভারত সকল দেশের মুকুটমণি, সাধন-ভজনের আদর্শ জননী।

হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কমলেশ্বর একদিন বিধিমতে মাতৃপূজার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পিতার সপিণ্ডীকরণের আর বেশী দিন নাই। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে একটা মহা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। সৌদামিনী মাতৃবর-অঙ্গ সসাজ গহনা দিয়া সাজাইবেন, মানসিক করিয়াছিলেন। কমলেশ্বর সেই সকল গহনা গড়াইতে লাগিলেন।

গ্রহবৈগুণ্য কাটিয়া গিয়াছে, ভবানীপুরের ভট্টাচার্য্য-গৃহে আবার আনন্দের বিজয়-কাড়ার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে অপয়া-ভবন চিরতরে ত্যাগ করিয়া দারাগঞ্জে যাইবার জন্য কমলেশ্বর কৃত-নিশ্চয় হইয়াছিলেন, আজ সেই গৃহে আবার মহা উৎসবের আয়োজন হইতে

লাগিল। গৃহের প্রত্যেক কক্ষ আত্মীয়-স্বজনের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দাদার বংশ রক্ষা হইল, প্রবোধ মায়ের কোলজোড়া হইয়া পুনরায় জীবিত হইল দেখিয়া—নির্ম্মলার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু যে এই আনন্দ প্রদানের কর্ত্তা—যিনি প্রবোধের জীবনদাতা, তিনি কে? সে অবধূত-প্রধান কি আমাদের প্রাণের দেবতা! তিনি যাঁহার অন্বেষণে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছেন—তিনি যে আমাদেরই কাছে আছে, গৃহের আশে পাশে ঘুরিতেছেন, পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া পিতা কি কখনও দূর দেশে ঘুরিতে পারেন? এ সময় তিনি দেশে থাকিলে নিশ্চয়ই এ পালান ধনকে ধরা যাইত কিন্তু দাদা যেরূপ চেহারা বলিলেন—আমাদের প্রাণের দেবতা ত' সেরূপ নন্। অথবা দেবতা যে বহুরূপধারী, যে মৃতের প্রাণ দিতে পারে—ইচ্ছা করিলে সে কি আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য চেহারা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহার নিকট অসম্ভব কি? নির্ম্মলা মনে মনে কেবল অবধূতের বিষয় তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, এরূপ অমানুষিক অদ্ভুত শক্তি গুরুদেব ভিন্ন আর কাহারও নয়।

একদিন শুভদিনে কালীঘাটে মায়ের পূজা খুব সমারোহে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। মাতৃযজ্ঞে আজ বিমলানন্দ হোতা হইয়াছেন; অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রজনী, তান্ত্রিক-সাধনার প্রশস্ত সময়, বিমলানন্দ আজ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া জপ-যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। লক্ষ জপ, পুরশ্চরণ হোম প্রভৃতি কার্য্য হইতে লাগিল। হিন্দুর মহাপীঠ স্থান নকুলেশ্বরেও উৎসব বড় কম হইতেছে না। যেখানে যত পীঠস্থান আছে, সতী অঙ্গ পতনে যে যে স্থান পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই ভগবান শঙ্কর ভৈরবরূপে, আর শঙ্করী দেবীমূর্ত্তিরূপে বিরাজিতা, এই সকল স্থানে যুগল-মূর্ত্তি সমভাবেই পূজা প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন, পীঠস্থানে পীঠ-দেবতা দেবাদিদেবের পূজা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইনি পীঠস্থানের আসল দেবতা কিন্তু যাহারা জানে না, তাহারা মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার পূজা দিয়া ফিরিয়া আসে, বাবার প্রতি ততদূর আকৃষ্ট হয় না, জানে না বলিয়া, তাঁহার পূজায় তাহারা তত আড়ম্বর করে না।

সাধন কার্য্যে সুনিপুণ বিমলানন্দ তাহা বিশেষরূপে অবগত, তাই ভূতভাবন ভোলানাথের পূজার আয়োজনও বিশেষভাবে করিয়াছেন। মৃত প্রবোধচন্দ্রের জীবন লাভের পর কালীঘাটে একটা মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই জানিতে পারিয়াছে—হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও ঈশ্বর-জ্ঞানিত শক্তিশালী সাধক বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা প্রায়ই পীঠস্থানে অতি প্রচ্ছন্নভাবে, লোকের অজ্ঞাতসারে থাকিয়া তীর্থস্থানের মহিমা বর্দ্ধন করেন, ঠিক চিনিয়া ধরিতে পারিলে তাঁহাদের দ্বারা অসাধ্য কার্য্য সকলও সুসাধ্য হইয়া থাকে। কমলেশ্বরের মাতৃযজ্ঞে তাই আজ দলে দলে লোক সমাগত হইতেছে, যে শুনিতেছে সেই সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়ের পূজা দেখিতে আসিতেছে। অমাবস্যার এই দুর্গম অন্ধকারেও কালীঘাট লোকে লোকারণ্য।

কমলেশ্বর আজ যাজ্ঞিকরূপে সকলের সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন। সৌদামিনী, নির্ম্মলা, মাধুরী আজ স্বাধীনভাবে একবার মায়ের মন্দির দ্বারে, একবার বাবার পীঠ-চত্বরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আর যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে—সেই প্রবোধচন্দ্র, ভবানন্দের সহিত প্রাণের আনন্দে নাটমন্দিরে বসিয়া বিমলানন্দের মাতৃপূজার ঐকান্তিকতা দর্শনে আত্মহারা হইতেছে। বিমলানন্দও যে সে সাধক নহেন, প্রকারান্তরে তিনিই প্রবোধের জীবনদাতা বলিতে হইবে, তিনি অবধূতকে ধরাইয়া না দিলে শিবতুল্য এই সাধকের সন্ধান বলিয়া না দিলে, কে তাঁহাকে ধরিতে

পারিত, আর প্রবোধচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করিতই বা কাহার বলে। অতএব সাধন বিষয়ে বিমলানন্দও যে একজন কৃতকর্ম্মা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাগল এতদিন কালীঘাটে ছিলেন; পাগলের ভাণ করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন—কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, কেবল বিমলানন্দই চিনিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ পাগল বড় সহজ নহে। এইরূপ পাগল হইতে না পারিলে, অহঙ্কার-অভিমান ভবরাণীর ভাবনাসাগরে এইরূপ করিয়া ডুবাইয়া দিয়া তন্ময় হইতে না পারিলে, সোহংভাবে ঈশ্বর সদৃশ হওয়া যায় না। অতএব এ ভাবের ভাবুককে যে চিনিতে পারে সেও কি কম সাধক? বিমলানন্দ নকুলেশ্বরতলায় বসিয়া থাকিতেন—কমলেশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহাকে তত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত না, তিনি তাহার জন্য তত প্রয়াসীও ছিলেন না কিন্তু সেইদিন হইতে বিমলানন্দকেও সকলে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাঁহার মহত্ত্ব বাড়াইতে লাগিল।

কালীঘাটে এই পাগলকে সকলেই দেখিয়াছিল; সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী ছুতাহাড়ী কুড়াইয়া প্রত্যেক দোকানে ভিক্ষা করিত, কাহারও সহিত কথা কহিত না। ঐ হাঁড়ীতে যে যাহা দিত—চাল, ডাল, ফলমূল, মিষ্টান্ন, মৎস্য, মাংস সমস্ত একত্র লইয়া কেওড়াতলার শ্মশানে যাইয়া তাহার দ্বারা খিচুড়ী রন্ধন করিত; পাক শেষ হইলে সে সঙ্গের কুকুরটীর সহিত একত্র ভোজন করিত। শ্মশানে একটী ছুতার হাঁড়ির ঘর করিয়াছিল—সন্ধ্যার পর তাহারই মধ্যে অবস্থান করিত—আর বাহির হইত না। কমলেশ্বর এই অবস্থায় সেদিন তাহাকে ধরিয়াছিলেন—তখনও যে তিনি তাঁহার ভগবদ্বিভূতি বা যোগ-সাধনার কোনও প্রকার আড়ম্বর দেখিয়াছিলেন—তাহাও নহে। রাত্রের মরা মানুষ

বাঁচাইবার ক্ষমতা—তখনকার অমানুষিকশক্তি কেহ দেখে নাই—তাহার বিষয় বলিতেও পারে না। তবে প্রবোধ বলে—যখন তার চৈতন্য হইল—কি এক স্বর্গীয়ভাবে শ্মশান-সৈকত পরিপূর্ণ হইয়াছিল; কি এক স্বর্গীয় সুরভি-গন্ধে সেখানকার বায়ু গন্ধময় হইয়াছিল—যাহার আঘ্রাণ করিলে—প্রাণ নবশক্তিসম্পন্ন হয়; তখন পাগল কেবল আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছিল—সে নৃত্য দেখিলে সাধারণ লোকের ভয় পায়—আমারও পাইয়াছিল—আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম। তার পর তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া উষার আলোক-আঁধারে যে কোথায় মিশিয়ে গেলেন—আমি আর দেখিতে পাইলাম না। প্রাণভয়ে জড়সড় হইয়াছিলাম—তাঁহাকে ধরিবার জন্য আমি আর কোন চেষ্টা করি নাই। আমি যে মরিয়া গিয়াছিলাম—তিনি যে আমার জীবনদান করিয়াছেন—জানিলে কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম? পূজা যত দেখা হউক, আর নাই হউক, সকলে প্রবোধের কাছে বসিয়া সেই মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন।

প্রাণে অনেক রকমের ভাব লইয়া অনেক লোক সেদিন কালীঘাটে আসিয়াছিল—কেহ বা পূজা দেখিতে, কেহ উৎসব দেখিতে, আর কেহ বা প্রবোধকে দেখিতে আসিয়াছিল। রজনীর গভীরতা যত বাড়িতে লাগিল—জনসঙ্ঘ ততই কম হইতে লাগিল। তখনও বিমলানন্দ মায়ের সম্মুখে; ত্রিজগৎ-পূজিতা, আদ্যাশক্তির পদতলে বিভোর-প্রাণে আত্মহারা; কাহারও সাড়াশব্দ নাই—মায়ে-পোয়ে যেন একপ্রাণ, একজীব হইয়া কত কথা, কত আত্ম নিবেদন; কথা কি আর ফুরায়; প্রাণের কবাট খুলিয়া পুত্র-প্রাণময়ী মাকে প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছে; এ প্রাণ মন ভোলা আত্মানন্দের আনন্দানুভূতি সাধক কি ছাড়িতে পারে—ক্ষণে ক্ষণে দেহ কণ্টকিত, মন আনন্দিত, হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে; স্তিমিত

নেত্র-যুগল হইতে প্রেমবারি উথলিয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে। কমলেশ্বরও সেইভাবে পড়িয়া মায়ের দুয়ারে গড়াগড়ি খাইতেছেন—এ দৃশ্য এক অপূর্ব্ব—শোভার এক অত্যাশ্চার্য্য, না দেখিলে বর্ণনায় বুঝান যায় না। ওদিকে নকুলেশ্বরতলায় বিরূপাক্ষ ভগবান সদাশিবের সাধনায় বিভোর, নির্ম্মলা প্রাণ-মন এক করিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহারও বুঝি জ্ঞান নাই—পাশে পুত্র বাসুদেব বিরূদাদার পূজা দেখিতেছে। পবিত্র গন্ধামোদে দিক্ উদ্ভাবিত; মায়ের মন্দিরে কমলেশ্বর জননী, পত্নী ও পুত্র লইয়া, আর হেথায়—নির্ম্মলা পুত্রের সহিত বসিয়া ভাবিতেছেন—এই সময় তিনি থাকিলে, মাতৃযজ্ঞে যোগদান করিলে কত সুন্দর হইত—বোধ হয়, আজিকার এ মাতৃযজ্ঞে তিনি পূর্ণাহুতি দিলে সোণায় সোহাগা হইত—হায়! তিনি এখন কোথায়? নির্ম্মলার পতি ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পূজায় বসিয়া বসিয়া কেবল তিনি সেই আরাধ্য-পদে পুষ্পাঞ্জলি দেন—অন্য ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয় না, সতী যে অনন্যশরণা। এই তন্ময়তা-গুণেই ত' তাঁহারা জগৎ-পূজিতা।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন কালীঘাট এমন সহরে পরিণত হয় নাই; বড় বড় রাজপথ সকল এমন বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া ট্রামগাড়ী চালনায় লোকের গমনাগমনের এত সুবিধা করিয়া দেয় নাই। তখন কত মহা মহা সাধক, মায়ের আনন্দ-দুলাল পুত্ররূপে আসিয়া ইহার রেণু স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও পবিত্র করিতেন—দেশ বিদেশ হইতে, এমন কি হিমাচলের পাদদেশ হইতে মাতৃময়প্রাণ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও এই মহাপীঠের ধূলি অঙ্গে মাখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন, সে আজ অনেক দিনের কথা। যেখানে যত মাতৃভক্ত সাধকের সমাগম—সে পীঠস্থানের মাহাত্ম্য তত বেশী, সেখানকার দেবী তত জাগ্রতা—সাধক না হইলে মাকে জাগায় কে?

রাত্রি অনেক হইয়াছে, বাহিরের লোক সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের পূজা; যাহারা প্রাণ লইয়া পূজায় বসিয়াছিলেন—তাহারাই আছেন; আর আছে—তাহাদেরই উদ্যোগ-আয়োজনকারী জনসমূহ, তাঁহারাই প্রাণ দিয়া পূজায় ব্রতী রহিয়াছেন। এমন সময় ধীরে ধীরে নকুলেশ্বরতলায় এক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি "বোম ভোলানাথ" বলিয়া ত্রিশূল রক্ষা করিয়া ভগবচ্চরণে প্রণিপাত করিল। অঙ্গের সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া পড়িতেছে; আনন্দময় পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া বাসুদেব তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল এবং এবং চিনিতে পারিয়া সাগ্রহে বলিল—বাবা! বাবা। আপনি আসিয়াছেন—আজ আমাদের পূজা সার্থক হইল। নির্ম্মলা এতক্ষণ ধ্যানস্থা ছিলেন—পুত্র প্রাণের আহ্বান শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে তাঁহার চির-আরাধ্য মূর্ত্তি, রূপের প্রভায় মন্দির-চত্বর উজ্জ্বল করিয়াছেন। সতী শিবারাধনার ফললাভ করিয়া শশব্যস্তে পদে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—নির্ম্মলা! বাবা আমাদের এত কাছে আসিয়াছিলেন—না জানিয়া আমি দেশ-বিদেশে বৃথা ঘুরিয়া আসিলাম। প্রধান প্রধান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন মহাতীর্থ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম—পর্ব্বতগাত্রে লেখা রহিয়াছে—"আমি কালীঘাটে যাইতেছি" দেখিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছি, কই তিনি, কোথায় আমাদের প্রাণের প্রাণ আরাধ্য-দেবতা, নির্ম্মলা! তাঁহারই দর্শনে কি তোমরা এই মহাপীঠে আসিয়াছ? প্রবোধের প্রাণদাতা অবধূতের বিষয়ে নির্ম্মলা মনে মনে যে সন্দেহ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা নিরাকৃত হইল দেখিয়া বলিলেন—স্বামিন্! প্রভু আমাদের কাছে কাছেই ছিলেন—আজ কয়েকদিন হইল—তিনি এক অত্যদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারই মহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য দাদা আজ এই মাতৃযজ্ঞে

দীক্ষিত; স্বয়ং মহাপুরুষ বিমলানন্দ আজ এই যজ্ঞের হোতা—আর তোমার প্রাণের ছাত্র বিরূপাক্ষ তাঁহার সহায়করূপে ব্রতী হইয়াছেন। বোধ হয়—তুমি থাকিলে প্রভু আমাদের এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিতেন না!—বলিয়া নির্ম্মলা স্বামী-সকাশে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

দূরদেশের তীর্থ-ভ্রমণ শেষ করিয়া রামেশ্বর আজ মাতৃ-মন্দিরের এই মহাতীর্থে তাঁহার প্রাণের দেবতার প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন—এ শক্তির নিকট দেব-শক্তিও বুঝি হার মানিয়া যায়। মানুষ সাধনা করিলে যে দেবতার চেয়েও বড় হইতে পারে—আজ গুরুদেবের শক্তিই তাহার প্রধান পরিচয়! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—নির্ম্মলা! এ ক্ষেত্রে তিনি দর্শন দিতেন না—পাছে প্রকাশ হইয়া পড়েন—তাই পলাইয়াছেন। তবে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে তিনি যে আসিযাছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; চল, মাতৃ-মন্দিরে একবার সাধকপ্রবর বিমলানন্দের সহিত দেখা করিয়া ধন্য হই। বিরূপাক্ষ ভগবান সদাশিবের পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া গুরুদেবের পদধূলি মাথায় দিলেন। তার পর সকলে মাতৃ-মন্দিরে উপস্থিত! কমলেশ্বর তাঁহার প্রাণের ভগ্নীপতিকে দেখিয়া আনন্দবিহ্বল চিত্তে বলিলেন ভাই! এসেছ; আমাদের পূজা সার্থক; বিপদের পর সম্পদ এই রকমেই আসে।

রামেশ্বর। সম্পদ বিপদের কর্ত্রী যে মা, পরীক্ষার জন্য তিনি বিপদে ফেলেন—আবার পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া উদ্ধার-বার্ত্তা তিনিই বলিয়া দেন; এ সব তাঁরই খেলা। তার পর পরলোকের পথ-প্রত্যাবৃত্ত প্রবোধকে কোলে লইয়া বলিলেন—বাপ ধন! দেবতার আশীর্ব্বাদে তুমি যমজয়ী হইয়াছ; এ আশীর্ব্বাদ জীবনে কখনও ভুলিও না।

মাধুরী ও সৌদামিনী বহুদিনের পর এই আনন্দের দিনে আনন্দময়ীর বর-পুত্রকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। তার পর রামেশ্বর মন্দির-দুয়ারে গমন করিয়া সেই সন্তানবৎসলা শবাসনার পদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিমলানন্দকে "নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

বিমলানন্দ বহুপূর্ব্বে কমলেশ্বরের মুখে রামেশ্বরের সাধন-ভজনের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন—"স্বাগতম্" আজ মাতৃ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য সুসময়ে আপনার আগমন; যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করুন; ঐ দেখুন—আপনাকে দেখিয়া মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না; বেটী যেন আনন্দে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।

রামেশ্বর সাধক বিমলানন্দকে বিশেষভাবে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন' স্মেরাননা শবাসনা আজ কৃতিপুত্রগণের দ্বারা প্রাণের স্তুতি-ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-ভরে মন্দির প্রোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

তার পর প্রাতঃকালে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, আদিগঙ্গায় স্নান সমাপন করিয়া সাধক-সাধিকাগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রামেশ্বর কয়েক দিন কমলেশ্বরের ভবানীপুরের বাটীতে বিমলানন্দের সহিত অবস্থান করিয়া দেবীপুরে রওনা হইলেন। শব-সাধনায় সুসিদ্ধ করিয়া রামেশ্বরকে ভগবতীর চরণে সমর্পণ করিয়া দিবেন, মায়ের অদর্শনে আর এমন করিয়া প্রাণের বেদনা পাইতে হইবে না। সত্যসন্ধ অবধূত এইজন্য আসিয়াছেন, রামেশ্বর আর কালবিলম্ব করিলেন না।

ওঁ স্বঃ।

তৃতীয় খণ্ড।

বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

দিব্য বা সাত্ত্বিক ভাব।

ব্রহ্ম-তন্ময়ত্ব।

ভক্তিযোগ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তন্ত্র-মাহাত্ম্য।

কলিতে তন্ত্রমতে উপাসনাই প্রশস্ত। কামনা-বাসনার মালা পরিয়া, একাধারে ভোগ ও যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইতে হইলে, তন্ত্রের সাধনাই একান্ত অবলম্বনীয়। ভগবান সদাশিব তাই অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল কলি-জীবের পক্ষে তান্ত্রিক-সাধনাই আশু সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই। যতদিন সাধনা-ভজনা, যতদিন উপাসনা-আরাধনা, ততদিনই জীবের শক্তি-ভাব। যখন এ সমস্ত বিষয় অতিক্রম করিয়া জীব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মময় হয়, তখন তাঁহার বৈষ্ণবাবস্থা, অতএব শাক্ত না হইলে ব্রহ্মভাবের ভাবুকত্ব নিষ্ক্রিয় সোঽহংভাব জীবের আসিতে পারে না। ব্রহ্মময়ীর উপাসনা ভিন্ন—পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শক্তিকে না জানিয়া শক্তীশ্বরের সাক্ষাৎ কে কবে পাইয়াছে? মাকে না পাইয়া বাবার সন্ধান করা পাগলের পাগলামী ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? মা-ই ত' বাবাকে জানাইয়া দেন, তবে সন্তান পিতৃপূজার অধিকারী হয়? ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মের চিৎশক্তি, তাঁহাকে জানিতে পারিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান, নতুবা চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া কেবল অন্ধকারের ভাবনা করাই সার।

ভক্ত হইতে হইলে আগে শাক্ত হইতে হয়—নতুবা বিষ্ণুভক্তি প্রদান

করিবে কে? মা যে আমার বিষ্ণুভক্তি প্রদানের গোড়া; নারায়ণী মাকে স্তুতি-মিনতি, তাঁহার ধ্যান-ধারণা, সাধনা-ভজনা না করিলে অহৈতুকী-ভক্তি প্রদানে মানবজীবন ধন্য করিবার শক্তি কাহারও নাই।

মায়ের সোহাগেই ত' বাপের আদর লাভ করা যায়—মা বিরূপ হইলে সন্তানের আশা ভরসা নাই। এইজন্য তন্ত্রমতে উপাসনা করিয়া সাধনার যথার্থ ফল লাভ করা উচিত। ভগবান্ মহাদেব এইজন্য কলিতে তন্ত্রমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সকলকে শাক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। দুর্ব্বল দেহে মাতৃশক্তির সঞ্চার না হইলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। শক্তিই সব; বিশেষতঃ দ্বিজমাত্রেই যে শাক্ত—"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে" এ ছাড়া যে তাহাদের উপায় নাই; গুরু বলিয়াছেন—তন্ত্রে এমন সাধন-প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে—যাহার সাহায্যে জীব এক দিনেই ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভে চরিতার্থ হইতে পারে। আজীবন কঠোর যোগ-সাধনা করিয়া সাধক যাহা করিতে না পারে, তন্ত্রের সাধনায় যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া, সাধক এক রাত্রির শব-সাধনায় সেই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হইতে পারে। এই শব-সাধনাই তন্ত্রে শক্তি-সাধনা নামে অভিহিত।

রামেশ্বর সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সে দিন কালীঘাটে মাতৃচরণ দর্শন করিতে আসিয়া যাহা শুনিয়াছেন—তাহাতে গুরুদেব যে তাঁহার জন্য আবার আসিয়াছেন—এ অমানুষিক দৈবশক্তি যে তাহার গুরুদেব ভিন্ন আর কাহারও নয়—তাহা তাহার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে। শক্তি-উপাসকের ক্ষমতা এইরূপই অদ্ভুত; মা-ময়-জীবন সাধকের শক্তির নিকট দেবশক্তিও পরাভূত হয়।

এত কাছে কাছে থাকিয়া যখন এত অদ্ভুত খেলা খেলিতেছেন—তখন এ দাসকে কৃতার্থ করিতে বোধ হয় আর কৃপণতা করিবেন না।

তিনি বলিয়াছিলেন—তন্ত্রোক্ত কাম্যকর্ম্মের মধ্যে বীর-সাধনাই শ্রেষ্ঠ ও সদ্যঃফলপ্রদ। শব-সাধনা, চিতা-সাধনা, যোগিনী-সাধনা, ভৈরবী-সাধনা ও শ্মশান-সাধনা এই কয়টীকেই তন্ত্রে বীর-সাধনা বলে—তীর্থভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে ইহার একটী না একটী সাধনার উপায় বলিয়া দিয়া ত' তিনি আমাকে কৃতার্থ করিবেন বলিয়াছিলেন। আমি যে আসিয়াছি তাহা তাঁহার অবিদিত নাই—অন্তর্য্যামী দেবতা সকলই জানিতে পারিয়াছেন—পরম জ্ঞানী অবধূত সন্ন্যাসীর এ জগতে অজানিত কি আছে?

কমলেশ্বর এখন আর কলিকাতায় নাই; বহুদিনের পর বিমলানন্দের সহিত একবার জন্মস্থান এলাহাবাদ দর্শন করিতে গিয়াছেন। সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্যও ত' একবার দেখিয়া আসা উচিত, নতুবা পরের দ্বারা চিরকাল সমভাবে কাজ কেমন করিয়া চলিবে? এইজন্য সপরিবারে মনের আনন্দে জন্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন; গুরুদেব বিমলানন্দও সঙ্গে গিয়াছেন। যে গুরু, পুত্রের মৃত্যুদ্বার রোধ করিয়া নবজীবন লাভের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন—পরমভক্ত কমলেশ্বর কি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? অনেক অনুরোধ উপরোধ করায় বিমলানন্দও একবার প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিবার জন্য প্রিয় শিষ্য কমলেশ্বরের সহিত এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। টাকাকড়ি বিষয়-বৈভবের মায়া তাঁহার এখনও তিরোহিত হয় নাই।

রামেশ্বর ও নির্ম্মলার সংসারের অসার ভাবনায় চিত্ত আর অস্থির নহে। রামেশ্বর কালীঘাট হইতে আসিয়া কেবল ভাবেন—গুরুদেব যদি আসিয়াছেন—এত কাছে কাছে রহিয়াছেন—তবে দর্শন দেন না কেন—তিনি নিজে ধরা না দিলে—চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা, তাঁহার দর্শনলাভ করা ত' সহজ নয়; সংসারী জীবের সাধ্য

নাই যে তাঁহাকে ধরিতে পারে। তবে উপায় কি নির্ম্মলা—কতদিন আর এমন ক'রে প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব—মাতৃদর্শন কি এ হতভাগার ভাগ্যে নাই ?

নির্ম্মলা স্বামীকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন—যখন তিনি আশা দিয়াছেন—তখন নিশ্চয়ই আশা মিটাবেন—মহাপুরুষের কথা কখনও নড়চড় হয় না—এই দেখ না, দাদাকে যাহা বল্লেন—তার কি কোন অন্যথা হ'লো ? একজনের উপকারের জন্য নিজে কিরূপ ক্ষতি স্বীকার, কিরূপ তপঃক্ষয় ক'র্লেন বল দেখি ? যিনি জীবের মঙ্গলের জন্য এতদূর ত্যাগ স্বীকার ক'র্ত্তে পারেন--আর পুত্রকন্যাকে আশা দিয়া নৈরাশ করা কি তার পক্ষে সম্ভব ? তবে এখনও বোধ হয় সময় হয় নাই ; তাই দেবতা দর্শন দিচ্ছেন না। যখন আমাদের মন তাঁর দর্শন লাভে এত উতলা হ'য়েছে—তখন আর ভাবনা নাই ; আমরা যে এত আকুলি বিকুলি কচ্ছি—তা তিনি নিশ্চয়ই জান্‌তে পার্‌ছেন।

রামেশ্বর। অন্তর্য্যামীর নিকট অন্তরের ভাব কি গোপন থাকে ? আমরা জানবার আগে তাঁর অন্তঃকরণ সমস্তই জান্‌তে পেরেছে। কিন্তু কেন যে এত দেরী কচ্ছেন—তা' ত বুঝ্‌তে পারছি না। এতদিন পশুভাবে কাট্‌লো, তমোগুণের আশ্রয়ে এতদিন সংসার খেলা কর্‌লাম। এখন বয়স প্রায় চল্লিশের উর্দ্ধ হ'য়েছে—তিনি ত' বলেছিলেন—গার্হস্থ্যের শেষ ও বাণপ্রস্থের মাঝামাঝি বীরভাবে সাধনা করবার সময়—তা ত' আমার হয়েছে—নির্ম্মলা, তবে কই তিনি, কই আমাদের প্রাণের আরাধ্য-দেবতা ?

নির্ম্মলা। ভক্ত ডাক্‌লে—মনে প্রাণে চিন্তা ক'র্‌লে—ভগবানের আসন নিশ্চয়ই টলে ; এস আমরা অনবরত তাঁহারই নাম জপমালা করি—তা হ'লে তিনি না দেখা দিয়ে কখনই থাক্‌তে পারবেন না।

রামেশ্বর। হাঁ নির্ম্মলা! তুমি ঠিক বলেছো; তাঁহাকে ডাকাই আমাদের ঠিক হ'চ্ছে না; ভক্ত ডাক্‌লে কি ভগবান স্থির থাকৃতে পারেন? তোমার দাদার দেশে যাবার জন্য এ কয়দিন আমরা ঠিকভাবে তাঁকে ডাকৃতে পারি নাই—আজ থেকে এস, একান্তমনে তাঁরই শরণাপন্ন হই—দেখি দেবতা কেমন দেখা না দিয়ে থাকৃতে পারেন।

সন্ধ্যার পর গৃহদেবতার শীতল ও আরত্রিক কার্য্য এবং নিজের সন্ধ্যা-বন্দনা, ইষ্টমূর্ত্তি সমীপে সহস্র মালা-জপ শেষ করিয়া রামেশ্বর বিল্বমূলে আসিয়া বসিলেন। এই দেবীবোধনের স্থান বিল্বমূলই রামেশ্বরের জুড়াইবার স্থান—প্রাণ যতই উতলা হউক না কেন, শোকদুঃখে কাতর হইয়া হৃদয় যতই যাতনা অনুভব করুক না কেন, এই শান্তিময় বিল্ববৃক্ষ-তলে উপবেশন করিলেই রামেশ্বরের প্রাণ সুশীতল হয়, মন শান্তিনীরে অবগাহন করিয়া সংসারিক সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়। হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে কি এক স্বর্গীয় আনন্দের প্রাণমন বিমোহন সুধাধারা সিঞ্চিত হয়—তাহা অব্যক্ত; রামেশ্বর সেই সুধাপানে বিভোর হইয়া আপনহারা হইয়া পড়েন, তাই আজ প্রাণের আবেগে হতাশ-চিত্তে সেই সেই আশা-তরুতলে আবার আসিয়া বসিলেন।

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" প্রাণের পুত্র বাসুদেব—এখন অনবরত বিরূদাদার কাছে অধ্যয়ন করে। অধ্যয়নই এখন তাহার তপস্যা। কাজেই সন্ধ্যার পর তাহাকে খাবার দিতে হইবে—সে সকাল সকাল আহার করিয়া চতুষ্পাঠীতে বিরূপাক্ষের নিকট পড়িতে যাইবে—কাজেই নির্ম্মলা আর বিলম্ব করিলেন না; তাড়াতাড়ি পুত্রের আহ্বানে রন্ধন-শালায় গমন করিলেন। গৃহস্থাশ্রমে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য না পাইলে তাঁহার পবিত্র প্রাণের আশা-বাণী না শুনিলে—গৃহী কি ধর্ম্মের সংসার স্থাপন করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে? না শক্তির অমিত তেজে

তেজীয়ান হইয়া শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে পারে ? জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী—একাধারে এই শক্তিই যে সমষ্টিরূপে সংসারীর শোকে—সান্ত্বনা, বিপদে—ভরসা, সম্পদে – সখারূপে মর্ত্ত্যে মানবের সকল কার্য্যে সহানুভূতির হস্তপ্রসারণ করিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন—নতুবা তাঁহাদের বরাভয়যুক্ত হস্তের কল্যাণপ্রদ ভাব চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়িলে, হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন এত সুখময় হইত না।

বাসুদেব আহারাদি করিয়া বিরূদাদার কাছে পড়িতে গেল; প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি তথায় পাঠ করিয়া কোন দিন বা সেইখানে শয়ন করে—কোন দিন বা জননীর নিকট আগমন করে। বিরূপাক্ষ তাহাকে ঠিক ছোট ভাইয়ের মত যত্ন করে—প্রাণ খুলিয়া অধ্যাপনা করান। বিরূপাক্ষের যে আর কেহ নাই—রামেশ্বর ও নির্ম্মলাই যে তাঁহার সব, পিতা মাতা, আশ্রয়দাতা গুরু। তাঁহাদের প্রাণের পুত্রকে বিরূ যে কিরূপ ভালবাসিবে—তাহা সহজেই বিবেচ্য। রামেশ্বর বিরূকে প্রাণ খুলিয়া শিক্ষাদান করিয়া এবং গুরুরূপে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছেন। বিরূপাক্ষ এক্ষণে পণ্ডিত—শিক্ষিত-সমাজে তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি যথেষ্ট; চতুষ্পাঠীর ভার তাঁহারই উপরে ন্যস্ত। সন্ধ্যাহ্নিক, জপ, পূজায়ও বিরূ খুব একাগ্রচিত্ত; নির্ম্মলা এইজন্য প্রাণের কুমারকে তাঁহার কাছে দিয়া বিশ্বাস করেন—বড় ছেলেটীর কাছে ছোট ছেলেটী রহিল—ইহাতে দোষ কি ? দাক্ষায়ণীর শরীরটা এ কয়দিন ভাল নাই; পূজনীয় দাদার ও বড়বউয়ের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার শরীরটা কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রামেশ্বর প্রতিদিন তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করেন—নির্ম্মলাও সেবার ত্রুটী করেন না—আর ভুবনেশ্বরী ত' অনবরত কাছে আছেনই। রাত্রে ছাত্রবর্গের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে নির্ম্মলা দাক্ষায়ণীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতেন।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত; সকলে যখন নিদ্রার কোমল-কোলে নিষুপ্তি হইল; অমাবস্যার ঘন অন্ধকার যখন চারিদেকে ঘোর-রূপে ঘনাইয়া আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিল, একটী প্রাণীও যখন আর জাগ্রত নাই; নির্ম্মলা তখন চারি দিকের অর্গলবদ্ধ করিয়া সেই বিল্বমূলে স্বামীর পদতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দেবানন্দের পুরাতন ভদ্রাসন তিন মহল। প্রথম—অন্দর, দ্বিতীয়—পূজাবাড়ী, এখানে দেবমন্দির, ভোগের ঘর, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, মধ্যে বেদীবেষ্টিত সেই বোধন-বৃক্ষ; তৃতীয় মহলে অতিথিশালা, চতুষ্পাঠীও একখানি বৃহৎ আটচালা—দেবীপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার পর পূর্ব্ব দিকে সর্ব্বেশ্বর ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; দুই দিকে দুই পুষ্করিণী এবং চারি দিকে পুষ্প ও ফলের বাগান—বসতবাটী একটী মাঠ জোড়া বলিলেই হয়।

রামেশ্বর চিরকালই একাহারী, রাত্রিতে দেবতার প্রসাদ মাত্র জলযোগ করিতেন; নির্ম্মলা আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ স্বামীকে প্রদান করিলেন। রামেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসাদ জলযোগ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং সেই শুভ্রমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিবরূপ গুরুদেবের চিন্তায় চিত্ত স্থির করতঃ মনে প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন—প্রভু! আর কতকাল এমন ক'রে অদর্শন-যাতনা ভোগ ক'র্ব্বো, কতকাল আর মাতৃহারা ছেলেকে নানাস্থানী করিয়া রাখিবে? তুমি যে বলিয়া গিয়াছিলে—রামেশ্বর! শীঘ্রই আসিয়া তোকে মায়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া যাইব কিন্তু সে শীঘ্র কতদিন প্রভু! কতদিন এমন পিপাসিত চাতকের মত আশা-পথ চেয়ে থাক্‌বো ঠাকুর! প্রাণ বড় অস্থির হ'য়েছে। নির্ম্মলাও ভিন্ন স্থানে গুরুদেবের ধ্যানে বসিয়া তাঁহার দর্শনাশায় কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন!

চারিদিক অর্গলবদ্ধ—বাটীর কেহ কোথাও জাগ্রত নাই, ঝিল্লী শুধু

ঝিঁ ঝিঁ রবে প্রকৃতির কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে; চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়াছে—কোলের মানুষ দেখিবার যো নাই। এমন সময় বাঁশির দিক হইতে এক অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি শূন্যে হেলিতে দুলিতে আসিয়া সেই বিল্ববৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া বলিল—বৎস রামেশ্বর! মা নির্ম্মলা! এত উতলা কেন? আমি ত' তোমাদের কাছে কাছেই রহিয়াছি, সময় হইলেই আসিব—তবে এত বিব্রত হইবার কারণ কি? শুভ সময়ের সংযোগ না হ'লে কি শব-সাধনা হয়?

নির্ম্মলা ও রামেশ্বর সম্মুখে হঠাৎ তাঁহাদের ইষ্টদেবতা সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ, সেই আনন্দময় মহাপুরুষ—অবধূতকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই আনন্দময় নগ্নমূর্ত্তি অবধূত—আজ ঠিক কচিছেলেটীর সেই কচি মুখের হাসি হাসিয়া বলিলেন—ক্ষুধা পেয়েছে মা—কিছু খেতে দে; মার কাছে খাব ব'লে তাড়াতাড়ি আস্‌ছি, সমস্ত দিন কিছু খাই নাই।

নির্ম্মলা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন; প্রায় আড়াই সের খাঁটি দুগ্ধ জাল দেওয়া ছিল। নির্ম্মলা শশব্যস্তে আসিয়া তাহাই দেবতার ভোগ প্রদান করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গ্রীষ্মে ঠাকুরের দেহে ঘাম পড়িতেছিল—নির্ম্মলা জননীর মত আঁচলে তাহা মুছাইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! কতদূর থেকে আস্‌ছেন; এতদিন কোথায় ছিলেন? অবধূত বলিলেন—কিছুদিন কালীঘাটে ছিলাম—তার পর কামাক্ষা-মন্দিরে গিয়াছিলাম; তোদের প্রাণের ডাক শুনিয়া আজ সেইখান থেকেই আস্‌ছি।

রামেশ্বর। আপনি যে কালীঘাটে ছিলেন—তাহা আমরা জানিয়াছি; যে কীর্ত্তি দেখাইয়াছেন—যাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন, সে আমাদেরই আত্মীয়—নির্ম্মলার ভ্রাতুষ্পুত্র; যেদিন তাঁহারা মার বাড়ী

উৎসব করছিলেন—সেই দিনই আমি তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া কালীঘাটে উপস্থিত হই।

নির্ম্মলা করযোড়ে বলিলেন—বাবা! দাদার মরা ছেলে বেঁচে উঠলে পর—আমি তাঁহার মুখে আপনার আকৃতি শুনিয়া অনুমান করেছিলাম যে, এ ক্ষমতা আমার পাগলা বাবার ভিন্ন আর কারু নয়। এখন দেখছি—আমার অনুমান ঠিক ?

অবধূত। কি করি মা! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হ'লো—ছেলেটী বেঁচে গেল ?

নির্ম্মলা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা—না আপনার ?

অবধূত। আমার ইচ্ছা কি তাঁর নয়! তিনি কি আমি ছাড়া, না আমি তিনি ছাড়া ?

নির্ম্মলা। বাবা! চারি দিক অর্গলবদ্ধ, আপনি ভিতরে এলেন কেমন করে ?

অবধূত। দূর বেটী! কুম্ভকযোগ জানা থাকলেই হয়—কত বড় বড় নদী পার হওয়া যায়—তা এ ত' সামান্য। যোগ-বিভূতি কোন কাজের নয় কিন্তু এইরূপ সময়ে সাধকের অনেক উপকার করে।

রামেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরের যোগ-বিভূতির বিষয় অবগত ছিলেন। প্রথম দিনই তিনি কালীঘাটের আদিগঙ্গা হইতে তাঁহাকে দেবীপুরের ঘাটে গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়া আসিতে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি অন্য কথা ছাড়িয়া অনবরত তাঁহার প্রাণে যে কথা জাগিতেছিল—যাহার জন্য তিনি গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—এক্ষণে সেই কথার অবতারণা করিয়া বলিলেন—বাবা! আমার উপায় কি হবে ?

অবধূত। বাবা! আগামী অমাবস্যায় নিকটবর্ত্তী শ্মশানেই শব-সাধনার দিন স্থির করিয়াছি; তুমি মনোমত শবের অন্বেষণ কর—তবে

অতি গোপনে—নিজে অথবা খুব বিশ্বাসী লোকের দ্বারা; একজন উপযুক্ত উত্তর সাধক ত' চাই; আমি কার্য্যের সময় শ্মশানে উপস্থিত হইব। এক্ষণে বিরূপাক্ষকে তোমার উত্তর-সাধক-রূপে বরণ কর—সেই তোমার এ কার্য্যের উপযুক্ত সহায় হইতে পারিবে—তাহার প্রকৃতি অতি মহৎ উপাদানে গঠিত—আমি প্রথম দিন সাক্ষাতে তাহা বুঝিয়াছি। এই বলিয়া তিনি সাধন-কার্য্যে কিরূপ শব ও কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন—সমস্ত বলিয়া দিলেন।

নির্ম্মলা ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, মনে করিলেন—এ সুযোগে কি আমারও উদ্ধার হইবে না? মন বুঝিয়া মনোময় পুরুষ বলিলেন—বেটী! কি ভাবছিস্, তোর দেব-দর্শন ত' অনবরত হ'চ্ছে, স্বামীর তুল্য দেবতা আর কি আছে, কায়মনে ঐ দেবতা পূজা ক'রলেই স্ত্রীলোক অসাধ্য সাধন ক'র্ত্তে পারে। তুই শব-সাধনার দিন কাজ কর্ম্ম সারিয়া তোর গৃহদেবী মায়ের সম্মুখে পতির ধ্যানে বসিবি, যখন সেখানে রামেশ্বরের সিদ্ধিলাভ হবে, এখানে তোরও তাই হবে। সতী প্রাণপণে পতিপূজা ক'র্‌লে—তার সিদ্ধিলাভ অতি সহজ—সে ঘরে বসেই অতি কঠিন সাধনার ফল প্রাপ্ত হয়।

এদিকে রাত্রি প্রভাত প্রায় দেখিয়া অবধূত উঠিলেন। বলিলেন—বাবা! আমি আসি। এক্ষণে তোমরা সব উদ্যোগ কর, সম্মুখে অম্বুবাচীর কয়দিন কামাখ্যায় কাটাইয়া, বিশ্ব-জননীর বিশ্ব-প্রসবের ভাব এই কয়দিন স্বচক্ষে দেখিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্মশানে উপস্থিত হইব। এই বলিয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই অন্তর্ধান হইয়া পড়িলেন।

স্বামী স্ত্রীতে নীরবে দাড়াইয়া প্রভুর অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর যতক্ষণ না রজনী প্রভাত হইল, ততক্ষণ উভয়ে সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া

কত আনন্দের গল্প করিতে লাগিলেন। যোগের দ্বারা যে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, বহুদিনের পথ যে ক্ষণেকের মধ্যে অতিবাহিত করিতে পারে—রামেশ্বর পত্নীকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ইচ্ছা করিলে যোগী যোগবলে করিতে পারে না, জগতে এমন কার্য্য কিছুই নাই।

ভবার্ণবের কাণ্ডারী স্বয়ং গুরুদেব আশা দিয়া গিয়াছেন, মনের বাসনা পূর্ণ হইবে—সে শুভদিনের আর বেশীদিন বাকী নাই। বহুদিনের আবেগ উৎকণ্ঠা আজ তিরোহিত হইল। স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ সে শুভ মূহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আনন্দে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অমানিশার ঘনান্ধকার অপসারিত হইয়া উষাসতী ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে—বালক বাসুদেব নিদ্রোত্থিত হইয়া চক্ষুঃ রগড়াইতে রগড়াইতে গৃহে আসিয়া ডাকিল—মা!

নির্ম্মলা শশব্যস্তে এই যে বাবা! বলিয়া পুত্র-বৎসলা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—দাদার কাছে শুয়ে কোন কষ্ট হয় নাই ত'? বাসুদেব "না" বলিয়া পিতার ও জননীর পদবন্দনা করিল—বাসুদেবের ইহাই নিত্য কর্ম্ম। তারপর বালককে খাবার দিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ নির্ম্মলা গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। রামেশ্বর প্রিয় শিষ্য বিরূপাক্ষকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবান্বেষণ।

শব-সাধনা আশু সিদ্ধিপ্রদ হইলেও বহু আয়াসসাধ্য। এইজন্য এই সাধনায় সহজে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। খুব দৃঢ়চিত্ত নির্ভীক সাধক না হইলে তন্ত্রের এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকাম-সাধনায় একদিনেই ইষ্টদর্শন হইয়া থাকে, এইজন্য ইহার নিয়ম-প্রণালী এত ভীষণ এবং কষ্টকর যে, নিতান্ত বীর-সাধক না হইলে সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। অন্যান্য উপচার সংগ্রহ সহজ সাধ্য কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত শবদেহ পাওয়াই দুষ্কর।

অন্যান্য সামান্য সাধনায় অন্য প্রাণীর দেহ প্রশস্ত হইলেও শব সাধনা-রূপ বীর-সাধনায় মনুষ্যের শব দেহই একান্ত আবশ্যক, তাহাও আবার শূলরোগে, খড়্গাঘাতে, জলমগ্নে বজ্রাঘাতে বা সর্পাঘাতে মৃত চণ্ডাল-জাতীয় তরুণ বয়স্ক পুরুষের দেহ হওয়া চাই। শবটী সুঠাম গঠন সৌন্দর্য্যশালী এবং শ্মশ্রুসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট শবদেহ সহজে পাওয়া সুকঠিন, পাইলেও তাহা অতীব গোপনে কেমন করিয়া সংগ্রহ হইবে? মৃত দেহ ত' সহজে কেহ ছাড়িয়া দিবে না, লোক জানাজানি হইলেও এ গুপ্ত-সাধনায় কোন ফললাভ হইবে না—কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র সার হইবে। অতএব গোপনে এমন শবদেহ পাওয়া যায় কোথায়?

রামেশ্বর প্রাতঃকালে প্রিয় শিষ্য বিরূপাক্ষকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পূর্ব্বরাত্রে সমাগত গুরুদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে কার্য্যের দিনস্থির হইয়াছে—মাত্র আর বার

চৌদ্দ দিন বাকী, ইহার মধ্যে এইরূপ শবদেহ পাওয়া যায় কেমন করিয়া বিরূ? আমি ত' বড় ভাবিত হইয়াছি।

বিরূপাক্ষ বলিলেন—প্রভু! ভগবতীর কৃপা হয়ত' এরূপ শব সহজেই মিলিবে, আমি আজ হইতেই চণ্ডাল পল্লীতে ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইব—তজ্জন্য চিন্তা কি, আপনি অপরাপর দ্রব্য সকল সংগ্রহ করুন।

প্রিয় শিষ্য বিরূপাক্ষের আশ্বাস বচনে রামেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ভাগীরথীর শীতল সলিলে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন। উভয়ে পূজাহ্নিক সমাধা করিলেন. আহারাদির পর বিরূপাক্ষ গুরুদেবের পদধূলি লইয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ বাটীর বাহির হইলেন। রামেশ্বর মনস্কামনা সিদ্ধ হউক, বলিয়া স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুই তিনখানি গ্রাম অন্তরে চণ্ডাল-পল্লী অবস্থিত; বিরূপাক্ষ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিরূপাক্ষ খুব কাজের লোক এবং সাহসী। উপস্থিত বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট আছে, শবদেহের সন্ধান হওয়া, তাহার দ্বারাই সম্ভব। দেখি, মা কি করেন—এই বলিয়া মাতৃনাম স্মরণ করিয়া রামেশ্বর গুরুদেবের অনুমতি মত অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহাদের পশ্চিমদিকের সুবৃহৎ বাগানে দেবানন্দের পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। দেবানন্দ সেই সিদ্ধাসনে বসিয়া জপ করিতেন। এতদিন তাহা একপ্রকার জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, রামেশ্বরও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর সময়ে সময়ে সেখানে বসিয়া জপ করিতে ছাড়িতেন না। ক্রম-দীক্ষার পর পুরশ্চরণ প্রভৃতি নানা শক্তি-বিষয়ক সাধনা এখানে সমাধা করিয়া তিনি ত্রিশূল ও রক্তাম্বর ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুরুদেবের আদেশে সাধারণ হিতানুষ্ঠান চণ্ডীপাঠে এবং তীর্থ-ভ্রমণে বিব্রত থাকায় পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্রায়ই যাওয়া হইত না।

শক্তি-সাধনা।

আজ কয়েকদিন হইল, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকটস্থিত ক্ষুদ্র গৃহে ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রে সেইস্থানে বসিয়াই জপ-তপ হইত, কেবল আহারের সময় একবার ঘরে আসিয়া চারিটী আহার করিয়া যাইতেন। প্রাণে এখন কিছুমাত্র শান্তি নাই—যতদিন না সাধন-সিদ্ধি হইতেছে, ততদিন রামেশ্বরের আহার-নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ হইয়াছে, জীবন ধারণের মত কিছু খাইতে হয় তাই খান, আর অনবরত কেবল ঐ চিন্তা। সেখানে ইষ্টদেবীর একখানি ছবি দেওয়াল গাত্রে বিলম্বিত করিয়া রামেশ্বর অনবরত সেই মূর্ত্তি পানে চাহিয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কেবল অশ্রুপাত করেন—প্রাণের কাতর প্রার্থনা জানান—যেন বিরূপাক্ষ সত্বর শবের সন্ধান আনিয়া দেয়। মা! মনোবাঞ্ছাটী পূর্ণ কর্ মা? অধম সন্তান বড় দায়ে ঠেকিয়াছে।

যতদিন কামনা – ততদিন সাধনা, কামনা না থাকিলে সাধনাই হয় না। অপূর্ণ পূর্ণের নিকট চাহিবে না ত' পাইবে কোথায়, ভিখারীর আবার রাজ-রাজেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করিতে দোষ কি? পুত্র মায়ের নিকট না চাহিলে, ধন, যশঃ, মান, আরোগ্য মায়ের নিকট কামনা না করিলে পাইবেই বা কোথায়, আর দিবেই বা কে? মানুষে যদিও কিছু দেয়, ত' মুখ বিকৃত করিয়া দিবে, তাহাতে কুলাইবে না, আর তিনি দিলে —শূন্য ভাণ্ডার অফুরন্ত ধনে পূর্ণ করিয়া দিবেন। আর অভাব বোধ থাকিবে না, চাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। মুক্তি চাওয়াও চাওয়া—দর্শন চাওয়াও চাওয়া, ধন বা আরোগ্য চাওয়াও চাওয়া—যার চাওয়া ফুরাইয়াছে—যে অভাবের হাত এড়াইয়াছে সেই ত' চিরতরে ভবের সকল ভাবনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত সেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞ—তাহাকে ত' কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না বরং অপর সকলে তাহার দ্বারস্থ।

রামেশ্বরের এখনও সে অবস্থা আসে নাই। মায়ের ছেলে মাকে না দেখিয়া প্রাণ ছট ফট্ করিতেছে—তাই দর্শন আকাঙ্ক্ষা এত বলবতী; দেখিতে পাইলে, দর্শনের সাধ মিটিলে—সদাসর্ব্বদা মার কোলে পীঠে উঠিলে, চর্ম্মচক্ষে সর্ব্বদা দেখিতে পাইলে আর কে অনবরত ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করে; রামেশ্বরের সে অবস্থার আর কত দিন বাকী মা!

পঞ্চবটীর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধক অহোরাত্র বসিয়া কেবল মাকে ডাকিতেছেন—আর বিরূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটী শুষ্ক পত্র বায়ুভরে নড়িতেছে; সাধক অমনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বিরূর দর্শন আশায় সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন—বিরূ কখন আসে, কি সংবাদ দেয়!

দুইদিন পরে বিরূপাক্ষ হাসিতে হাসিতে গুরু সমীপে আসিয়া প্রণাম করিল। রামেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! সুসংবাদ ত'?

বিরূপাক্ষ। হাঁ প্রভু! সুসংবাদ বটে, তবে সংগ্রহ হয় কিসে?

রামেশ্বর। সাধনোপযোগী লক্ষণ যুক্ত চণ্ডালের শব ত'?

বিরূপাক্ষ। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; জলে ডুবিয়া মরিয়াছেও বটে কিন্তু সংগ্রহ করাই যে দায়?

রামেশ্বর। মায়ের কৃপায় যখন এরূপ লক্ষণ যুক্ত শব পাওয়া গিয়াছে তখন পাইবার উপায়ও তিনি করিয়া দিবেন; যদি একা না পার—তাহা হইলে চল—আমিও সঙ্গে যাই?

বিরূপাক্ষ। আপনাকে যাইতে হইবে না; তবে সন্ধ্যার পর কালীঝুলী মাখিয়া ভূতের মত চেহারা করিয়া শ্রীপুরের শ্মশানে যাইতে হইবে, এখন তাহারা শবদেহ শ্মশানে আনিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিতেছে—আমি দেখিয়া আসিয়াছি। নিমে চাঁড়াল সেখানকার খুব

বড়লোক—তার একমাত্র ছেলে, বয়স বাইশ তেইশ বৎসর, জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। এখন তার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ছট্ ফট্ করিয়া কাঁদিতেছে—তারপর লোক সংগ্রহ করিয়া শ্মশানে আসিবে,—আমি ততক্ষণ সাজসজ্জা করিয়া লই, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ক'রে আস্‌ছে! এই বলিয়া বিরূপাক্ষ আপনার দেহ বিকৃতভাবে সজ্জিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর বনপথ ধরিয়া শ্রীপুরের শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার পর আকাশ অনবরত ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বিদ্যুতের চমকে, বাতাসের ধমকে আর মেঘের গর্জ্জনে সত্বর মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই দারুণ দুর্যোগে বিরূপাক্ষ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ত্বরিত গমনে শ্মশানে আসিয়া পৌছিলেন এবং একটী বৃক্ষের অন্ত-রালে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পূজনীয় গুরুদেবের সাধন-কার্য্যে উত্তর-সাধনের ভার লইয়া তিনি আজ অসাধ্য-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধক অপেক্ষা উত্তর সাধক পাকা না হইলে—নির্ভীক দৃঢ়চিত্ত না হইলে শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আজ বিরূপাক্ষ যেরূপ সাহস ও অধ্যবসায় দেখাইতেছেন —তাহাতে রামেশ্বরের যে সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

রজনী যত গভীর হইতে লাগিল—আকাশের ভীষণতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু শবদাহ বিষয়ে ত' আর এ সকল বিভীষিকা গ্রাহ্য করিলে চলিবে না! কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন লোক শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানে আনয়ন করিল। শবদাহ করিবার জন্য কাষ্ঠাদি যাহা আনিয়া-ছিল—তাহা ভিজিয়া গিয়াছে; শব চিতাস্থ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিল কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরিতেছে না, যতবার জ্বালিতেছে, ততবার নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টি এতক্ষণ টিপ্ টিপ্ পড়িতেছিল, আবার মুসলধারায়

আরম্ভ হইল। চপলার চমক ও বজ্রের কড়কড়ানি—কাণ ঝালাপালা করিতে লাগিল। দাহকারী ব্যক্তিগণ হতাশ হইয়া অপর একটী বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইলে—পল্লীর শ্মশান ভীষণভাবে তাহাদের চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। সকলেই প্রাণ লইয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় ভূত-প্রেতের হিঃ-হিঃ-হুঃ-হুঃ শব্দ শুনিতে পাইল। একে বহুদূর শবদেহ বহন করিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার উপর সমস্ত রাস্তা জলে ভিজিয়া দেহ অবসন্ন—শুধু কি তাই, ঐ ভীতি-ব্যঞ্জক হিঃ-হিঃ-হুঃ-হুঃ হাসির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাইলে তাহারা দেখিতে পাইল—অপর বৃক্ষতলে বিকটাকার ঐ যে ভীষণ-মূর্ত্তি একটা পিশাচ, শবলোভে এই দিকে অগ্রসর হইতেছে! শববাহকগণ আর দাঁড়াইল না, ভয়-বিহ্বল-চিত্তে দৌড়াইতে লাগিল, বৃষ্টির বিরাম নাই—উঠিপড়ি করিয়া তাহারা শব ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। পুত্রশোক হেতু নিমাই চণ্ডাল সঙ্গে আসে নাই; অপরে শব বহন করিয়া আনিয়াছিল। প্রাণের ভয় ত' তাহাদেরও আছে?

শ্মশান পার হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল—আজ আর নিমাইকে সংবাদ দিয়া কাজ নাই—চল আমরা এক স্থানে আশ্রয় লই। ঝড়-বৃষ্টি থামিলে, নূতন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শব দাহ করতঃ কাল সকালে তাহাকে সংবাদ দিব; সকলেই সেইরূপ পরামর্শ করিয়া গ্রামান্তরে এক বারয়ারীর আটচালায় আশ্রয় লইল।

উপস্থিত বুদ্ধির বলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া বিরূপাক্ষ আর কালবিলম্ব করিলেন না, শবদেহ-স্কন্ধে আহ্লাদে আটখানা হইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রামেশ্বরের চক্ষে নিদ্রা নাই—কতক্ষণে কার্য্যোদ্ধার করিয়া বিরূ ফিরিয়া আসে, বিশেষতঃ এই দুর্যোগে শবদেহ জলে ভিজিয়া ভারি হইয়াছে—যদি একাকী বহন করিতে না পারে—

এইজন্য তিনিও পঞ্চবটী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন; পথে গুরু-শিষ্যে দেখা হইল। বিরূপাক্ষের স্কন্ধে দোদুল্যমান সুরূপদর্শন শবদেহ দেখিয়া পুলকিত-চিত্তে রামেশ্বর অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া সাগ্রহে শবদেহ নিজ স্কন্ধে লইলেন এবং বহন করতঃ পঞ্চবটীতে আনয়ন করিলেন। পচিয়া যাইবার ভয়ে শবের দেহ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিলেন এবং সীবন করিয়া লবণ ও হরিদ্রায় চর্চ্চিত করতঃ সর্ষপ তৈলে ভিজাইয়া কুটীরের মধ্যে একস্থানে রাখিয়া দিলেন। শবসাধনার প্রধান উপকরণ সুলক্ষণযুক্ত শবদেহ সংগ্রহ হইল দেখিয়া গুরুশিষ্য উভয়ে ভগবতীর পদে প্রণাম করিলেন।

শেষ রাত্রে যখন বৃষ্টি থামিল, আকাশ পরিষ্কার হইল—তখন দাহকারিগণ শ্মশানে আসিয়া দেখিল—শবদেহ তথায় নাই—তাহারা মনে করিল—হয় ভূ-পিশাচে, না হয় শৃগাল-কুক্কুরে খাইয়া ফেলিয়াছে! তাহারা দুঃখিতান্তঃকরণে পাতি পাতি করিয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিল—কিন্তু কোথাও না পাইয়া পরামর্শ করিল—"শবদেহ দাহ করা হইয়াছে" এই কথাই বলা হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা বাটী ফিরিল, প্রাতঃকালে তাহারা শবদাহ করিয়া নিমাইয়ের বাটী আগমন করিল। কেহ আর সন্দেহ করিল না—আর শবদাহের বিষয়ে সন্দেহই বা করিবে কে, একি আর অন্য কাজ? নিমাইয়ের বাটীতে আবার হাহাকার উঠিল। দাহকারিগণ কিয়ৎক্ষণ তাহাদের বাটীতে অপেক্ষা করিয়া, অশেষ প্রকারে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা করিয়া যে যার বাটীতে গমন করিল—সব ফুরাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধন-প্রক্রিয়া।

শব-সাধনার অপর নাম শক্তি-সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে—একদিনেই সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—মাতৃপদে আশ্রয় লইয়া সাধক মাতৃময় হইতে পারে।

তান্ত্রিক-সাধনায় কৃষ্ণপক্ষ কিম্বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি এবং মঙ্গলবার বা শনিবারই প্রশস্ত! শব-সাধনায় কৃষ্ণপক্ষের তিথিই মহা শুভপ্রদ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবধূত সেই জন্য আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী মঙ্গলবারেই দিনস্থির করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সেই শুভদিন সমাগত হইল। রামেশ্বর সন্ধ্যার পর গাঢ় অন্ধকারে বিরূপাক্ষের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী পাঁচপাড়ার নিভৃত শ্মশানে গমন করিলেন। বিরূপাক্ষ কায়ার ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শব-সাধনার অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ভয়ানক; এক পা এদিক ওদিক হইলে কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলে, সিদ্ধিলাভ পরের কথা—জীবন নাশ হইবার সম্ভাবনা; না হয়ত পাগল, বধির, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি হইয়া সাধক কাজের বার হইয়া পড়ে; তাহার অধঃপতন এত হয় যে, এ জীবনে আর উদ্ধারের আশা থাকে না। এই মহাবীরব্রত সাধনে সাধক খুব নির্ভীক না হইলে, উত্তর-সাধক খুব পাকা না হইলে ভয়ের সম্ভাবনাই বেশী।

রামেশ্বর সেইজন্য কিছুমাত্র ভীত নহেন। তিনি জন্মাবধিই ধার্ম্মিক কাজেই নির্ভীক-চিত্ত, কোন কলঙ্ক তাঁহার নাই, বিরূপাক্ষের ন্যায় দৃঢ়ব্রত উত্তর-সাধক সঙ্গে রহিয়াছে, আর যখন শ্রীগুরুদেব আসিয়া

সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন—তখন আর ভাবনা কিসের? স্বামী শুভকার্য্যে গমন করিলে, নির্ম্মলাও শুভঙ্করী সর্ব্বমঙ্গলার নিকট তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি কামনা করিয়া গলবস্ত্রে পূজাগৃহে বসিলেন।

পাঁচপাড়ার শ্মশান অতি নিভৃত স্থান। সাধক সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারে শবদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। ইহা বীর-সাধনা, অতএব ইহাতে সুরা একটী প্রধান উপকরণ; তার পর অন্য দ্রব্য—মাষভক্ত বলির জন্য তিল, কুশ, সর্ষপ, পূজার আমিষ ও হবিঃ, কর্পূর, ত্রিশূল, তলওয়ার, মশাল জ্বালিবার জন্য একপাত্র তৈল, রজ্জু, কীলক, কোষা-কোষী। উত্তর-সাধক আজ ভীমভৈরবমূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়াছেন; রক্তাম্বর ও উত্তরীয়, কপালে দীর্ঘ সিন্দূরের ফোটা; সর্ব্বাঙ্গে ইষ্টমন্ত্র চন্দনে অঙ্কিত, গলে রুদ্রাক্ষের মালা। আচার্য্য রামেশ্বর পবিত্র গঙ্গাজলে দেহ পবিত্র করিয়া রক্ত-কৌষেয় বাস পরিধান করিলেন—সে সুন্দর দেহে ইষ্টমন্ত্র লেখা—চন্দনের দাগে; কপালে ত্রিপুণ্ড, সিন্দুরে লেখা, ধক ধক্ জ্বলিতেছে; গলে স্ফটিকের মালা মণিবন্ধে মহাশঙ্খ মালা, ব্রহ্মতলে গোষ্পদসদৃশ চুড়া; গুরু-শিষ্য দুই জনেই সমস্ত দিন অনশন তথাপি সে বদনের জ্যোতিঃ কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই।

অবধূত তখনও উপস্থিত হন নাই; যখন তিনি স্বমুখে বলিয়া গিয়াছেন আসিবেন, তখন সময় হইলে নিশ্চয়ই দেখা দিবেন। সমস্ত ঠিক হইলে বিরূপাক্ষ ভৈরবমূর্ত্তিতে নিকটবর্ত্তী বিল্বমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিয়া বসিলেন; রামেশ্বর গুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সাধনায় বসিলেন। প্রথমে পূজার কার্য্যও রামেশ্বরের অবিদিত নাই। তিনি সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আপনার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে পূজার স্থান অভ্যুক্ষণ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বে গুরু, দক্ষিণে গণেশ,

পশ্চিমে বটুক ও উত্তরে যোগিনীগণের অর্চ্চনা করিয়া ভূমিতে "হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দাবয় হন হন শব-শরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হুঁ ফট্" বলিয়া শবের উপর এই বীরার্দ্দন মন্ত্র লিখিয়া দিলেন। তারপর ;—

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচা, সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাতা ভবন্তত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥

এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, প্রণাম করিলেন। তারপর পূর্ব্বদিকে ঃ—

"ওঁ হুঁ শ্মশানাধিপতে ইমং সামিষান্নং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধিমিমাং প্রযচ্ছ স্বাহা"—এই মন্ত্রে শ্মশানাধিপতির পূজা ও বলি প্রদান করিলেন। দক্ষিণ দিকে—"ওঁ হ্রীং ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্নবলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধি-মিমাং প্রযচ্ছ স্বাহা' বলিয়া ভৈরবের পূজা করিলেন। পশ্চিমে—"ওঁ হুং কালভৈরব শ্মশানাধিপতে ওঁ ইমং সামিষান্নবলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু, সিদ্ধমিমাং প্রযচ্ছ স্বাহা" বলিয়া কাল ভৈরবের এবং উত্তরে "ওঁ হুঁ মহাকাল" ঐরূপ মন্ত্র পড়িয়া মহাকালের পূজা ও বলি প্রদান করিলেন। অতঃপর "ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্" মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করতঃ "ওঁ হ্রীং স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট্ চট্ প্রচট্ প্রচট্, কহ কহ, বম্ বম্, বন্ধ বন্ধ, ঘাতয় ঘাতয়, হুঁ ফট্" এই সুদর্শন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" বলিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তৎপরে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, বিধিন্যাস করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়দুর্গামন্ত্রে চতুর্দ্দিকে সর্ষপ নিক্ষেপ এবং

ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ। পিতৄণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ। এই মন্ত্রে তিল নিক্ষেপ করিয়া শবের নিকট গমন করিলেন এবং উপবেশন করিয়া "ওঁ ফট্" এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যুক্ষণ করতঃ "ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শবশরীর স্পর্শ করিয়া :—

ওঁ বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর,
আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কশঙ্কর।
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে॥

এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে কোন প্রকার অবসাদ আতঙ্ক আসিয়া সাধককে চঞ্চল করিয়া ফেলে, এই জন্য শোধিত বারুণী সেবনে দুই জনেই দৃঢ়-চিত্ত, প্রাণে কোন প্রকার অবসাদ বা ভীতির লেশ মাত্র নাই। তৎপরে—"ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ" বলিয়া শবদেহ সুগন্ধি জল-দ্বারা স্নান করাইলেন এবং বস্ত্র দ্বারা শরীর মার্জ্জনা করিয়া ধূপ দ্বারা শোধন ও চন্দন দ্বারা লেপন করিয়া দিলেন। এই সময় শবশরীর রক্তবর্ণ ধারণ করিলে—তাহা সাধকের ভক্ষণের কারণ হয় কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় শবশরীর সমভাবেই রহিল। তারপর শবদেহের কোটিদেশ ধারণ করিয়া পূজাস্থানে লইয়া আসিলেন—উত্তর-সাধক পূর্ব্ব হইতেই কুশের শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধক তদুপরি শবকে পূর্ব্বশিরা করিয়া স্থাপন করিলেন। অতঃপর শবমুখে জাতিফল, খদিরাদিযুক্ত তাম্বুল প্রদান করিয়া অধোমুখে উপুড় করিয়া রক্ষা করিলেন। তারপর তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপন করিয়া বাহুমূল হইতে কোটিদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিলেন। চতুরস্র মণ্ডল মধ্যে অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিলেন—ঐ পদ্মমধ্যে "হ্রীং ফট্" বলিয়া বীজমন্ত্র লিখিয়া তাহার উপর কম্বলাসন পাতিয়া তাহার কোটিদেশ

ধারণ করিলেন, তাহাতে শবদেহ জাগ্রত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল—সাধককে কিছুতেই তদুপরি উপবেশন করিতে দিল না, দেখিয়া গুরুর শিক্ষামত তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন প্রদান করিলেন, শব শান্ত হইল। পুনরায় জলপ্রক্ষালন দিয়া জপস্থানে রক্ষা করিলেন। পরে ঐ স্থানের দশ দিকে অশ্বত্থবৃক্ষের দ্বাদশ অঙ্গুলি কীলক প্রোথিত করিয়া দশদিক্‌পালের পূজা আরম্ভ করিলেন পূজার ক্রম যথা—ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে, ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় শক্তিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মমাসিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা, এষ মাষভক্ত বলি ইন্দ্রায় স্বাহা বলিয়া সামিষান্ন দ্বারা বলি প্রদান করিলেন। তারপরে ওঁ রাং মন্ত্রে তেজোধিপতয়ে মেষবাহনায় অগ্নয়ে, ওঁ মাং প্রেতাধিপতয়ে মহিষ-বাহনায় যমায়, ওঁ ক্ষং রক্ষোধিপতয়ে অশ্ব-বাহনায় নিঋ্‌তয়ে, ওঁ বাং মকরবাহনায় জলাধিপতয়ে বরুণায়, ওঁ বং প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায় বায়বে, ওঁ সাং যক্ষাধিপতয়ে নরবাহনায় কুবেরায়, ওঁ হাং বৃষবাহনায় ভূতাধিপতয়ে ঈশানায় ওঁ আং হংসবাহনায় প্রজাপতয়ে, ওঁ হ্রীং রথবাহনায় নাগাধিপতয়ে, অনন্তায়—এই ক্রমে দশদিক্‌পালকে পূজা ও বলি প্রদান করিয়া "এষ মাষভক্ত বলিঃ সর্ব্ব-ভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া সর্ব্বভূতকে প্রদান করিলেন। তারপর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীগণকে সামিষান্ন বলি প্রদান করিলেন। অনন্তর সাধক আপনার নিকটে পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেন। উত্তর-সাধক বিরূপাক্ষ—ভৈরবমূর্ত্তিতে নিজ স্থানে বসিলেন।

সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "হ্রীং ফট্‌ শবাসনায় নমঃ" বলিয়া শবের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার হ্রীং ফট্‌ মন্ত্রে ঘোটকে আরোহণের মত শবাসনে সমাসীন হইয়া নিজের পদতলে কতিপয় কুশ রাখিয়া শবের

কেশ-ঝুটিকা বন্ধন করিয়া গুরুদেব, গণেশ ও দেবীকে প্রণাম করিলেন। তার পর প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দন মন্ত্রে দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে ওঁ অদ্যেতাদি শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীরামেশ্বরদেবশর্ম্মা ইষ্টদেবতা-সন্দর্শন-কামঃ...বীজমন্ত্র-দশসহস্রসংখ্যক-জপমহং করিষ্যে—বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

"জপাৎ সিদ্ধিঃ" তান্ত্রিক পূজায় জপই সব, জপেই সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়। সাধক তন্ময় হইয়া যত জপ করিতে পারিবে, সিদ্ধি তার তত সন্নিকট, এই জন্য দশ সহস্র জপের সঙ্কল্প করিলেন। তার পর ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনশুদ্ধি, পরে বামদিকে অর্ঘ স্থাপন করতঃ শবের ঝুটিকাতে পীঠপূজা করিলেন।

চতুর্দ্দশ হস্ত ব্যাস পরিমিতি স্থান কীলক ও রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, আসব-সিঞ্চনে মন্ত্রপূত, হাত পা গুটাইয়া শবকে উপুড় করিয়া তাহার উপর উপবেশন করতঃ সাধক সমাহিতমনে পূজায় রত হইবেন। সুরাপানে শরীর ও মনে অমিত-শক্তি, ভয়ের লেশমাত্র নাই। শবসাধনার প্রধান উপকরণ এ সকল না হইলে কেহই এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না। বামদিকে ছয়টী সুধা-পূর্ণ যন্ত্র, বৃহৎ কপালপাত্র বিবিধ চর্ব্বণ। আসনের সম্মুখে ঘৃতপূর্ণ কোষা, হোমের সমিধ, দক্ষিণদিকে অসি, নানাবিধ পুষ্প, চন্দন ও নানাপ্রকার সৌগন্ধ।

সাধক ষোড়শোপচারে আপনার ইষ্টদেবার পূজা ও শবমুখে তাহার কিছু কিছু আহারীয় অর্পণ করিলেন। বিরূপাক্ষ কিয়দ্দূরে বৃক্ষতলে আসব আবেশে বসিয়া অনবরত গুরুদেবের সাধন-সিদ্ধি কামনা করিতেছেন। সাধক এইবার হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বিল্বদলে হোম করিলেন। মধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। ধূপ, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা দেবীর আরতি করা হইল। ত্রৈলোক্য

মশালের আলোক উজ্জ্বল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। অন্ধকারের নামমাত্র তথায় ছিল না। সাধক তদ্গতচিত্তে মায়ের পূজা সমাপ্ত করিয়া আসন হইতে অবতরণ করতঃ—"ওঁ বশো মে ভব দেবেশ, মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয় পরায়ণ" বলিয়া শবের স্তুতিপাঠ করিলেন।

তার পর পট্টসূত্র দ্বারা শবের চরণদ্বয় বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে শব শরীর দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া :-

"ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ।

ভীম ভীরুভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক।

ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামাধিপাধিপ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শবের পাদমূলে ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পুনরায় শবোপরি উপবেশন করিয়া তাহার হস্তদ্বয় প্রসারণ করতঃ কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন এবং তদুপরি নিজ পদদ্বয় স্থাপন করিয়া পুনরায় তিনবার প্রণায়াম পূর্ব্বক শিরস্থিত শতদলপদ্মে গুরুকে, স্বহৃদয় ষোড়শদল পদ্মে ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুট করিয়া সাধনোপযোগী স্ফটিক ও রুদ্রাক্ষের মালা গলদেশে ধারণ করিলেন। তারপর মৌনী হইয়া একাক্ষরী বীজমন্ত্র সঙ্কল্প অনুসারে দশ সহস্রবার জপ করিলেন। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রি অবধি কিছু দেখা গেল না, এজন্য পুনরায় তিল সর্ষপ বিকিরণ করিয়া সাতপা দূরে জপ আরম্ভ করিলেন।

এইবার নানপ্রকার বিভীষিকা দর্শন হইতে লাগিল। সর্প সকল ফণা বিস্তার করিয়া চারিদিকে গর্জ্জন করিতে লাগিল, ব্যাঘ্র ভল্লুক, সিংহ প্রভৃতি আসিয়া ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার সেই আসনের সীমার মধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে পারিল না। গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস হইল না—কারণ যথাযথ শাস্ত্রানুসারে তাহা মন্ত্রপূত হইয়া সুদৃঢ় হইয়াছিল, কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই।

শক্তি-সাধনা।

সাধক দৃঢ় চিত্তে পুনরায় শবাসনে বসিয়া স্ফটিকের মালা জপ করিতে লাগিলেন। এতক্ষণে শব চেতন পাইয়া মুখব্যাদান করিতে লাগিল, চিৎ হইয়া অট্ট হাসি হাসিতে হাসিতে তাহাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। সাধক তাহার বদনে সুধা ও চর্ব্বণ প্রদান করিলে—সে শান্তভাব ধারণ করিল। বিরূপাক্ষ বিবিধ প্রকারে সাহস প্রদান করিতেছেন—মাভৈঃ মাভৈঃ রবে হুঙ্কার দিতেছেন। সাধক তন্ময়ভাবে মালা জপিতেছেন আর মনে-প্রাণে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া দেবীকে প্রসন্না হইবার জন্ত বলিতেছেন—মা! বহুদিন যে প্রবল আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিলাম, আজ সেই শিবের সম্পদ মোক্ষপদ দেখিবার জন্ত এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেবী! এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিহার করিয়া শুভঙ্করী মূর্ত্তিতে পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। প্রসন্নময়ি সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি, চারিদিকে প্রবল তরঙ্গ, মা! এ অর্ণবে তুমি ভিন্ন আর কর্ণধার কে আছে, "প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ পরমেশ্বরী" বলিয়া প্রণাম করিলেন! শরীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, আসব আবেশে রক্তচক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তথাপি কুণপ অট্ট হাসিতে লাগিল, এক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল, গুরু প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সাধক ত' ঠিক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তবে ক্ষণে ক্ষণে এমন বিভীষিকা, এত বিঘ্ন হইতেছে কেন? গুরুদেব! প্রভু, কোথায় তুমি, প্রাণ যায়—তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সিদ্ধিলাভ না হইয়া পাছে অসিদ্ধি লাভ হয়, পাছে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়—এই ভয় প্রভু! কৃপা কর, রাত্রি যে আর বেশী নাই দয়াময়! শব যত মুখব্যাদান করিতে লাগিল, সাধক তত দৃঢ়ভাবে বসিয়া তার মুখে হালা প্রদান করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধিলাভ।

সামান্য কাজের সিদ্ধিলাভে যখন বাধাবিঘ্ন কত সহ্য করিতে হয়—কত অসাধ্য-সাধন করিতে হয়, তখন এরূপ একটী মহৎ কার্য্যের জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানব-জীবন ধন্য করিবার জন্য "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"-রূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া না লাগিলে কেমন করিয়া সেই স্বর্গের সম্পদ মোক্ষপদ দর্শন হইবে? সাধক জীবন পণ করিয়া শবাসনে বসিয়াছেন—হয় ত' শিবের আরাধ্য ধন সে চরণ লাভ করিব—নয় জীবন ক্ষয় করিব। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া লাগিলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য—রামেশ্বর আজ সেই পণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; দেখি নিঠুরা দেবী কত কষ্ট দেন!

প্রথমে হিংস্রজন্তুরূপে নানা বিভীষিকা দর্শন হইল—তাহারা পলায়ন করিলে ভূতগণ আসিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল; সে ভীষণাকার মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া যায়; সাধারণ সাধকের সাধ্য কি যে এ সকল কার্য্যে অগ্রসর হয়—রামেশ্বর কিন্তু অচল অটল। বারুণী সেবনে হৃদয়ে প্রভূত সাহস সংবদ্ধ হইয়াছে; সাধক ইহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না—জপে বসিলেন। ভূতগণ হানা দিয়া চারিদিকে দাঁড়াইল, বিরূপাক্ষ সাহস প্রদানে মাভৈঃ মাভৈঃ করিতেছেন। ভূতগণ তাঁহাকেও তাড়া করিতেছে। কিন্তু সেও যে সাধক-সম দৃঢ়ব্রত, সেখানেও যে কিছু করিবার শক্তি তাহাদের নাই। ভূতগণের বিকৃত আকৃতি—কাহারও কঙ্কালসার দেহ, চক্ষুঃ কোঠরগত, কাহারও পৃষ্ঠদেশে বদন সংস্থাপিত, কাহারও একপায়ে গোদ, দেহ অতি কৃশ—চুলগুলি—কোঁচা

কোঁচা; কাহারও বদন নাই—কবন্ধাকার। ইহারা সাধকের যোগভঙ্গ করিতে কত চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

তারপর পিশাচের দল তাথৈ তাথৈ করিয়া নাচিতে নাচিতে ভীম-বেগে আসিয়া শ্মশানে উপদ্রব করিতে লাগিল, তাহাদের অনুনাসিক স্বরে দেহের রক্ত শুখাইয়া যায়—কিন্তু শুনে কে! বাহিরের উপদ্রব দেখিবার বা শুনিবার চক্ষু-কর্ণ সাধকের নাই—তিনি যে তন্ময়ভাবে ভবানী-পদে মন-প্রাণ সংযত করিতেছেন! পিশাচগণ তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইবার জন্য নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল, কিন্তু গণ্ডী পার হইতে পারিল না—ধূলা, কাদা, ঘাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ঘোর অত্যাচারে সাধক বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কাতর প্রাণে বিরূ প্রমথেশ হরের শরণাপন্ন হইয়া ডাকিলেন—হে ভূতভাবন ভবানীপতি! তুমিই ভূতগণের নায়ক ঠাকুর, গুরুদেব আজ মায়ের আরাধনায় তন্ময়—প্রায় কার্য্য শেষ হইয়াছে, এ সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে আর আমি কার শরণ লইব প্রভু! হে শূলিন্ শম্ভো, আজ শূল-প্রহারে এ সকল শত্রু খেদাইয়া দাও, মঙ্গলময় আশুতোষ! সাধকের তুমিই একমাত্র ভরসা, যোগেশ্বর, যোগিগণের তুমি প্রাণ; প্রাণনাথ! প্রাণ যায়—রক্ষা কর দয়াময়! সাধকের কাতর-ক্রন্দন ধূর্জ্জটির কাণে বুঝি পৌঁছিল—সে সময় সেই আততায়ী ভূতচমূ প্রতি দেবদেব সদৃশ এক ভীষণ মূর্ত্তি ত্রিশূল ধরিয়া আসিয়া আরক্তিম নেত্রে বলিলেন—ভবভবানীর হিংসাদ্বেষ-বর্জ্জিত স্থানে বাস করিয়া, সাধকের অপকার করিতে তোদের এত সাধ কেন; জগতের জনক-জননীর সঙ্গে বাস করিয়া সাধকের হিতের পরিবর্ত্তে অহিত সাধন করা শিবানুচরগণের উচিত নয়। এখনি এস্থান হইতে প্রস্থান কর! নতুবা উচিত শাস্তি পাইতে হইবে। পিশাচগণ

শিবসম এই মূর্ত্তিকে ভগবান ত্রিশূলীর মূর্ত্তি মনে করিয়া ভয়-চকিত-প্রাণে সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল। শ্মশান শান্তির আগার হইল—বিরূপাক্ষ বৃক্ষতল হইতে চিনিতে পারিয়া শির নোয়াইয়া প্রণাম করিল, আসন পরিত্যাগ করিল না। রামেশ্বর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি চাহিয়া দেখিলেন—দ্বিতীয় শিবস্বরূপ তাঁহার গুরুদেব শ্মশান আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন প্রাণে আর ভয়ের লেশমাত্র রহিল না। অবধূত চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—সাধনার কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই; শবাসন শাস্ত্রানুযায়ী সুসংস্কৃত হইয়াছে। তিনি কোন প্রকার কথা না কহিয়া অপর বৃক্ষতলে উপবিষ্ট উত্তর-সাধকের সাধনা-পদ্ধতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিয়া রামেশ্বর সিদ্ধি-লাভের সীমাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। শব এখনও সময়ে সময়ে উপদ্রব করিতেছে, চক্ষু মেলিতেছে, বদনব্যাদান করিয়া যখন দন্ত কড় মড় করিতেছে, সাধক তৎক্ষণাৎ তাহার বদনে আসব ও চর্ব্বণ প্রদান করিতেছেন।

তান্ত্রিক-সাধনার অসীম ক্ষমতা দেখিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। মন্ত্রবলে মৃত-শরীরে চৈতন্য সঞ্চার হয়, শবদেহ জীবন প্রাপ্ত হইয়া খল খল হাসিতে থাকে, সাধককে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করে; সুধাপান করে, চর্ব্বিত বস্তু চর্ব্বণ করে—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে। শক্তি-সাধকের শক্তি, তন্ত্র-মন্ত্রের অদ্ভুত মহিমা দেখিলে বাস্তবিক হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এমন সাধনা কি আর আছে?

তার পর স্বর্গের অপ্সরাগণ মধুর বাক্যে সাধকের কর্ণ-কুহর পবিত্র করিতে লাগিল—কত প্রলোভন, কত মধুর সম্ভাষণ—কিন্তু এখন কি,

আর সাধক তাহাতে দৃকপাত করেন। ক্রমদীক্ষার সময় স্ত্রীসংসর্গ করিবে না, এরূপ পণ করিয়াছ—এক্ষণে তাহা স্মরণ কর, বলিয়া গুরুদেব হুঙ্কার দিলেন। তাঁহার ইষ্ট-দর্শনের প্রথম দর্শন, আরাধনার ধন গুরুদেব যে সম্মুখে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন—আর কার সাধ্য তাঁহাকে বাধা প্রদান করে?

এইবার আকাশ হইতে দেবগণ বলি প্রার্থনা করিলেন;—সাধক বলিলেন—

> যৎ প্রার্থয় বলিন্তেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
> দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥

দিনান্তরে বলি প্রদান করিব—এখন আপনার নাম বলুন। এই বলিয়া সাধক পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিলেন—তখন প্রায় কার্য্য সিদ্ধি হইয়া আসিয়াছে—হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে; তারপর আকাশ-বাণীতে নাম ঘোষণা হইল। সাধক বলিলেন—"ত্বং জননী পরা ইতি সত্যং কুরু।"

ভগবতী তখন শূন্যমার্গে আসিয়া সাধককে অভয় দিলেন অমরগণ দুন্দুভিনাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আরাধ্যমূর্ত্তি ভূতলে অবতরণ করিয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন! সেই স্বর্গীয় রূপ-জ্যোতিঃ নয়নে দেখিয়া সাধক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে গিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অভয়া অভয়দানে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার করিয়া বলিলেন—বৎস! বরং বৃণু। সাধক চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন—মা! বর আর কি লইব। যখন অপূর্ণ ছিলাম—যখন আমার অভাব ছিল—তখন যাচ্ঞা-প্রার্থনা করিয়াছি; এখন যে আমি পূর্ণ; ত্রিলোকেশ্বরীর দর্শন লাভ করিয়া ত্রিলোকে এমন কি বস্তু আছে যাহা প্রাথনা করিব! দেবী আমার, জননী আমার,

ইষ্ট আমার, প্রাণেশ্বরী মা আমার—যখনই চাহিব—যেন ঐ মোক্ষমূলাধার পাদপদ্ম দেখিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারি, এই বর দাও, আর আমার চাহিবার বা পাইবার কিছু নাই, ভবের সম্পদ মোক্ষপদ পাইলে—আর পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা কার থাকে না! আজ আমি ধন্য, আমার কুল ধন্য আমার ঊর্দ্ধ ও অধস্তন কোটী কুল ধন্য হ'লো। মানবজন্ম তথা ব্রাহ্মণজন্ম আজ সার্থক, আনন্দময়ী মা, আজ আমাকে আনন্দে ভাসাও; সত্যমিথ্যা সব ভুলায়ে দাও, তোমার বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগাইয়া তুলো, আমি সদা-সর্ব্বদা তোমাতে মজিয়া থাকিতে পারি। আনন্দময় গুরুমূর্ত্তির সম্মুখে ইষ্টমূর্ত্তি, মরি মরি, ত্রিজগতে এমন ভাগ্য কার, বলিয়া সাধক স্তব করিতে লাগিলেন—

আদ্যাশক্তি ভক্তি উক্তি যুক্তি মুক্তি দায়িকা।
সিদ্ধ বিদ্যা রাধ্যা সাধ্যা শৈলসুতা বালিকা॥
হাস্য আস্য সুপ্রকাশ্য দৃশ্য চারু নাসিকা।
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥
নীলপদ্ম রক্ত গণ্ড মর্ত্ত্য রক্ত ভূমিকা;
রঙ্গে ভঙ্গে সঙ্গে সদা সঙ্গি অষ্ট নায়িকা,
পাদপদ্মে পদ্মপদ্মে পদ্মাসন পূজিকা,
সিংহপৃষ্ঠে তিষ্ঠ রুষ্ট, দুষ্ট দুষ্ট নাশিকা,
ভদ্রকালী ভয়ানকা ভূত ঈশ ভাবিকা.
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥
মর্ত্ত্যে মত্ত সত্যযুগে দৈত্যকুল ঘাতিকা।
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডিকা॥
পৃথ্বীবক্ষে পক্ষে বক্ষে বিরূপাক্ষ বন্দিকা॥
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥

নিত্যবস্তু নৃত্যকালী মর্ত্ত্যমুণ্ড মালিকা,
ইন্দিনিন্দি হস্তে অস্ত্র অঙ্গ ইন্দু ভালিকা।
দম্ভে কম্পে স্বর্গ মর্ত্ত্য ঘোর ভীল ভাষিকা॥
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা।
দীর্ঘকেশী দক্ষ পুত্রী কুচপদ্ম কালিকা,
ভক্তাধীনা দয়াময়ী অন্নপূর্ণা অম্বিকা।
বিশ্বধাত্রী বিশ্বকর্ত্রী জীবিকাদি পালিকা।
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥
কর্ণে স্বর্ণবর্ণ বাণ স্বর হয় বর্ণিকা,
বর্ণে বর্ণ সাধ্য কার লোলজিহ্বা আশ্রিকা,
অন্তে পদপ্রান্তে রোখো রামেশ্বরে কালিকা
ত্বাং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥

মুখে আর বাক্য সরিল না, জড় জিহ্বা জড়াইয়া যাইতে লাগিল—সাধক পুনরায় চৈতন্যময়ীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—মা মা বলিয়া আত্মহারা হইলেন—ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ অবধূত আসিয়া বলিলেন—মা! মাতৃক্রোড় পাইবার জন্য পুত্র আজ লালায়িত,—কোলে কর—মুখচুম্বনে তাহার চিরজীবনের সাধ পূর্ণ কর। ভগবতী আনন্দমধুর স্বরে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! তোমার শিষ্য যে, তাহার এমন শুভগতি হইবে না ত' হইবে কার, ধন্য তুমি!

অবধূত বলিলেন—মা! আমার অস্তিত্ব কোথায়; তুমিই ত' সব—আমিই ত' তুমি; গুরুরূপে তুমি মন্ত্রদাতা, মাতৃরূপে তুমি উদ্ধার কর্ত্তা। বিশ্ববন্দিনি! আগম-নিগম, বেদ-বেদান্ত যখন তোমার মহিমা কীর্ত্তন ক'র্ত্তে পারে নাই—তখন মানুষের ভাষা সেই অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মময়ীর গুণ কীর্ত্তন করিবে কেমন করিয়া; তুমি যারে কৃপা কর

কৃপাময়ী কিবা ভয় তার এই ত্রিভুবন মাঝে; কে ডরে শমনে দেবী পাইলে পরমপদ নিদান সময়! মা, তুমিই তোমার স্বরূপ, এ জগৎ তোমারই মূর্ত্তি—তুমি দয়া না করিলে কার ক্ষমতা তোমায় জান্‌তে পারে, রামকে জানিয়েছ—তাই আজ তোমায় জেনেছে—এখন কোলে তুলে কৃতার্থ কর।

ভগবতী ভক্ত সাধককে কোলে করিয়া ধন্য হইলেন। মরি মরি, এমন সকাম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে কে নিষ্কামে চায়! বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র যে পদ ধ্যানে পান না—ভূতনাথ শ্মশানবাসী হইয়াও যাঁহার কৃপালাভে অসমর্থ, আজ মর্ত্ত্যবাসী মানব—সেই ত্রিলোকের আরাধ্য পদের অধিকারী হইল। এইজন্য বলিতে হয়—মানবের সাধন শক্তি দেবশক্তি হইতেও অধিক।

সাধকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল। ভগবতী মা আমার ভক্তবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রামেশ্বর গুরুপদে প্রণাম করিয়া উত্তর-সাধক বিরূপাক্ষকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া শবের ঝুটিকা মোচন করিয়া শবকে পুনরায় ধৌত করত তাহার বন্ধন মোচন করিলেন এবং শবকে পুতিয়া ফেলিয়া পূজার দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিয়া বাটী ফিরিলেন। কোথাও কোথাও জলে ভাসাইয়া দিবারও নিয়ম আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধিলাভের পর।

সামান্য আকাঙ্ক্ষার বস্তু পাইলে লোকের কত আনন্দ হয়, আর আজ এ অপার্থিব হৃদয়ের বস্তু পাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে কিরূপ হইয়াছেন—তাহা বলা যায় না; আজিকার এ আনন্দ পার্থিব কোন বস্তুর সহিত তুলনা হয় না—জগতের অসার বস্তু এ অভূতপূর্ব্ব আনন্দদানে অসমর্থ; সাধকের সিদ্ধানন্দ, মাতৃচরণ দর্শনের সে অসীম প্রীতি—যে দর্শন করিয়াছে—সেই যখন বলিতে পারে না, প্রকাশ করিবার ক্ষমতা যখন তাহারই নাই, তখন নগণ্য এ গ্রন্থকারের ক্ষমতা কোথায় যে সে ভাষায় ব্যক্ত করিবে? এ আনন্দ প্রকাশ করিতে ভাষা হার মানে, বাক্য স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, এ আনন্দ অনুভবের জিনিষ, মনেপ্রাণে অনুভব কর, আর প্রেমময়ীর প্রেম সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাও। রামেশ্বর ও নির্ম্মলার আজ সেই ভাব; শ্মশানে যেইক্ষণে রামেশ্বর ভগবতীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন—আর নির্ম্মলা দশসহস্র জপে আত্মনিয়োগ করিয়া ঠিক সেই সময়ে গৃহে বসিয়া সেই ভবারাধ্য চরণ-দর্শনে কৃতার্থা; তাই স্বামী-স্ত্রীর আজ আত্মভোলা আনন্দময় ভাব। অথবা স্বামী যার অতুল ধনের অধিকারী—স্ত্রী কি সে ধনে বঞ্চিত হইতে পারে, না স্বামীর আনন্দে সতী স্ত্রীর আনন্দ অনুভব হয় না? নির্ম্মলা আনন্দ সলিলে ভাসিতেছিলেন—আজ তাঁহার সে কমনীয় সৌন্দর্য্য, সে অঙ্গের অপরিসীম জ্যোতির্ব্বিচ্ছুরণ দেখিলে এ কথার সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

রামেশ্বর পরদিন গৃহে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের প্রতিশ্রুতি মত পিষ্টক নির্ম্মিত সামিষ বলি প্রদান করিয়া নিজে উপবাস করিয়া রহিলেন।

পরে সমস্ত দিনরাত্রি এইরূপে সংযমী হইয়া পরদিন পঞ্চগব্য পান করিলেন।

সকল কার্য্যসিদ্ধির পর ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়—মোক্ষফল লাভের ইহাই নিয়ম—নতুবা কার্য্যসিদ্ধি হানিকর হইয়া সাধক নির্ধন হন—দেবীও কুপিতা হইয়া থাকেন।

গুরুদেব অবধূত আর সঙ্গে আসেন নাই—তিনি নির্ব্বিঘ্নে শিষ্যের সাধনকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইল দেখিয়া—সানন্দচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন—বাবা! কর্ম্ম-জীবনের এইখানেই শেষ—যাহা পাইবার জন্ত কর্ম্ম—যে কর্ম্মের আশ্রয়ে বিজ্ঞান লাভের জন্ত এ প্রয়াস—আজ তুমি সেই ধ্যেয় বস্তু লাভে পরম বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ—এক্ষণে ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়া ভক্তিভরে কার্য্য কর। তবে আশ্রমধর্ম্মে নিশ্চেষ্ট হইবার উপায় নাই—আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সকল কার্য্যে দৃঢ় হও। আমি আর এ অঞ্চলে আসিব না, এই আমার শেষ। আর একবার দেখা হইলেও হইতে পারে—এই বলিয়া অবধূত চলিয়া গিয়াছেন।

রামেশ্বর গৃহে আসিয়া শাস্ত্রানুসারে পনর রাত্রি আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, কোন প্রকার আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করিলেন না, কারণ পনর দিন পর্য্যন্ত সাধক-শরীরে দেবতার অবস্থান হইয়া থাকে; এ কয়দিন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

ষোড়শ দিবসে রামেশ্বর স্বাহান্ত ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ৩০০ বার দেবীর তর্পণ, তারপর দেবতর্পণ এবং উদ্দেশ্যে গুরুদক্ষিণা উৎসর্গ করতঃ অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্য সমাপন করিলেন। তার পর ব্রাহ্মণ ভোজন পঁচিশ জন ব্রাহ্মণকে অতীব উপাদেয় আহার্য্য দানে পরিতোষ করিয়া গুরুর আদেশানুসারে উৎসর্গীকৃত গুরুদক্ষিণা বিতরণ করিয়া

সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিলেন, আবার সংসার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পঠন-পাঠনে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু মন আর এ সকল কার্য্যে তেমন ভাবে সংযোগ হয় না, সকল কার্য্যে যেন ভুল হইয়া যায়—কাজ করিতে করিতে যেন থামিয়া পড়েন, কি এক অচিন্ত্যনীয় চিন্তায় অধীর হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, আত্মভোলা ভাব যেন তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের গতিরোধ করিয়া মাতৃপ্রেমে বিহ্বল করিয়া দেয়।

বিরূপাক্ষ গুরুদেবকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া সংসারের যাবতীয় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তড়িৎ ও গোবর্দ্ধনের সাহায্যে আপনি চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার এ অমূল্য সময় সংসার-কার্য্যে বৃথা নষ্ট করিতে দিলেন না। বিরূর কেহ নাই, তিনি এখন তাঁহাদের বড় ছেলে—বাসুদেব ছোট।

রামেশ্বর এখন জীবনের প্রান্তভাগে তৃতীয় আশ্রমে আসিয়া, কর্ম্ম সকল একে একে উন্মোচিত করিয়া, আত্মার সকল সম্বন্ধ একে একে ছিন্ন করিয়া সমাজ হইতে একটু আলগাভাবে জীবন-যাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কর্ম্মজীবন শেষ করিয়া শেষের শোক-তাপ-পরিশূন্য আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সংসারের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির ভিতরও তিনি দেখিয়াছিলেন—সেই পূর্ণ আনন্দময়ী মাকে, এখন সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে আবার তাঁহাকেই দেখিতেছেন—অদ্বৈতং; ব্রহ্ম ও শক্তি এক, অভিন্ন, এইবার সেই চিদ্‌ঘন নিত্য সত্য নিরঞ্জন পরমানন্দ চৈতন্যের আনন্দসাগরে পূর্ণ আনন্দে নিমগ্ন হওয়াই শেষ পরিণতি—ইহাই জীবের বৈষ্ণবভাব! শাক্ত ও বৈষ্ণব ভিন্ন নহে—এক, যে যথার্থ শাক্ত—সেই পরম বৈষ্ণব, যে যথার্থ বৈষ্ণব—সেই পরম শাক্ত। অতএব নির্দ্বন্দ্ব।

ফুলের পরিণতি ফলে, তেমনি জীবনের এক এক স্তরের পরিণতি

এক এক স্তরে—নতুবা স্তরে স্তরে দ্বিজত্বের বা ব্রাহ্মণত্বের এত ক্রমবিকাশ হইবে কেমন করিয়া? পতিব্রতা পত্নী যেমন সমস্ত দিন তাঁহার স্বামীর সংসারে খাটিয়া খুটিয়া তাঁহার পরিজনবর্গের সেবাদি সুসম্পন্ন করিয়া দিবাশেষে সন্ধ্যা সমাগমে যেমন পতির সর্ব্বসুখময় আনন্দ-মিলনের জন্য সোহাগভরে পতি-সমীপে আগমন করে, তেমনি সংযমী গৃহীও সমস্ত সংসার-বন্ধনের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মে তাঁহার প্রাণের দেবতার পূজা শেষ করিয়া জীবন-সন্ধ্যার শুভ বাসরে সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া—সাধন-স্নাত পূতদেহে, পবিত্র মনে হৃদয়-দ্বার একান্ত উন্মুক্ত করিয়া তাঁহারই চরণ-প্রান্তে আত্ম-সমর্পণ করে; সামান্য প্রেম তখন গাঢ়তম করিয়া নিজেকে এই অসামান্য প্রেম-হ্রদে আনিয়া ডুবাইয়া দেয়। এই সময় জীবের ভূমানন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে. সসীম অসীমে এই সময়েই পূর্ণ মিলন হয়, ইহা দ্বিজত্বের বা ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ বিকাশের দিন, যাহারা বুঝে না তাহারাই বলে—জীবনের অবসান কিন্তু ইহাই ত' অবসান নহে, পূর্ণ বিকাশের মহামাহেন্দ্রক্ষণ, প্রিয়তমের সহিত পূর্ণ মিলনে বিরহ বিচ্ছেদের চির-পরিসমাপ্তি।

রামেশ্বরের প্রাণে আর প্রিয়-বিরহের ভয় নাই—জীবন ভয়শূন্য। তাই আনন্দে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ, মন পূর্ণ, হৃদয় প্রেমরসে ডগমগ! সন্ধ্যার পর গৃহদেবতা ভগবান্ নারায়ণের ও দেবী ভবানীর আরত্রিক কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রে একবার পঞ্চবটীতে যাইবেন, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপবেশন করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। নির্ম্মলা কিছু আহার দিয়া যাইলেই হয় কিন্তু আজ পিসীমাতার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে, সকলেই তজ্জন্য ব্যস্ত, তিনিও এইমাত্র আসিয়া আরত্রিক কার্য্য শেষ করিয়া আনমনে বসিয়া আছেন, রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে, এই সময় একজন লোক জীর্ণ মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া

ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছে না—তথাপি রামেশ্বর বলিলেন—কে তুমি, কি চাও?

আগন্তুক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভাই রামেশ্বর! চাহিবার আর কি মুখ আছে, না এ কালামুখ তোমার মত সাধকের কাছে দেখাইবার শক্তি আছে, কিন্তু না আসিলেও নয়, ভবানী মৃত্যুমুখে শায়িত, রামেশ্বর! রামেশ্বর কি হবে ভাই! আমি তোর হতভাগা দাদা। এই বলিয়া হাত দুটী জড়াইয়া ধরিলেন।

রামেশ্বর আন্‌মনে বসিয়াছিলেন—হৃদয়-তন্ত্রিতে কে যেন জোরে আঘাত করিল—জ্যেষ্ঠের সেই দারুণ দৈন্ত-দশা দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন—দাদা! দাদা! একি, এমন দশা তোমার কেমন ক'রে হ'লো!

সর্ব্বেশ্বর। ভাই! সে কথা পরে বল্‌বো; এখন ভবানী যে যায় যায়, সে কাকা-কাকীকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছে, তাহার উপায় কি, কল্‌কাতায় আনিয়াছি বটে কিন্তু এমন অর্থ নাই যে চিকিৎসা করাই।

প্রাণের ভবানী মৃত্যুশয্যায়! রামেশ্বর সকল চিন্তার অতীত হইলেও একথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সিদ্ধাসনে যাওয়া আর হইল না, তৎক্ষণাৎ ভবরোগের অমোঘ ঔষধ, সকাম-কর্ম্মে একমাত্র সিদ্ধিপ্রদ চণ্ডীর পুঁথিখানি লইয়া রামেশ্বর বাটীর বাহির হইলেন এবং একেবারে কলিকাতার বাসায় প্রাণের ভবানীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া সেই কঙ্কালসার মুমূর্ষু দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন। ভবানী এফ, এ পাশ করিবার পর হঠাৎ ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রমোদা রামেশ্বরকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রাণের দেবর, ধার্ম্মিকপ্রবর তোমাকে অবহেলা করিয়াই আজ আমাদের

দুর্গতির একশেষ—একমাত্র পুত্র-ধনে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি; ভাই! আমাদের এ সকল দোষ ক্ষমা করিবে কি?

রামেশ্বর। বউদিদি! এত অধীরা কেন, দুঃখে পড়িয়া কি একেবারে সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছ; আমি যে তোমাদের পুত্রস্থানীয়, সেই ছোট ভাই রামেশ্বর! ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই বা ভাজের আবার অপরাধ কি. আমি যেমন ছোট, যেমন ভৃত্যস্থানীয়, তেমনিই আছি, আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার পাত্র। ভয় কি! ভবানীর কৃপায় ভবানী আমাদের এত শীঘ্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না। সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা সাধক-প্রাণের সেই দীপ্ত তেজোব্যঞ্জক বচন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, ভবানী স্নেহময় কাকার কোলে মাথা রাখিয়া চক্ষু মেলিল, এতদিন পরে যেন একটু আশ্বাস পাইল, প্রাণের যাতনা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল।

রামেশ্বর দাদার এইরূপ শোচনীয় পরিবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রাণের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—ভাই! নিজের বুদ্ধি দোষে কষ্ট পাইতেছি—"দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি" প্রথমে চাকরীবাগে বদলী হওয়াই আমার কাল হইল 'কিন্তু না যাইতে নয়, যখন চাকরী করিতে হইবে, তখন মনীবের কথার অন্যথা করা ত' চলে না। আমরা চলিয়া গেলাম—মহিম কলিকাতায়ই রহিল, কিছুতেই আমাদের সঙ্গে গেল না। আমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় কলিকাতার যে সামান্য বিষয়-আশয় তাহা সমস্তই তাহারই নামে করিয়াছিলাম। প্রমোদার ভাই বলিয়া আমি তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতাম। তার নামে বিষয়-আশয় কর্ব্বার আর একটী প্রধান কারণ তোমাকে ফাঁকি দেওয়া—সরল প্রাণে সর্ব্বেশ্বর একথা প্রকাশ করিতেও ছাড়িলেন না আমরা যথাসময়ে সেখানে গেলাম। প্রথম প্রথম

মহিম পত্রাদি দিত, বাড়ীভাড়া আদায়ের কিছু কিছু টাকাও পাঠাইত, প্রায় এক বৎসর এইরূপ করিয়া শেষে আর পত্রও দেয় না, টাকাও পাঠায় না। সে সময় আমার কাজের বড় ভীড়—নূতন আফিস, ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেও পারি না, তাহার উপর মহিমের মাতা শয্যাগত হইলেন—যথাসাধ্য তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম এবং মহিমকে টেলিগ্রাফ করিলাম, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল—মহিমের কোনও খবর পাওয়া গেল না; শাশুড়ী ঠাকুরাণী পুত্রের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। পুত্রের সহিত দেখা হইল না। ত্রিরাত্রে শ্রাদ্ধ করিয়া তোমার বৌদিদি একপ্রকার শুদ্ধ হইল।

গ্রহ যখন বিমুখ হয়, বিপদ যখন আসে—তখন একা আসে না। উপর্য্যুপরি মানুষকে নাকানী চোকানী না খাওয়াইয়া ছাড়ে না। আমারও তাই হইল। নূতন আফিস, সাহেবও নূতন, কিন্তু একবার কলিকাতায় না আসিলেও নয়; কয়েকদিনের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম! দেখিলাম—মহিম সেখানে নাই। পাশের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা মহিমের সংবাদ ত' বলিতেই পারিল না, অধিকন্তু বলিল যে, সে এ বাড়ী বিক্রয় করিয়া আজ পাঁচ ছয় মাস আর এ দিকে আসে নাই। শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম, কিন্তু কি করিব? কোনও কথা প্রকাশ না করিয়া কিছু জলযোগান্তে তাহার ইয়ার-বন্ধুদের বাড়ী গেলাম। তাহারা তাহার দুশ্চরিত্রের কথা বলিল—সে অতিরিক্ত মাতাল এবং বেশ্যাসক্ত হইয়াছে, বাড়ী বিক্রয়ের টাকা লইয়া একটা মাগীর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহা তাহারা বলিতে পারিল না।

আমার ঠিক প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছে। তোমার মত ধার্ম্মিক ভাইকে অবিশ্বাস করিয়া, ফাকি দিয়া আমাদের এতদিন দুর্গতির একশেষ কেন

যে হয় নাই, তাই ভাবিতে ভাবিতে অতিরিক্ত দুঃখে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলাম এবং প্রমোদাকে সমস্ত কথা বলিলাম। সে তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সমস্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—কান্নাকাটায় আর কি হইবে? মনের দুঃখ মনে চাপিয়া আফিসে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম—প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার গালা খরিদ-বিক্রীতে অনেক টাকা লোকসান হইয়াছে; নূতন ম্যানেজার সাহেব, আমার অনুপস্থিতিতে না বুঝিয়া উহা বিক্রয় করতঃ লোকসান করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই বড় সাহেব এখানকার কারবার তুলিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল—আমরা পুনরায় কলিকাতায় আসিলাম, কিন্তু এখানকার অবস্থাও তথৈবচ। লোক জবাব দিয়া খরচ কমাইবার জন্য সাহেব এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমার স্থানে একজন পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিয়া বেনিয়ান খুঁজিতে লাগিলেন। আমার হাতে টাকা নাই—পূর্ব্বের অবস্থা থাকিলেও হইত। কাজেই অন্য লোক জুটিল—আমার চাকরী গেল—আমি নানাস্থানী হইয়া পড়িলাম। ভবানী আমার অবস্থা দেখিয়া, দুই বেলা অতিরিক্ত পরিশ্রম সহকারে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করিতে লাগিল এবং পাঁচ ছয় মাস তাহাতেই বেশ চলিল—তার পর তাহার অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হওয়ায় সমস্তই এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এখন অন্নাভাব, আর বাসস্থানের অবস্থা ত' দেখিতেছে। জীবনে আমরা কখনও এরূপ ঘরে বাস করি নাই। ভাই! আমরা মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই—আর আমাদের মত মহাপাপীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ কিন্তু এ নিষ্পাপ নিরীহ দুধের ছেলের আয়ু কি এত শীঘ্রই ফুরাইবে! এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন।

দাদার অবস্থা এবং অপরিণামদর্শিতার বিষয় শুনিয়া রামেশ্বরের স্থায়

সংসারাসক্তি-শূন্য, ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ সাধকেরও প্রাণ দমিয়া গেল। মহিমের বিষয় তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন—তবে দাদার বিষয় যে তাহার নামে আছে এবং ভিতরে ভিতরে সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিবেন? তাই তিনি কোনও প্রকার দ্বিধা বোধ না করিয়া আত্মীয়জ্ঞানে তাহার বিপদুদ্ধার করিয়াছিলেন। রামেশ্বর দাদার কাছে মহিমের বিষয়, তাহার বিপদের কথা এবং অনাথশরণ ডেপুটীর পরামর্শে উদ্ধারের কথা বলিলেন। তার পর সে উদ্ধার হইলে তাহাকে তোমাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিল না। শীঘ্র দেখা করিব—বলিয়া সেই যে চলিয়া গিয়াছে, আর দেখা নাই।

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন,—ভাই! তোমার মত ধার্ম্মিকের সাহায্য পাইয়াছিল—তাই রক্ষা। নতুবা সেই সময়েই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইত! যাহা হউক, তাহার কথা আর তুল না, এক্ষণে ভবানীর বিষয় চিন্তা কর।

রামেশ্বর। ভবানীর জন্য মা ভবানী চিন্তা করিতেছে, আমাদের কোনও ভাবনা নাই। কল্য চণ্ডীপাঠ করিলেই ভবানী আরোগ্য হইবে কিন্তু এ অবস্থায় তোমাদের এখানে আর থাকা হইবে না।

সর্ব্বেশ্বর। কোন চুলোয় যাইব ভাই! আমাদের স্থান আর কোথায় আছে—নিজের পায়ে যে নিজেই কুঠার মারিয়াছি। দেশের সর্ব্বস্বও যে বিক্রয় করিয়াছি।

রামেশ্বর। দাদা! দেশের সর্ব্বস্ব তুমি বিক্রয় করিয়াছিলে কিন্তু বাপের ভদ্রাসন আমি বিক্রয় হইতে দিই নাই; ভবানীর জন্য আমিও তাহা তড়িতের দ্বারা বেনামী করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তোমার ঘর-বাড়ী তুমি সমস্ত বুঝিয়া লইবে চল। বাসুদেব, জেঠা-জেঠাই ও

বড়দাদার জন্য সময়ে সময়ে বড় অস্থির হয়। তাহাকে তোমরা পায়ের ধুলা দিয়া মানুষ ক'র্‌বে চল। আমাকে ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য সংসার থেকে একটু অবসর দাও। বাবার সমস্ত বিষয়ই ঠিক আছে, একটুও নষ্ট হয় নাই বরং বাড়িয়াছে।

প্রমোদা ও সর্ব্বেশ্বর, ছোট ভাইয়ের মহাপ্রাণতার কথা শুনিয়া কেবল অতিরিক্ত আনন্দে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। হায়! এমন সোণার চাঁদ ভাই—এমন দেবতুল্য হৃদয়বান্ সহোদরকে আমি ধনের মোহে কি কষ্টই না দিয়াছি, সেই পাপেই আজ আমাদের এই দুর্গতি।

তারপর সর্ব্বেশ্বর অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—উপরন্তু তিনটী প্রাণী; তোমার ত' কোন বিশেষ আয় নাই—চল্‌বে কি ক'রে ভাই?

রামেশ্বর। দাদা! চলাচলি সমস্ত মায়ের হাত। যখন কখনও অচল হয় নাই, সমভাবেই তিনি চালিয়েছেন—আর এখনই বা না চলিবে কেন?

ধার্ম্মিক রামেশ্বরের উদারতা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, পরিবারের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া আমার বিষয় ... য়া, আবার আমারই পুত্র ভবানীকে দান--মানুষ কি এরূপ ত্যাগী হইতে পারে? তাঁহারা কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"তোর কথা আব আমরা প্রাণ থাক্‌তে ঠেল্‌ব না।" ভবানী শয্যার উপর হইতে অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে বলিল,—"কাকা! আমাকে এ ঘরে আর রাখিবেন না—তা'হলে আমি বাঁচব না।"

রামেশ্বর। এ ঘরে আর তোমাকে কেন রাখব বাবা! তোমার ঘর-দোর ত' সব চাবিবন্ধ পড়ে রয়েছে। মা ভবানীর কৃপায় তোমার অভাব কিসের, যে নিতান্ত অনাথার মত এই এঁদো ঘরে পড়ে থাক্‌বে? কাল আর হইবে না, চণ্ডীপাঠেই সময় যাবে, পরশ্ব প্রাতঃকালে এখান থেকে চলে যাব। তোমার অসুখ শুনে বাড়ীশুদ্ধ সকলে হা পিত্তেশ

ক'রে বসে আছে। তোমার খুড়ীমার ইচ্ছা—যত টাকাই খরচ হউক, তোমাকে এই রাত্রেই বাটীতে নিয়ে যাওয়া কিন্তু তোমার শরীর ত' তেমন নয়, কাজেই এই রাত্রিতে নদীপার হওয়া উচিত নয়। খুড়া-ভাইপোর কথা এবং ভবানীর প্রতি নির্ম্মলার প্রাণের টান দেখিয়া প্রমোদা ও সর্ব্বেশ্বর হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এমন ধার্ম্মিকের সঙ্গ ছাড়িয়া কি কুকাজই করিয়াছি।

ভবানী ঘুমাইলে, রামেশ্বর তাহার পার্শ্বে প্রাণের ছাওয়ালকে আঁকুড়িয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। অতিরিক্ত আনন্দে সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। ভোরের বেলা চক্ষু একটু জড়াইয়া আসিল।

রামেশ্বর প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করেন। অন্যান্য দিনের মত আজও শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে বসিয়া ভগবানের নাম গান আরম্ভ করিলেন। যখন যে ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগিত, রামেশ্বর সেই ভাবই প্রকট করিয়া গাহিতেন। আজ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া গাহিলেন—

(হরি) নাম সুধা পান কর রসনা, এমন সুধা কোথাও পাবে না।

হরি ভবের কাণ্ডারী, যে ভাবে হন তারি, হরি ত্রিলোকতারণ,

মধুসূদন গোলকবিহারী।

নামে অরি নাশে, অবশেষে, শমন ভয় আর থাকে না,

(হরিনামের গুণে রে)

হরি বিশ্ববিধাতা, হরি জগতের মাতা, হরি ভয়ত্রাতা, বিশ্বপাতা,

বিশ্বসংহর্ত্তা।

অন্তরে তাঁরে ভাবলে পরে ভবের ভাবনা রহে না,

(হরিনামের জোরে রে)

ত্যজ বিষয় বাসনা, কেন অনিত্য ভাবনা, যাবে জীবন যখন
কিছুই তখন সঙ্গে যাবে না,
কেবল পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম এরা সঙ্গ ছাড়বে না (হরিনাম কর রে)
হরিনামটী ভাবময়, ভাবেতে ভাব হয় উদয়,
ভাবের ভাবে ভাবলে পরে, ভাবে দেখা হয়।
কেবল যুক্তি-তর্কে হয় না কিছু, প্রেম-ভক্তি ভাব বিনা,
(কেবল হরি বল রে
নামের মহিমা অপার, বর্ণিবার সাধ্য কার,
নামে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, পাপী হয় উদ্ধার,
নামে শীলা ভাসে, সাগর শোষে, ঘুচে যায় আনাগোনা,
(রামনামের গুণে রে)
দীন দেবানন্দ বলে মন, ক্রটী করো না কখন,
দিবানিশি ভাব বসি সে রাঙা চরণ,
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে কোসে, কোন কথা খাটবে না।
(বলো হরি বলো রে)

প্রমোদা ও সর্ব্বেশ্বরের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা বিছানায় পড়িয়া ভক্তকণ্ঠের ঐ প্রাণ-মাতান সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আজিকার দিন সুপ্রভাত বিবেচনা করিতেছিলেন। এমন সাধু-সহবাস ছাড়িয়া তাঁহারা এতদিন কোথায় ঘুরিতেছিলেন। জীবন-সাগরে ভাটা পড়িয়া আসিলে—দিনে দিনে শেষের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে স্বভাবতই মানুষের চিত্ত ধর্ম্মের জন্ম অস্থির হইয়া পড়ে- ইঁহাদেরও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তবে আরও কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে এত ভোগ আর ভুগিতে হইত না। কিন্তু মহামায়ার মোহমায়ার হাত এড়াইতে পারে কে—ভাগ্যে যাহা আছে—তাহা ত' হইবে !

শক্তি-সাধনা।

রাত্রি প্রভাত হইল—রামেশ্বর বড়বউকে চণ্ডীপাঠের উদ্যোগ করিতে বলিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। সর্ব্বেশ্বর এখন শিবাদহে একটী জঘন্য মাটীর ঘরে বাসা লইয়াছেন; এখান হইতে গঙ্গা অনেক দূর হইলেও, রামেশ্বর গঙ্গাস্নানে বিরত হইলেন না। যথা-সময়ে স্নান করিয়া আসিয়া পূজায় বসিলেন, সমস্ত দিন পূজা ও চণ্ডী-পাঠে কাটিল। আজ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার কোন কষ্ট হইল না—চণ্ডীপাঠ শ্রবণে প্রাণ তন্ময় হইয়াছে—উপবাসের কষ্ট বোধ হইবে কেন? ভবানীও সমস্ত দিন একপোয়া দুধ খাইয়া কাটাইয়া দিল—তাহারও কোন কষ্ট হইল না; মহিমাময়ী মায়ের এ মহিমা কীর্ত্তন—শ্রুতি-যুগলে প্রবেশ করিয়া যার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, সে যেমন লোকই হউক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাহার থাকিবে না। ভবানীর হৃদয়ে বল হইয়াছে—সকল দিন অপেক্ষা আজ সে সদানন্দে দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে কয়েকখানি গরম লুচী খাইল। আজ শরীরে শক্তি হইয়াছে—চণ্ডীর মহিমা শ্রবণে তাহার দেহ নববলে বলীয়ান্ হইয়াছে। অন্যান্য দিন বৈকালে জ্বর-ভাব হয়, আজ আর তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। চণ্ডীপাঠের মহিমা এবং সে বিষয়ে ভ্রাতার ঐকান্তিকতা ও অসীম সাধন-শক্তি দেখিয়া ভাই-আজ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত চিকিৎসায় যাহা হয় নাই—একদিন মাত্র চণ্ডীপাঠের গুণে তাহার অভাবনীয় ফল হইল—ধন্য সাধকের সাধন-বল।

সেদিন সকলে আহারাদি করিয়া একরূপে রজনী যাপন করিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে অশ্বযানে নদীতীরে আসিয়া নৌকাযোগে দেবীপুরে আগমন করিলেন। ঘরের ছেলে আবার ঘরে আসিয়া পল্লীর সেই সুশীতল শ্যামচ্ছায়ায় বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধাসনে।

অনুতাপ-অশ্রুজলে ময়লা মাটী ধৌত হইলে, পাপের কালীমা-দাগ মুছিয়া গেলে—হৃদয় নির্ম্মলীকৃত হইলে—তবে তথায় দেবতার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার এতদিন পরে তাহাই হইয়াছে। এইজন্য এখন তিনি দেবানন্দের পুত্র এবং রামেশ্বরের ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিতেছেন। প্রমোদাও এখন ছোট বোন্‌টীর মত নির্ম্মলাকে পাইয়া সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ত' অলঙ্কার পরে না—পোষাক-পরিচ্ছদের এত পারিপাট্য রাখে না—তবে এত রূপ এত সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে কেন? অতএব পুণ্যেই দেহের জ্যোতিঃ—পাপে নয়। অলঙ্কার ও পোষাকে কেবল তাহার জড়তা আনে মাত্র। সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার চমক্ ভাঙ্গিয়াছে—তাঁহারা এখন দেবানন্দের পবিত্র বংশের মত চাল চলন ধরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছে।

দাক্ষায়ণী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন—শেষ দশায় যে তাঁহারা ভাই ভাই একত্র হইল—ইহাতে তিনি ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপ মিলন দেখিয়া মরিতে পারিলেই—তাহার জীবনে অশেষ সুখ—তাহার হাতে গড়া মানুষ করা ধন, ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে গেলে প্রাণে যে বড়ই আঘাত লাগে! প্রমোদা ও নির্ম্মলা এখন দুইটীতে একটী; উভয়ে মিলিয়া পিস্‌শাশুড়ীর সেবা করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর আবার সংসারের সমস্ত ভার লইয়াছেন, রামেশ্বরের ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছেন—এ মানব-হৃদয় দেবভাবে গঠিত—ইহার তুলনা

নাই। দেবানন্দের ও উমাকালীর সাধের সাজান বাগান আবার এতদিন পরে পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল—প্রতিবাসী সকলেই এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

সংসারে কোন অনটন নাই—যখন যাহা আবশ্যক হইতেছে—তাহাই আসিয়া জুটিতেছে—অভাব হইতেছে না। ধর্ম্ম ধনে ধনবান হইলে, মাতৃপদে আশ্রয় লইলে, অর্থের অভাব হয় না—আবশ্যকমত তাহা জুটিয়া যায়ই। রামেশ্বর যে মাকে বাঁধিয়াছেন—রাজরাজেশ্বরী মা যে তাঁহার কাছে কাছে, অভাবের সম্ভাবনা তাঁহার কোথায় ?

এখন দাদা ও বউদির ঘাড়ে সংসার ফেলিয়া দিয়া রামেশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বাপ মা থাকিলে—ছেলে যেমন পর্ব্বতের আড়ালে থাকে, অভাব-অভিযোগের ভীষণ ঝড়-ঝাপটা যেমন তাহার গায়ে লাগিতে পায় না, তারপর পিতামাতা স্বর্গীয় হইলে বড ভাই ও ভাজ থাকিলেও কনিষ্ঠের সেই ভাব; রামেশ্বর এতদিন সে সুখে বঞ্চিত হইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন—মা আবার দয়া করিয়া সেই সুখে সুখী করতঃ আজ তাঁহাকে সংসার-চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাই এখন সদাসর্ব্বদা তিনি প্রাণের বিরূকে লইয়া সিদ্ধাসনেই অবস্থান করেন—মাতৃদর্শনের সাধ প্রবল—অনবরত তাহাই হইতেছে; আর সময়ক্রমে উপযুক্ত শিষ্য বিরূপাক্ষের সঙ্গে ধর্ম্ম-চর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতেছেন—আহারের সময় বাড়ীতে চারিটী খাইয়া আসেন মাত্র।

ভবানী ও বাসুদেব এখন একপ্রাণ এক আত্মা হইয়া লেখা পড় করিতেছে; উভয়ে যেন এক মায়ের পেটের ভাই, একজন আর একজন ছাড়া থাকে না, কোন কাজ-কর্ম্ম করিতে হইলে উভয়ে পরামর্শ করিয় সম্পাদন করিয়া থাকে। যে সর্ব্বেশ্বর চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালার নামে জ্বলিয়া যাইতেন, সেই সর্ব্বেশ্বর এখন প্রত্যহ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার

তত্ত্বাবধারণ করতঃ তবে জলগ্রহণ করেন। তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া শিষ্যবর্গ আপনা হইতে মাসহারা পাঠাইয়া দেয়, সাধারণ গুরুর মত যাতায়াত করিয়া তাহা আদায় করিতে হয় না। রামেশ্বরের গুণে শিষ্যবর্গ সকলেই মোহিত। ইহা মায়ের মহিমা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

রামেশ্বরের গুরুদত্ত নাম জ্ঞানানন্দ কিন্তু পাড়ায় তিনি সে নাম প্রচার করেন না—ঠিক পূর্ব্বের মত সকলের কাছে নত হইয়াই কাল কাটান। পার্থিব অর্থবলে মানুষ অহঙ্কারে সমুন্নত হয় বটে কিন্তু অপার্থিব পরমার্থলাভে মানুষ তৃণাদপি সুনীচই হ'য়ে থাকে! অন্যান্য দিনের মত আজও গুরু-শিষ্যে আহারাদির পর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বিরূপাক্ষ বলিলেন—গুরুদেব। আজকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন না; তিনের একটী না হ'লে কি কিছু হয় না?

রামেশ্বর। কেমন ক'রে হবে, তিনই যে এক, একটা না হ'লে আর একটা হয় না, কর্ম্ম না হ'লে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না হ'লে ভক্তির উদয় অসম্ভব। সাধনার তিনটী পথ, ঐ তিনটী ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটী ছাড়িয়া ধর্ম্ম করা চলে না।

বিরূ। তবে কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম ক'র্ত্তে হবে ত'?

রামেশ্বর। কামনা শূন্য হ'য়ে ত' কর্ম্ম হয় না, একটা না একটা কামনা থাকেই। কামনাই যে কর্ম্মের প্রাণ, কামনা না থাকলে কর্ম্মে অগ্রসর হওয়াই যায় না! সংসারবিরাগী সাধুগণও মুক্তিকামী, অতএব কামনাশূন্য কে? যে যেমন অধিকারী, তার সেইরূপ কর্ম্ম করাই উচিত, তবে সকল কর্ম্মই অহংজ্ঞানশূন্য হ'য়ে করাই ভাল, আপনার সুখভোগের জন্য যে কর্ম্ম—তাহাই সকাম, আর পরের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম সকাম হইলেও নিষ্কাম বলে ধ'র্ত্তে হবে।

বিরু। গীতায় যে ভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্ত্তে বলে গেছেন, নিষ্কাম কর্ম্ম না হ'লে যে মুক্তি হবে না।

রামেশ্বর। গীতায় ভগবান কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের কথাই বলেন নাই বরং সকাম কর্ম্মীদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৮ শ্লোক অবধি ভাল ক'রে পড়লেই বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্ম একেবারে নিষ্কাম কেমন করিয়া হইবে? সাধারণ মানুষ কামনা-পরিশূন্য হইলেই মৃতবৎ জড়পিণ্ডস্বরূপ হ'য়ে যাবে। ভোগ পরিসমাপ্তি না হইলে যেমন ত্যাগ আসে না, প্রবৃত্তির শেষ না হইলে যেমন নিবৃত্তি হয় না, তেমনি কামনা করিয়া কার্য্য না করিলে নিষ্কাম হইবে কেমন করিয়া? একেবারে তাহা হয় না, এইজন্য আর্য্যশাস্ত্রে আশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা—বর্ণাশ্রম-প্রতিপাদিত কার্য্য ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তবে নিষ্কাম বল, নিবৃত্তি বল, বৈরাগ্য বল আপনি এসে পড়ে—জোর ক'রে কি এ সব হয়? গায়ে নূতন আবরণ তৈয়ারী হইলেই সাপের খোলস্ আপনি খসে পড়ে—টেনে ছাড়াতে হয় না। তেমনি এই আশ্রমধর্ম্মের স্তরে স্তরে উঠিতে পারিলেই চতুর্থ আশ্রমে জ্ঞানের সাহায্যে আপনিই খোলস্ ছেড়ে যায়, নিষ্কাম বা নিবৃত্তি আপনি হইয়া যাইবে। অকালপক্ক অবস্থায় ঐরূপ ক'র্ত্তে গেলে হিতে বিপরীত, কিলিয়ে কাঁটাল পাকালে কি তার মিষ্টতা থাকে? ইচোঁড়ে পাকিয়া গেলে সে না হোমে—না যজ্ঞে, তরকারীও হয় না, শুধুও খেতে পারা যায় না।

বিরু। আচ্ছা প্রভু! সকামে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না?

রামেশ্বর। ভগবানকে পাওয়া ত' সকামেরই কাজ; পাইয়া যখন, তখন কামনা; ধ্রুব ত' ঐ সকামেই পেয়েছিলেন। পাওয়া-পাওয়ী সকামেরই কাজ; তবে যাওয়া-আসা ঘুচে না, নিষ্কাম হতে না পারিলে? কিন্তু আশা না মিটলে ত' আর নিষ্কাম হওয়া যায় না!

এই ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ আশ্রমের কার্য্য সকল ক'রে সন্ন্যাসে যেতে পারলেই যে যথার্থ ত্যাগী—তাহার সাধনাই যথার্থ নিষ্কাম। সে তখন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগবিলাসের হাত এড়িয়ে পড়েছে, সব সাধ মিটিয়ে নিয়েছে—কাজেই আর দরকার কি?

বিরূ। গীতায় ত' ভগবান্ কর্ম্মফল তাহাকে অর্পণ ক'র্ত্তে বলেছেন?

রামেশ্বর। কাকে বলেছেন, তোমাকে আমাকে কি?

বিরূ। না, অর্জ্জুনের ন্যায় সাধককে।

রামেশ্বর। অর্জ্জুন আর সাধারণ মানুষে কি সমান। ভগবানের প্রীতির জন্য জীব সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক—ইহাই গীতার উপদেশ আমরা ত' নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম সকল শেষ করিয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য বলিয়া থাকি—"এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।" নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হওয়া বড় সহজ কথা নয়। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও তাহা বলিয়াছেন। অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা যখন বিচলিত হইয়াছিলেন—তখন তোমার আমার কথা কি? তবে বল্লেই হয় না, আর্য্য-ঋষিগণপ্রদর্শিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যাইতে পারিলে—নিশ্চয়ই নিষ্কামী হইতে পারা যায়।

বিরূ। আপনি যে বলিলেন—সকামে ভগবান পাওয়া যায়—কিন্তু মুক্তি হয় না—এ কিরূপ কথা?

রামেশ্বর। মুক্তি তোমার কর্ম্মের ফল—আর ভগবদ্দর্শন তাঁহার ইচ্ছাধীন—ভক্তকে তিনি দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না। অসীম পুণ্য-কার্য্য করিলেও ত' তোমার মুক্তি হইবে না—যাতায়াত ঘুচিবে না? নিষ্কাম হইতে মুক্তি হয়—তবে সেই নিষ্কাম কথার কথা নয়—বল্লেই হয় না, আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তাহা পাওয়া যায়। কথায় কথায় আমরা যে বলি নিষ্কাম-নিবৃত্তি—তাহা পাকামো কথা, না জানিয়া, না বুঝিয়া

বাহাদুরী করা ভিন্ন আর কিছু নয়। অর্জ্জুন হেন সাধক যখন নিষ্কাম—নিবৃত্তির কথা শুনিয়া মহা সন্দেহে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে-মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

যখন আমরা ঘোর সংসারী, নরকের কীট, মহা স্বার্থপর—নিষ্কাম নিষ্কাম—নিবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া এত হৈ-চৈ করি কেন ?

বিরূপাক্ষ। আচ্ছা প্রভু ! তবে সন্ন্যাস অবস্থায় আর কোনও কর্ম্ম নাই ?

রামেশ্বর। কর্ম্ম আছে, কর্ম্ম ছাড়া কি জীব থাকৃতে পারে—তবে ফলে আশা নাই, সেই অবস্থাই আমার গুরুদেবের। সংসারের অতীত তুরীয় অবস্থা, সোঽহং ভাব, ভগবান্ ও তাঁহাতে কিছুই প্রভেদ নাই ; তবে তিনিও কি কর্ম্ম করেন না—যাহা করেন—পরের জন্য, নিজের জন্য নয় এবং তাহাতে কোন কামনা নাই ? এইরূপ অবস্থাই কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

বিরূপাক্ষ। সমাজের মধ্যে আসিলে উঁহারাও ত' সমাজ মানিয়া চলেন ?

রামেশ্বর। লোক-শিক্ষার জন্য মেনে চল্‌তে হয় বই কি, নতুবা সমাজ যে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাবে ? তবে অনেক ভুল হ'য়ে যায় বলে—প্রায় সমাজে থাকৃতে চান্ না, এসে পড়লে পাগলের মত ভাব দেখান—তাহ'লে লোকে আর গ্রাহ্য ক'র্ব্বে না।

বিরূপাক্ষ। এখন কর্ম্ম বুঝলাম। এইবার জ্ঞান-ভক্তির কথা বলুন।

রামেশ্বর। কর্ম্মেই জ্ঞান হয়—নতুবা হয় না। জ্ঞান হইলে ভক্তি আসে। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদর ভাই-বোন্। জ্ঞানকে না জানিয়ে

ভক্তি একলা কোথাও গেলে সময়ে সময়ে হিতে বিপরীত হয়। এই জন্য দেখা গিয়েছে—একদিন যে হৃদয়ে প্রভূত ভক্তির বিকাশ ছিল; ভগবানের নাম-গানে একেবারে যে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌তো, সেই হৃদয়ই আবার ব্যভিচারের চূড়ান্ত ক'রেছে, পাপ-দানবের তাণ্ডব-নৃত্যে তাহা ঘোর কলুষ-কালিমায় মলিন ক'রেছে কিন্তু ভায়ের সঙ্গে যেখানে বোন্‌ গিয়েছে অর্থাৎ ভাই-বোনে যেখানে দুই জনে একত্র হ'য়েছে, সেখানে আর কোন গোলমাল হয় না। সেখানে স্বর্গের মন্দাকিনী পরিপ্লাবিত হইয়াছে; নন্দনের পারিজাতগন্ধে সেখানকার গগন-পবন পবিত্র করিয়াছে।

বিরূপাক্ষ। প্রভু, ভাল বুঝ্‌তে পারলাম না—একটু বিশদ ক'রে বলুন।

রামেশ্বর। জ্ঞান অর্থে ঈশ্বর সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কতকগুলো পুঁথি প'ড়ে মুখস্থ কর্‌লেই জ্ঞান হয় না। সংশয়-শূন্য হ'য়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে জ্ঞান বলে। যেখানে সংশয় নাই—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, সেইখানেই ভক্তির আসন সুদৃঢ়। কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হ'য়ে জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞান হ'লে তবে ভক্তির বন্যায় হৃদয় ভাসিয়া যায়। এই ভক্তিই তখন ভগবৎপ্রাপ্তির সার সামগ্রী, নতুবা তার কতটুকু শক্তি যে সে অনন্ত শক্তিময়ীকে হৃদয়ে ধরিবে, কতটুকু জ্ঞান যে সেই জ্ঞানাতীত বস্তুকে উপলব্ধি করিবে, জোনাকী পোকার কি সূর্য্যপ্রকাশের ক্ষমতা আছে? সুতরাং একমাত্র ভক্তি ব্যতীত জীবের আর অন্য উপায় নাই। ভগবান্‌ নিজেই ত' ভক্ত ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন—কেন গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩—২০ শ্লোক কি পড়ো নাই?

বিরূপাক্ষ। হাঁ পড়েছি প্রভু। কিন্তু এমন ক'রে বুঝতে পারিনি:

গীতা যে যোগশাস্ত্র—শুধু তোতা পাখীর মত পড়লে কি হবে? গুরু না বুঝালে কি উহা সহজে বুঝতে পারা যায়!

রামেশ্বর। সে কথা ঠিক—আজকাল কিন্তু যে সে গীতা পড়ে, কিন্তু কি বুঝে, তা তারাই জানে। তবে ভক্তির সাধনায় পাকা হ'লে তার প্রেম আসে, প্রেম পাকা হ'লে তার ভাব হয়। ইহা বড় সহজ নয়! আজকাল অনেককেই দেখা যায়—খোলের চাঁটী পড়লেই শ্রীখোল বলে কাঁদে—নাম শুনতে না শুনতে ঢলে পড়ে, একে ভাব বলে না—ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র। শ্রীরাধার ভাব যথার্থই পাকা ভক্তির ভাব, ভাবে মজা ভাব।

বিরূ। কেন ঠাকুর, এত ভক্ত বৃন্দাবনে ছিল—তাদের কি কিছু নয়?

রামেশ্বর। কিছু নয় কেন, তবে রাধার মত নয়। শ্রীকৃষ্ণের এত কলঙ্ক, এত চাতুরী, এত বিরহ, বিচ্ছেদে প্রাণ যায় যায়—তথাপি কৃষ্ণনিন্দা তাঁহার অসহ্য। শাশুড়ী ননদীর এত তিরস্কার, তথাপি দৃক্‌পাত নাই। সে আমার, আমি তাঁর, সেই মহানুভবের মহাভাবে রাধা পাগলপারা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-হ্রদে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনহারা হ'য়ে ডুবে যেতে রাধা ছাড়া আর কে পেরেছিল?—ইহাই অনন্তসাধন, ইহাই অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ—ইহাই রাধাভাব।

বিরূ। আচ্ছা ঠাকুর, এ অবস্থা জীবের কখন হয়?

রামেশ্বর। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবের অবস্থা, বদ্ধ জীব যখন শাস্ত্র পাঠে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির বাহু-পাশ মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা বা সাধনা করে—তখন সে শক্তি-উপাসক—শাক্ত। আর যখন সাধন ভজন পরিসমাপ্তি ক'রে, মায়ামুক্ত হ'য়ে সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের প্রেম—মাধুর্য্যরসে মজিয়া যায়, তখন সে পরম বৈষ্ণব। এই অবস্থায় আর সাধনা থাকে

না— ঈশ্বর-সত্ত্বায় একেবারে মজে যায়। তাঁর স্বরূপ-শক্তি প্রাপ্ত, সোঽহং হ'য়ে যায়। জীব সাধনমার্গের এত দূরে যখন এসে পড়ে—তখন তাহার কর্ম্ম গিয়াছে; কামনা, বাসনা সবই গিয়াছে, অতএব শক্তির আর দরকার কি? তখন তার সব তাঁকে দিয়ে, আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁহাতে মিশে যায়। ভক্ত ও ভগবানের এই অভেদ গত মিলনের নাম "রমণ"। এই বিপরীত বিহারের অবস্থাকে—এই আত্মায় আত্মায় রমণের অবস্থাকে এই মধুরভাবে আলিঙ্গনকেই ভাব-সমাধি বলে। সাধন-বলে এই অবস্থায় আসিতে পারিলেই মানুষ দেবতা!

বিরু। প্রথমে তবে শক্তির উপাসনাই দরকার?

রামেশ্বর। সাধনার অবস্থায় শাক্ত না হ'লে চল্‌বে না—ভগবান্ শঙ্কর সতীকে বিয়ে ক'রে কৈলাসে সংসার পাতিলেন, সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া যখন অনেক খেলা কর্‌লেন, তখন তাঁহার জীব-ভাব—সাধনার অবস্থা; তার পর যখন দক্ষযজ্ঞ হলো, সতী যখন শিবের কথা না শুনে ছলে বলে কৌশলে সেই যজ্ঞদর্শনে বাপের বাড়ী গেলেন; তখন শিব বুঝলেন— শক্তি তাঁর বশ নহেন। অতএব সাধনার দরকার, তাই সতীর মৃত্যুর পর তিনি শক্তিকে আয়ত্ত করিবার জন্য যোগাসনে যোগমগ্ন হইলেন— শিব এখন শাক্ত। তার পর সতী হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম লইয়া শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য আবার ইচ্ছা করিয়া—নারদকে পাঠাইলেন কিন্তু তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। যে সতীর জন্য তিনি উন্মত্ত হ'য়েছিলেন, মৃতদেহ লইয়া পাগলের মত ত্রিভুবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন; সেই প্রাণের প্রিয় ধনকে তিনি ফিরিয়াও দেখিলেন না। শক্তি ত' শিব ছাড়া থাকৃতে পারেন না, বেগতিক দেখে তিনি মদনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গতে গেলেন—মদন ভস্ম হ'লো, এইবার তিনি শক্তিকে পত্নীরূপে

করায়ত্ত করিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মরসাস্বাদনে ব্রতী হইলেন—এখন শিব বৈষ্ণব. ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান্—অথবা সোঽহং ব্রহ্ম !

বিরূ। এখন দেখ্‌ছি তন্ত্রের সাধনাই প্রথম দরকার, নতুবা কিছুই হয় না, সাধনায় অগ্রসর হওয়াই যায় না?

রামেশ্বর। শক্তি ত' আগে দরকার, না হ'লে অগ্রসর করিবে কে ? সাধনা ক'র্ত্তে হ'লে আগে আপনাকে জান্‌তে হয়. তান্ত্রিক-সন্ধ্যার আচমনে প্রথম অবস্থায়ই আত্মতত্ত্ব, আপনাকে জানা, দ্বিতীয় অবস্থা—বিদ্যাতত্ত্ব অর্থাৎ মূলাধারে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে ব্রহ্মশক্তি আছেন, তাঁকে জানা বা জাগান, তৃতীয় অবস্থা—শিবতত্ত্ব অর্থাৎ শিরস্থিত শ্বেতবর্ণ সহস্রদল-কমলে যে পরম শিব অবস্থিতি করিতেছেন—তাঁহাকে জানা। সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে ঐ শক্তিকে উদ্বোধিত ক'রে, দেহস্থিত ষট্‌পদ্মের উপরে তালে তালে উঠাইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মরূপী শিবের সহিত রতিক্রিয়ায় আসক্ত করিবে, ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মযোনিতে উঠিবে পড়িবে, মূলাধারে আসিবে, আবার উঠিবে, এইরূপে সুষুম্না-রাস্তা পরিষ্কার করিয়া শক্তি তাহাতে লীন হইয়া যাইলে, তাহা হইতে শ্বেত ও রক্তবর্ণ সত্ত্ব ও রজোময় তেজঃ নিঃসৃত হইবে, কুণ্ডলিনী-শক্তি ঐ সুধারসে পরিপ্লুত হইয়া মূলাধারে আসিবে—আবার যাইবে—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ সাধক ঐ সুধাধারা পান করিবে, উহাই মদ্য—ঐ মদ্য পান করিতে পারিলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না—এইজন্য কুলার্ণব বলিতেছেন :—

পীত্বা পীত্বা পুনঃপীত্বা পতিতো ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

ইহা সাধারণ শুঁড়ির দোকানের মদ নহে। শাস্ত্র তাহা পান করিতে, এমন জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

বিরূ। ঠাকুর, তন্ত্রসারে ত' সাধারণ মদের ব্যবহারও আছে ?

রামেশ্বর। সে কার্য্য-বিশেষে, যেমন শব-সাধনা, শ্মশান-সাধনা প্রভৃতি, উহাতে প্রথম আসুরিক শক্তি দরকার, একেবারে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া মরিয়া না হইলে, এই সকল সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না, আর এত শীঘ্র ব্রহ্মদর্শনও হয় না, এইজন্য উহা উপচাররূপে প্রয়োগ করা হয়, শব-সাধনা হইল সাধন-সমর—এখানে ভয়ানক বীরত্ব দেখান দরকার—তাহা দেখাইতে হইলে মত্তভাব আবশ্যক, বীরের মধ্যে এইজন্য মদ্যপান ব্যবস্থা, আর মদের একটা একাগ্রতা আনিবার ক্ষমতাও আছে। তবে এইরূপ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সময় উহা স্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়—তন্ত্র ইহাও ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন।

আজ সমস্তদিন বিরূপাক্ষ গুরুকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা লইতেছেন কিন্তু আর না, জ্ঞানানন্দ এইবার উঠিবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময় ভবানী আসিয়া বলিল—কাকা! আপনি একটু চট্ ক'রে আসুন, ঠাকুরমা কেমন ক'র্‌ছেন, তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য বিব্রত হ'য়েছেন। "আচ্ছা যাও বাবা আমি যাচ্ছি" বলিয়া উঠিলেন; মা আজ আবার একটা কি খেলা খেলবেন—জানি না, বিরূ চল—আর বিলম্বে কাজ নাই। উভয়ে পীড়িতা পিসীমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সজ্ঞানে মৃত্যু।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন—দাক্ষায়ণীর অবস্থা শোচনীয় কিন্তু জ্ঞান এখন টন্‌টনে, নাড়ী দেখিলেন—এখন মণিবন্ধ ছাড়ে নাই। তবে তিনি ইহা অপেক্ষা হতজ্ঞান আর হইবেন না, এইরূপ সজ্ঞানেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। দাক্ষায়ণীর স্থায় পুণ্যশীলা ব্রাহ্মণীর অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা সম্ভব নহে, যাহার দ্বারা তিনি একেবারে হতচেতনা হইয়া পড়িবেন।

রামেশ্বব বলিলেন—পিসীমা, কি কষ্ট হইতেছে? দাক্ষায়ণী বলিলেন—বাবা! অন্য সময় হইলে কষ্ট হইত, এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। এখন তোমরা সকলে একত্র হ'য়ে পূর্ব্বের মত সংসার কচ্ছো দেখে—আমি খুব সুখী হ'য়েছি, তোমাদের দুই ভাইকে আলাদা দেখে মরলে আমার কষ্টের একশেষ হ'তো, আশীর্ব্বাদ করি এই রকম ক'রে সংসার উজ্জ্বল কর। তার পর বলিলেন—বাবা! আমার উপরের তাকে পুরাণো ভাড়ে সাড়ে সতেরো গণ্ডা টাকা আছে, এতদিন চরকা কেটে ঐ টাকা জমাইয়াছি, ঐতে ভব, বাসু ও হেমার এক একটী পদক গড়াইয়া দিও, ওরা সেইগুলি হাতে ধারণ ক'র্ব্বে, তাহ'লে সর্ব্বদাই ঠাকুরমার কথা মনে জেগে থাক্‌বে, আর ভুলবে না।

আজ চাঁদের হাট বসিয়াছে। দাক্ষায়ণী মৃত্যু-শয্যায়, আর তাঁহার চারিদিকে চাঁদের হাট—দুই ভাইপো, দুই ভাইপো-বউ, দুইটী নাতি ও একটী নাত্‌নী এবং নাৎ-জামাই। দাক্ষায়ণীর অবস্থা বুঝিয়া আজ দুই দিন হইল—সর্ব্বেশ্বর হেমলতাকে শ্বশুর বাটী হইতে আনাইয়াছেন। সঙ্গে জামাই জগদীশপ্রসাদও আসিয়াছেন। আর প্রতিবাসী সকলেই

আসিয়া উপস্থিত, কারণ দাক্ষায়ণী যে সকলেরই উপকারী ছিলেন—সামান্য বিপদাপদ হইলে যে তিনি আগে গিয়া বুক দিয়া পড়িতেন—এমন পরোপকারিণী গৃহিণী কি আর হইবে? তাঁহার মৃত্যু-সময়ে সকলে সমবেত হইয়া যে হায় হায় করিবে, সকলে তাঁহার মৃত্যুকালীন আশীর্ব্বাদ যে শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি?

প্রমোদাও দাক্ষায়ণীর পায়ের তলায় বসিয়া হাত বুলাইতেছেন; ভব, বাসু ও হেমলতা মাথার কাছে বসিয়া ঠাকুরমার মুখপানে চাহিয়া আছে, চক্ষুগুলি ডাগর ডাগর জলে ভরা, ঠাকুরমা অন্তিমসময়ে যদি কিছু অনুমতি করেন—যেন তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা আজীবন প্রাণ দিয়া যে তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন—এমন স্নেহময়ী ঠাকুরমা চিরজীবনের জন্য তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, এ দুঃখ কি তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারে, তাই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাদের চক্ষু জলভরাক্রান্ত।

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—পিসী-মা! তোমার প্রাণে যদি কোন আশা থাকে ত' বল, সাধ্যানুসারে তাহা পূরণ ক'র্‌বার চেষ্টা করি; আজন্ম ত' আমাদের সংসারে—খাটিয়া খাটিয়া দেহ জর্‌ জর ক'রেছ—তার প্রতি-শোধ দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে এখন কি করিতে হইবে—হুকুম কর।

দাক্ষায়ণী। বাবা! দাদার সংসারে আমার কোন অভাব ছিল না, তিনি আমাকে কখন কোন প্রকার কষ্ট দেন নাই—যখন যা বলেছি—যে আবদার ধরেছি, দাদা সকল কাজ ফেলে আমার সে আব্দার সহ্য ক'রেছেন; আমি অনাথা—পাছে মনে কোন দুঃখ করি; এই তার ভয় ছিল। বউও তেমনি ছিলেন—দশমী বা দ্বাদশীর দিন—আমি যা খাইতে ভাল ভালবাসিতাম—ঘরে না থাকিলেও বহু কষ্টে সংগ্রহ ক'রে

খাইয়েছেন। যার ব্রত আমার কিছু বাকী নাই; তবে আর হুকুম ক'র্ব্বো কি বাবা! এখন আর যেন ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে বাপপিতামোর ভিটে আঁধার ক'রো না—এই আমার শেষ অনুরোধ। আলাদা হ'য়ে থাক্‌বার কত কষ্ট তাতো বুঝেছ বাবা?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ পিসী-মা! সে কথা আর বল্‌তে হবে না—বুঝতে না পেরে যা ক'রেছি, তার তো আর উপায় নাই?

প্রমোদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আর এ বয়সে কি সে সখ আছে, যা হবার বুদ্ধিদোষে তা হ'য়েছে; তোমার কথা অমান্ত ক'রে যদি বাড়ী ছেড়ে না যেতাম, তা হ'লে আমাদের গহ্‌ড়া নেয় কে; ঠাকুর-পো যেমন ধর্ম্মের সংসার কল্লেন, তেমন যদি আমরা পারতুম—তা হ'লে আজ আমাদের বিষয়ের অবধি থাক্‌তো না; তোমার মত সতীলক্ষ্মীর কথা না শুনে আমাদের খুব শিক্ষা হ'য়েছে, পিসী-মা আর তা হবে না, নেড়া বেল্‌তলায় যায় কবার—যাতে সে রকম মতিভ্রম না হয়, তার জন্ত তুমি আশীর্ব্বাদ কর!

দাক্ষায়ণী। তাইতো কচ্ছি মা; তোমরা সকলে সোণার সংসার উজ্জল ক'রো; দুই ভাই ও দুটী বউ তোমরা হাড়াস্তি গোড়াস্তি হ'য়ে বেঁচে থাকো, ভব ও বাসুর আমার চুলের মত পরমায়ু হউক, হেমা আমার পাকা চুলে সিঁদুর পরুক। তারপর ক্ষীণ হস্তোত্তোলন করিয়া মা ভবানী! বাবা দামোদর! তোমরা আমার দাদার বংশের বাস্তু দেবতা —ইহাদের দেখো, বাড়বাড়ন্ত করো! এই বলিয়া দুই হাত তুলিয়া গৃহদেবতার চরণে প্রণাম করিলেন।

এইরূপ দুঃখে কষ্টে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল, রামেশ্বর প্রাতঃ-কালে আর একবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করি-লেন—পিসী-মা! গঙ্গাস্নান ক'র্‌বার ইচ্ছা হয় কি?

দাক্ষায়ণী। খুব ইচ্ছা হয় বাবা! তা পারবে কি?

সকলে সমস্বরে বলিল—এর আর বেশী কথা কি মা, তুমিত হুকুম ক'র্‌লেই হয়?

দাক্ষায়ণী। আচ্ছা, তবে নিয়ে চলো, আর দেরী ক'রো না?

রামেশ্বর বুঝিয়াছিলেন—দ্বিতীয় প্রহরের সময়ই পিসীমাতা ইহলোক ত্যাগ করিবেন—নাড়ী খারাপ হইয়া আসিয়াছে; আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সকলে সমবেত হইয়া আজ দেবানন্দের আদরের ভগ্নী, তাঁহার সংসারের আদর্শ কর্ত্রী; দেবীপুরের মহোপকারিণী, আজন্ম সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী দাক্ষায়ণীকে লইয়া পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীকূলে গমন করিলেন।

মৃত্যুর কবলে পড়িয়া বৃদ্ধার জ্ঞান তখনও সমভাবে রহিয়াছে, মৃত্যুর জন্য একটু ভীত, একটা আবেগ উৎকণ্ঠা বা একটা দীর্ঘনিশ্বাস পর্য্যন্ত পতিত হইল না, হাসিতে হাসিতে যেন কোথায় যাইতেছেন—আবার ফিরিয়া আসিবেন—ঠিক সেইভাবে প্রত্যেকের নিকট—মা নির্ম্মলা, মা প্রমোদা, তারপর পাড়ার বৌ-ঝি-গণের নিকট বিদায় লইলেন। সকলে এই অপরূপ মৃত্যু দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দেবি! আশীর্ব্বাদ করো—যেন আমরা তোমার মত এইরূপে মরণের কোলে ঝাপিয়া পড়িতে পারি। সকলে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" বলিয়া নাম গান করিতে করিতে সেই দেবীমূর্ত্তি মা গঙ্গার পবিত্র কোলে লইয়া চলিল। নির্ম্মলা, প্রমোদা হেমলতা ও পাড়ার স্ত্রীলোক সকল গগনভেদী চীৎকার করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিল। কিন্তু দাক্ষায়ণীর গৃহবহির্গমনের পর আর সে ভাব নাই—তিনি বক্ষস্থলে করসংলগ্ন করিয়া মুদ্রিতনেত্রে আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে

লাগিলেন। কাহারও মায়া কান্না আর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

দাক্ষায়ণী চিরকালের জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন—আশেপাশে চাঁদের হাট; দুইটী নাতী, দুইটী ভাইপো, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ, আরও কত লোক সঙ্গে চলিয়াছেন—অতিথিশালার অতিথিগণ তাহারাও যেন আজ মাতৃহীনের ন্যায় গঙ্গাযাত্রীর আশেপাশে চলিয়াছেন—দাক্ষায়ণী যে তাহাদের মায়ের চেয়েও বেশী, মা যা করিতে পারেন না, তিনি যে তাহাই করিয়াছেন। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জলদান করিয়াছেন, অসুখ হইলে প্রাণপণে সেবা করিয়াছেন। দেবানন্দের ঘরে এ বিধবা ব্রহ্মচারিণী যে সাক্ষাৎ দয়াময়ী অন্নপূর্ণা! ইঁহার বিয়োগে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী অতিথিগণেরও চক্ষু ঝরিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীতীরে সকলে উপনীত হইলেন; রামেশ্বর ভরা ভরা গলায় ডাকিলেন। আজ ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান সাধকেরও প্রাণ ক্ষণেকের জন্য শোক-সমাচ্ছন্ন হইল, বলিলেন—পিসীমা! মায়ের তীরে এসেছ—একবার মাকে দেখ, তাঁকে ডাক।

দাক্ষায়ণা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। সেই সময় গঙ্গায় জোয়ার আসিতেছে! মা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা এই বাল-বিধবা আজন্ম ব্রহ্মচারিণী কন্যার পবিত্র দেহ বুকে ধারণ করিয়া জুড়াইবার জন্য যেন তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—আয় মা! অনাথিনী; আজ তোর পরম পবিত্র দেহ বক্ষে করিয়া আমার শীতলতা বৃদ্ধি করি। তরঙ্গসঙ্কুল জলময়ী গঙ্গা আত্ম-হারা হইয়া যেন চটাচট্ শব্দে তট সন্নিধানে—আনন্দে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেশীক্ষণ বিলম্ব হইল না, ব্রহ্মচারিণী দুই একবার উচ্চৈঃস্বরে ইষ্টনাম উচ্চারণ করিয়া সেই যে চক্ষু মুদিলেন—আর চক্ষু খুলিলেন না, মুখে সেই হাসি, বদনে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃ মাখিয়া মা আমার চিরতরে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে একবার চিরবিদায়ের উচ্চরোল তুলিয়া কাঁদিলেন—তারপর শ্মশানে সেই পবিত্র দেহ বৈশ্বানরের উদরস্থ করিয়া পরকালসম্বল গগনভেদী হরিধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন! এতদিন পরে ধরাবক্ষ হইতে দাক্ষায়ণীর পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হইল।

তারপর আগ্যকৃত্য। দাক্ষায়ণী অনাথিনী, স্বামী-পুত্রবিহীনা বলিয়া যে তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য কম হইল, তাহা নহে। সাধক জ্ঞানানন্দের নামে এবং ভাগ্যবতী সতীর পুণ্যে কোথা হইতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল—তাহার স্থিরতা নাই; খুব সমারোহে দেবানন্দ উমাকালীর মত না হউক, তখনকার কালে খুব বড় ধরণে বৃদ্ধার আগ্যকৃত্য সমাহিত হইল। সকলে প্রাণ ভরিয়া এ শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ গ্রহণ করতঃ ভগবৎ-সমীপে দাক্ষায়ণীর পারত্রিক পরিত্রাণ কামনা করিলেন।

সকলেই একবাক্যে বলিল—যা গেল, এ দুরন্ত কলিকালে আর তেমনটী হইবে না। দাক্ষায়ণী অতুলনীয়া শক্তি-সামর্থ্য লইয়া দেবীপুর উজ্জ্বল করিতে, দেবীপুরবাসীর সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে অন্নপূর্ণা মহামায়ারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এ কালে ঠিক এমনটী যে আর হইবে না—তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য-সঙ্গে।

পিসীমার শ্রাদ্ধের পর আজ আবার জ্ঞানানন্দ বিরূপাক্ষের সহিত তাঁহার শান্তিময় পঞ্চবটীতে আসিয়া বসিয়াছেন! কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বিরূপাক্ষ বলিলেন,—গুরো! মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারা যায় না কি?

রামেশ্বর। জগতে আসিলে সকলকেই যাইতে হইবে—কেহই মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিবে না, দেবতাগণও নয়; কালে তাঁহারাও লয়প্রাপ্ত হইবেন। তবে ভগবানে চিত্ত স্থির করিয়া যোগনিরত হ'তে পার্‌লে আর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হয় না। পিসীমার মৃত্যু ত' দেখ্‌লে?

বিরূ। খুব চমৎকার মৃত্যু—আমি অমন কখন দেখিনি। আচ্ছা তিনি ত' স্ত্রীলোক—কখন যোগ-যাগ করেন নি—তবে অমন মৃত্যু কেমন ক'রে হলো?

রামেশ্বর। যোগ-যাগ করেন নি কি—তাঁর সমস্ত জীবনটাই ত' কর্ম্মযোগে কেটেছে, কি কর্ম্মটাই তিনি ক'রেছেন, শুধু কোশা ঠক্ ঠক্ আর মালা ঘোরালেই কি যোগ-যাগ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা হয়? ভগবানে রতিমতি রাখিয়া যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই ত' কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের, দ্বারা চিত্তশুদ্ধি—জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইলে ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিতে পারে না। যে পরকে আপনার প্রাণের চেয়েও বড় করে—পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহার কর্ম্মই ত' কর্ম্ম। পিসীমার তাহাতে কোন ত্রুটী ছিল কি?

বিরূ। কিছুমাত্র না। এখন বুঝতে পেরেছি—তিনি স্ত্রীলোক হ'লেও, সাধন-ভজনে, আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। তবে তাঁর কামনা ছিল—আপনাদের কিসে ভাল হবে।

রামেশ্বর। পরের জন্য কামনা—প্রকারান্তরে যে নিষ্কাম এ কথা ত' পূর্ব্বে বলেছি; আর কাজ আরম্ভ ক'র্ত্তে হ'লে কামনা করে আরম্ভ করাই ভাল, নতুবা সে কাজে মন তত দৃঢ় হয় না। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব একদিন হরিদাসকে ধর্ম্মপ্রচার ক'র্ত্তে পাঠিয়েছিলেন—হরিদাস নিষ্কাম-ধর্ম্ম সকলের কাছে প্রচার ক'র্ত্তে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কেহ কাণ দিল না। হরিদাস, আসিয়া প্রভুকে ঐ কথা জ্ঞাপন করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন—তুমি একবারে মাথায় বাড়ী মারিলে লোকে ত' বিরক্ত হবেই; তুমি সকামভাবে মৎস্য-মাংস খাইয়া, স্ত্রীর কোলে বসিয়া হরিনাম ক'র্ত্তে ব'লে এসো। হরিদাস বলিলেন—ওদের বেলা এমন কেন হবে? ঠাকুর বল্লেন—ওহে নামের গুণে সব ছেড়ে যাবে—তোমার ভয় কি? কিছুদিন পরে হরিদাস দেখিল—প্রভুর কথাই ঠিক—তাহারা এখন খুব ভক্ত হ'য়ে উঠেছে—আর হিংসা করে না।

বিরূ। তান্ত্রিক-সাধনাও এইজন্য সকামভাবে আরম্ভ ক'রতে হয় বুঝি?

রামেশ্বর। তন্ত্রের সাধনা সার্ব্বজনীন—কাহাকেও বাদ দেন নাই; কিন্তু মায়ের এমনি মহিমা যে শেষে তার কামনা কিছুই থাকে না। মদ্য-মাংস খেতে ত' ভুলে যায়ই—সে আপনাকেও ভুলে যায়—যদি যথার্থ সাধনা করে! আর যদি ভণ্ডামী করবার জন্য সাধনা করে, তা, হ'লে আর কি হবে? জেগে ঘুমুলে কি কেহ ঘুম ভাঙ্গাতে পারে? সিদ্ধির জন্য সাধনা ক'রলে, যে দিক্ দিয়েই যাও—মাতৃক্রোড়-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

বিরূ। আচ্ছা প্রভু! ত্যাগী কি ক'রে হ'তে পারা যায়?

রামেশ্বর। ভোগের দ্বারা ত্যাগ হয়, নতুবা কেবল ত্যাগ ত্যাগ ক'রে চেঁচালে ত্যাগ আসে না। ত্যাগ ক'র্ব্বো বলে ভোগ কর—কাজ হবে। টাকা-পয়সা উপার্জ্জন কর কিন্তু তাহাতে ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রো না, তা হ'লেই আসক্তি কমিবে। যে কাজই কর, মনে ক'র্বে "তাঁর" কাজ; টাক-কড়ি যাহা আছে, মনে ক'র্ব্বে "তাঁর", আমরা দু'চার দিনের জন্য আগ্‌লাইবার ভার পেয়েছি মাত্র।

বিরূ। অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জ্জন ক'রে, ধর্ম্ম ক'র্‌লে কি ফল হয় না?

রামেশ্বর। গুরুকে জুতো মেরে গরু দান করায় যেমন ফল— এতেও তেমনি। অসৎ উপায়ের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে, বাসনার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয়। সৎ উপায়ের টাকায় তত হয় না—সে আগুনে প্রাণে সান্ত্বনা-জল পড়ে নিভে যায়।

বিরূ। আচ্ছা ঠাকুর! সংসার ত্যাগ ক'রে সাধনা ভাল হয়, কি সংসারে থেকে ভাল হয়?

রামেশ্বর। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'লে তুমি যেখানেই থাক, সব সমান; মা আমার নাই কোথা? নতুবা কিছুতেই কিছু হয় না— কেবল ঘর ছেড়ে চলে গেলে কষ্ট সার হবে—কৃষ্ণ পাবে না। কেবল গেরুয়া পরে, চিম্‌টা ধরে, চুলে জটা করে, দেশে দেশে ভেসে বেড়াইলে লাভ কি? যদি যথার্থ ভাবের ভাবুক হ'য়ে থাক, তা হ'লে ভবের ভাবে মজে না থেকে, সেই ভাবীর ভাব-সাগরে ডুবে থাক্‌লে ত' সব গোল চুকে যায়। সে অবস্থায় জননী, পত্নী, বেটা-বেটী, ঘটী-বাটী, অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থেকেও ভাল ক'রে খাটতে পার্‌লে খাঁটি ফল পাওয়া যায়। জনক রাজা এইরূপ নির্লিপ্ত হ'য়ে রাজত্ব ক'রেও ত্যাগী হ'য়েছিলেন।

নতুবা তীর্থে তীর্থে ঘুরে, সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে, চিতাভস্ম পরে, নানা দেশ ঘুর্‌লে অবশেষে কাঁচকলা নিয়ে ফিরে আস্‌তে হয়। বাবা! কর্ত্তব্যজ্ঞানে মানুষের মত ধর্ম্মপালন করে, ডাকার মত মাকে ডেকে, ভাবার মত তাঁকে ভেবে—সংসার-ধর্ম্ম বজায় ক'র্‌তে পার্‌লেই পরমগতি লাভ হয়; সংসারও যে তাঁর! কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সৃষ্টিই যে এই সংসার থেকে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ এই সংসারে থেকেই যোগত্রয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন।

বিরূ। আচ্ছা প্রভু! অনেকে মেয়েমানুষের মত থেকে ভগবানকে ডাকে—সে কিরূপ?

রামেশ্বর। সে গোপীভাবে সাধনা। জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, তা ছাড়া আর পুরুষ নাই—সকলেই স্ত্রী, এইজন্য সাধক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া জগৎস্বামীকে স্বামী বলিয়া সেবা করে—তাঁহার সহিত সতত বিহার করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাহারা আর কাহাকেও দেখে না; সাধক তখন "কৃষ্ণময়" জগৎ দেখে—তাহার সহিত রতিক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া প্রতি লোমকূপে রমণ-সুখানুভব করে। সে অতি উচ্চ অঙ্গের সাধনা।

বিরূ। সাধনায় যত অগ্রসর হওয়া যায়, তত যেন সবই একপ্রকার, গোড়াতেই যত গন্দ—নয় ঠাকুর?

রামেশ্বর। তা নয় ত' কি? সাধনা-বীজ পাকা হইলে, একটু উপরে উঠিলে তখন সকলকেই সমান দেখা যায়—ভেদাভেদ থাকে না। আর ভেদাভেদ কেন যে করে—তার ত' কিছু বুঝা যায় না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাধন-যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর যখন শ্রীহরি, তাঁহার তুষ্টি না হ'লে যখন জগৎ তুষ্ট হয় না—আর আমার মা যজ্ঞেশ্বরী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা না হ'লে যখন যজ্ঞই সমাধা হয় না, তখন এত ভেদাভেদ কিসের? ইহা উন্নতির অতিশয় অন্তরায় জানিবে।

বিরু। ঠাকুর! কর্ম্ম না ক'র্‌লে কি চলে না?

রামেশ্বর। কর্ম্ম তোমাকে ক'র্ত্তেই হবে—কর্ম্মই যোগ। তুমি না করিলেও প্রকৃতি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করাইবে। যাহা কিছু করিবে—তাহাই কর্ম্ম, সে সকামই হউক, আর নিষ্কামই হউক, তবে বর্ণাশ্রমের ভিতর দিয়া কর্ম্ম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে যত উঁচুতে উঠবে, ততই কর্ম্ম নিষ্কাম হ'য়ে যাবে—এ কথা তোমায় পূর্ব্বে বলেছি। কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে জ্ঞান হয়। জ্ঞান মানে ঈশ্বর-সত্ত্বায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস—তিনি আছেন তবে আর ভয় কি—এই যে বিশ্বাস, ইহাই যথার্থ জ্ঞানযোগের কথা "তিনি আছেন"—চিত্তে এইরূপ বিশ্বাস স্থির হইলে, ভক্তি আপনি আসিবে; ভক্তিভাবে ধ্যান করিতে করিতে যখন তন্ময় হইবে, তখন ধ্যেয় বস্তু ও তুমি আলাহিদা থাকিবে না, চিত্ত তাহাতে একেবারে ডুবে যাবে। স্থূল-কথা—লীন হবে; এই অবস্থাকে সমাধি বলে। সাধক যে বহুপ্রকারে সমাধিস্থ হ'তে পারে—তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। ভক্তিযোগে সিদ্ধি-লাভ করিলে সাধকের আর ভাবনা থাকে না, বলিরাজের মত ভগবান্ তখন তার দ্বারের দ্বারী হ'য়ে অষ্টপ্রহর বাঁধা থাকেন।

বিরু। প্রভু! আপনি যে চণ্ডীপাঠ করেন—উহা ত' কেবল দেবাসুরের যুদ্ধ— না আর কিছু?

রামেশ্বর। গীতা যেমন নিষ্কাম সাধনার চূড়ান্ত—চণ্ডী তেমনি সকাম সাধনার চূড়ান্ত। উহা শক্তির আধার; পাঠে যে অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহা ত' তুমি দেখেছো?

বিরু। হাঁ ঠাকুর! তা দেখেছি, যা হবার নয়—তাই হ'য়েছে। দেবাসুরের যুদ্ধটা তবে কি?

রামেশ্বর। দেবতা ও অসুরে যুদ্ধ, যখন দেবতাগণ অসুরসহ যুদ্ধে অপারক হলেন, যখন শক্তিহীন হ'য়ে পড়লেন, তখনই শক্তির সাহায্য

গ্রহণ ক'র্ত্তে হলো, শক্তি ভিন্ন উপায় কি বাবা! আর এ যুদ্ধ ত' আমরা প্রত্যহ কচ্ছি। সৎ-প্রবৃত্তিকে নষ্ট করবার জন্ম অসৎ-প্রবৃত্তিরূপ অসুর ত' প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে, তুমি এ সংগ্রামে জয়লাভের জন্ম মায়ের শরণাপন্ন না হ'লে আর উপায় কি? কলিতে অসৎ-প্রবৃত্তি প্রবল বৃক্ষরূপে দেহ-অঙ্গনে সর্ব্বদা বেড়ে উঠেছে, তোমার সৎপ্রবৃত্তিরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি তার আওতায় জর জর—মর মর, এখন শক্তির সাহায্যে ঐ বড় বড় বৃক্ষগুলির সমূলে উৎপাটন না ক'র্‌লে যে ছোট ছোট চারাগুলি নষ্ট হয়, শক্তি প্রয়োগ কর; তপঃশক্তিরূপ কুঠারে তাহা ছেদন কর, তবে ত' বাঁচিবে, নতুবা জীবনের আশা কোথায়? এই জন্মই শক্তির শরণাপন্ন হওয়া।

বিরু। শরণাগত হ'লে আর কোন ভয় থাকে না, এটা ঠিক?

রামেশ্বর। ঠিক বলে ঠিক, শরণাগত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। মা আমার আশ্রিত প্রতিপালিকা, শরণাগতের রক্ষাকর্ত্রী, একবার "শরণাগত-দীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে. সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে" বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি—বেটী কেমন না রেখে থাক্‌তে পারে! যতক্ষণ আমিত্ব থাক্‌বে—ততক্ষণ কিছু ক'র্ত্তে পারবে না—দ্রৌপদী যতক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়া বস্ত্র টানিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি দেখা দেন নাই। যখন ক্ষমতায় কুলাইল না, অক্ষম হ'য়ে একেবারে শরণাগত হ'য়ে পড়লেন, তখনই ভগবান্ বস্ত্ররূপ ধরে তাঁর মান রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনও যখন অকুলসমুদ্রে ভাসিয়া কুল হারাইয়াছিলেন, তখনই বলিয়াছিলেন—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।" অতএব অমন ডাবড় ডাবড় সাধক যখন শরণাগত না হ'য়ে পারেন নি, তখন তুমি আমি কতটুকু?

বিরু। তবে উপদেশ করুন, কি উপায় অবলম্বন ক'রে সাধনা ক'র্ব্বো!

রামেশ্বর। আর কি উপদেশ ক'র্ব্বো, ভগবতী পার্ব্বতী দেবী-তন্ত্রে যা বলেছেন। তাই বল্‌ছি - শুন, তিনি বলেছেন—মহাদেব আগমকর্ত্তা, বিষ্ণু বেদ-কর্ত্তা। প্রথমে মহাদেব আগম-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন, পরে বেদ-কর্ত্তৃত্বে বিষ্ণু বিনিযুক্ত হন। আগম ও বেদ—এই দুইটী আমার প্রধান বাহু। ভূর্ভুবাদি লোকত্রয় ইহাতে বাঁধা রহিয়াছে। ইহার দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের মত তন্ত্রও অপৌরুষেয়! আগম—তন্ত্র, নিগম—বেদ, "কলাবাগসন্মতা" কলিকালে আগম-সম্মত উপাসনাই আশুফলপ্রদ, কারণ কলির দুর্ব্বল জীবের সুগম সাধন-বিধানই ইহাতে বিধিবদ্ধ হ'য়েছে। সুতরাং তন্ত্রই কলির বেদ—কল্পতরু। কত শত বড় বড সাধক এই কল্পতরুমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করতঃ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বৎস! কলির জীবের জীবন অতি অল্প, যদি সে পূর্ণ পরমায়ুই পায়, তাহা হইলে ১২০ বৎসর বই ত' নয়? তপস্যার দ্বারা বৈদিক-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা, এই সামান্য দিনের মধ্যে হয় না। এই জন্য তন্ত্রের সহজ পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়। এক ধ্যেয় বস্তুকে পাইবার জন্যই ধ্যান-ধারণা, সমাধি-সাধনা। এদিক সেদিক বিচার-বিতর্ক ক'র্ত্তে যদি সময় চলে গেলো ত' সাধনা হবে কবে? অতএব আর সময় নষ্ট করো না। "মা শব্দ মমতাযুক্ত" এইজন্য মায়ের নাম সার ভেবে, একেবারে প্রাণপণ ক'রে লেগে পড়, সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় অবশ্যই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বে!

বিরূ। তবে কি সংসারী হ'লে চলবে না প্রভু?

রামেশ্বর। সে কি কথা? কি শুনলে তবে; সংসারী সন্ন্যাসী বলে কিছু নাই; আস্তে আস্তে বর্ণাশ্রমের ভিতর দিয়ে যাওয়াই ভাল—তাতে পতনের ভাবনা নাই।

বিরূপাক্ষ বিবাহ করিবে না, সংসারী হইবে না, বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুরুদেবের উপদেশে আর তিনি অমত করিতে

পারিলেন না। বর্ণাশ্রমের ভিতর দিয়া সাধনা করিবে বলিয়াই শির নত করিয়া স্বীকার করিলেন। বিরূপাক্ষ বশে আসিয়াছে, একগুঁয়ে যুবক গোঁ ছাড়িয়াছে, দেখিয়া রামেশ্বর মাতৃপদে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে আগমন করিলেন এবং বিরূপাক্ষকে সংসারী করিবার জন্য দাদার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিণয়োৎসব।

রামেশ্বর বিরূপাক্ষকে পুত্রভাবেই আজীবন প্রতিপালন করিয়াছেন। নির্ম্মলাও তাহাকে বড় ছেলে ও বাসুদেবকে ছোট ছেলে বলিয়া মনে করেন, দুইটীর মধ্যে পার্থক্য কিছু দেখেন না। যখন যাহা ক্রয় করেন, সমানভাবে দুইজনের জন্যই করেন। পরকে আপনার অপেক্ষাও বেশী ভাবিতে রামেশ্বর ও নির্ম্মলা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিরূপাক্ষ ও সেইরূপ পিতামাতার মত ভক্তি প্রীতি তাঁহাদের চরণে ঢালিয়া দিয়া এক হইয়া গিয়াছেন, আন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহারে কে বলিবে যে বিরূ পরের ছেলে—তাহাদের নয়?

বিরূ বড় হইয়াছে, বিবাহ না দিয়া আর রাখা যায় না, তার যেরূপ ভাবভক্তি, তাতে এ বিষয় আর বেশী দিন অবহেলা করিলে, বোধ হয় আর তাহাকে বিবাহ করাইতে পারা যাইবে না। যদিও সে ভাল ছেলে —সোণার টুক্‌রা, তথাপি কি জানি যদি পা ফস্‌কাইয়া যায়, যৌবন যে বড় বিষম কাল? আমি ত' ঐ ভাবেই গিয়াছিলাম কিন্তু অবধূত আমাকেও নিষেধ করিয়াছিলেন—বলেছিলেম—দাম্পত্য-প্রণয় স্বর্গীয় প্রণয়ের সোপান-স্বরূপ, দাম্পত্য-প্রণয় জানা বিশেষভাবে আবশ্যক। এই যে আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ, এই যে এখন প্রতি লোমকূপে ভগবৎ-সম্ভোগ সুখ, দাম্পত্য-প্রণয়ের সুখ না জানিলে কি ভাল বুঝিতে পারা যাইত? ছোটর জ্ঞান যাহার নাই, বড়র জ্ঞান তাহার কেমন করিয়া হইবে?

বিরূপাক্ষ যখন সেদিন কোন কথা কয় নাই—তখন বিবাহ-বিষয়ে

আর বিলম্ব করা উচিত নয়। নির্ম্মলাও সেজন্য বড়ই উত্যক্ত করিতেছে। রামেশ্বর দাদার কাছে বিরুর বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—ভাই! বিরুর মত ছেলের আর বিবাহের ভাবনা কি? ছোট বউমা নাকি বড় উতলা হ'য়েছেন—বড়বউয়ের কাছে সেদিন শুন্‌ছিলাম।

রামেশ্বর। হাঁ দাদা! এতদিন সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। এখন বহুকষ্টে রাজী করেছি। আপনি একটু সত্বর দেখুন।

রামেশ্বর বড়দাদা ও বড়বৌকে চিরকালই কর্ত্তা বলিয়া মানেন—তাঁহারা নিজদোষেই কয়েক বৎসর এ কর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এখন রামেশ্বর শুধু গ্রামে কেন, দেশ বিদেশে—কি পাণ্ডিত্যে, কি ধর্ম্ম-কর্ম্মে সকল বিষয়েই বড় হইয়াছেন; কত বড় বড় লোক তাঁহার সাধকত্বের বিশেষত্ব দেখিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি রামেশ্বর সেই রামেশ্বর! ধন মানের অভাব নাই—তথাপি অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই—যেমন মাটীর মানুষ—তেমনি, পূর্ব্বে যেমন ছিলেন—এখনও সেইরূপ।

বিরূপাক্ষের বিবাহের ভাবনা হইল না—অজ্ঞাতকুলশীল হইলেও, রামেশ্বর যখন তাহার পালক পিতা ও নির্ম্মলার ন্যায় সতী যখন তাহার মাতা, আর সে যখন গুণবান্ ও রূপবান্, তখন কন্যা সম্প্রদান করিতে কে অমত করিবে? সর্ব্বেশ্বর দুই একদিন চেষ্টা করিতে না করিতেই পাড়ার একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি উপযাচক হইয়া বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল। উভয়পক্ষে দেখা-শুনা ঠিক হইয়া গেল।

এখনকার মত তখন কন্যাদায়ে কন্যার পিতাকে বিবাহের হাড়কাটে ফেলিয়া চোপাইবার নিয়ম ছিল না; যৎসামান্য কৌলীন্য মর্য্যাদা দিলেই বিবাহ হইত। তবে যাহার আছে, সে ক্ষমতামত স্বইচ্ছায় বরকন্যাকে দান

করিত; যাহার নাই সে কোথায় পাইবে; তবে কি তাহার কন্যার তখন সমাজে এরূপ পণ-প্রথার কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না; ক্ষমতাবান্ হইলে ফাঁকি দিবার চেষ্টাও করিত না। কারণ ইহা একটী মহোৎসব - মানব-জীবনের প্রধান কার্য্য; টাকা থাকিলে আমোদ-আহ্লাদের ক্রটী করিবে কে?

বিরুর সহিত যাঁহার কন্যার সম্বন্ধ ঠিক হইল—তিনি বড়লোক না হইলেও নিতান্ত দরিদ্র নহেন; অবস্থানুসারে তিনি কন্যা-জামাতাকে তখনকার প্রচলিত অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন; ভদ্রলোকের এক কথা; সর্ব্বেশ্বর ও রামেশ্বর জাত-কাট দেখিয়া লইলেন, দেনা-পাওনার কোন কথা কহিলেন না, বিবাহ সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গেল। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা বিরুর বিবাহে সাধ্যানুসারে খরচ-পত্র করিয়া নববধূ গৃহে আনিলেন। নির্ম্মলা শাশুড়ীর আসন গ্রহণ করিয়া বধূর শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইলেন, ইঁহার হাতে বিরূপাক্ষের পত্নী উত্তর-কালে কিরূপ গৃহিণী হইবেন—পাঠক তাহা চিন্তা করুন। যাঁহার গুণে দেবানন্দের ভাঙ্গা বাগান জোড়া লাগিয়াছে, অশান্তি-আগারে শান্তির সুবাতাস নূতন ভাবে বহিয়া তাহাকে ধর্ম্মের সংসারে পরিণত করিয়াছে; যাহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে দেবীপুরবাসীর মুখে লাল পড়ে; সেই পাকা-হাতে গড়া হইলে সে গৃহিণীর গৃহিণীপনায় গৃহ কেমন উজ্জ্বল হইবে—তাহা কি আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে? কন্যাটী এই পবিত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া অতি পবিত্রভাবেই শিক্ষিতা হইতে লাগিল।

বাংলাদেশে যত ছেলেবেলায় বিবাহ হয়—ততই ভাল, ইহা আমাদের শাস্ত্রের আদেশ। তাই তখনকার লোক এত ধেড়ে মেয়ে বা ছেলে এত ধেড়ে-কেষ্ট করিয়া বিবাহ দিতেন না। ছোট একটী মেয়ের মত বধূ শ্বশুর-শাশুড়ী কোলে-পীঠে করিয়া মানুষ করিবেন, আপনার মত

করিয়া—পোষ মানাইয়া গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পাকা গৃহিণী করিবেন—এইজন্য তখন বাল্যবিবাহ এত আদরের ছিল। আপনার মত করিয়া লইতে হইলে ছোটই ভাল; ধেড়ে শালুকী কি পোষ মানে?

ভবানীও বড় হইয়াছে, প্রমোদার বড় ইচ্ছা, যে তিনিও এইবার ভবানীর বিবাহ দিয়া একটী ঐরকম ছোট বউ ঘরে আনেন, কোলে-কাঁকে করিয়া মানুষ করেন। তিনি দেবরকে ধরিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো! তুমি এইবার ভবানীর বিয়ের জন্য একটু চেষ্টা কর। বউ কোলে করবার আমার বড় সাধ হ'য়েছে।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—ভবোর বিয়ের জন্য আর ভাবনা কি বউদিদি; অমন সোণারচাঁদ ছেলের বিয়ে; যেদিন মুখ খুলবো—সেই দিনই ঠিক ক'র্ব্বো! চঞ্চলাও ঠাকুরাণীর কথায় সায় দিয়া বলিল—ছোটবাবু! আপনি একটু ভাল ক'রে লাগুন, মার বড় সাধ হ'য়েছে!

ভবানীর বিয়ের আবার লাগালাগি কি চঞ্চলা! কত লোক সাধছে—আমি গা করিনি তাই। দাদাকে না বল্লে ত' হবে না; তাঁর আবার মেজাজ বুঝে বল্‌তে হবে ত'—এই জন্য দেরি ক'চ্ছি।

প্রমোদা বলিলেন—ঠাকুরপো! তোমার কথা তিনি ঠেল্‌তে পারবেন না, আমরা বল্লে ধম্‌কে উঠেন, তুমি একবার বলো!

"বউদিদি! এত ইচ্ছে হয়েছে—আচ্ছা, আজই দাদাকে বল্‌বো" ব'লে তিনি সকালবেলা গঙ্গাস্নানে গেলেন।

আজ কয়েক দিন হইল, চঞ্চলা প্রমোদাকে ভবানীর বিয়ের জন্য খুব উত্যক্ত করিতেছে। এ বিয়েতে ত' বেশী পাওনা হ'লো না; ভবানীর বিয়েতে কোন্ না—একখানা গরদ ও একছড়া হার বক্‌সিস্ হবে?

চঞ্চলা গোড়া থেকেই প্রমোদার দাসীত্ব করিতেছে—পূর্ব্বে অনেক পয়সা লুটিয়াছে। মাঝে সময় খারাপ হওয়ায় কিছু উপরী পাওনা

হয় না বলিয়া—চঞ্চলা চঞ্চলচিত্তে এদিক ওদিক করিয়াছিল, তাঁহাদের ছাড়িয়া দুই এক বাড়ী নূতন ভাবে কাজে লাগিয়াছিল কিন্তু এমন সুখটী আর কোথায় হইবে—এমন খাওয়া-দাওয়া ক'র্ত্তে, এমন গিন্নীপনা ক'র্ত্তে আর কোথায় পাইবে? সব জায়গায় যে ঝিকে ঝিয়ের মত থাকৃতে হয়। কাজেই সে দাসীত্ব তার চৌদ্দপুরুষে ক'র্ত্তে পারবে না ভাবিয়া চঞ্চলা আবার অচঞ্চলা হইয়া পুরাণো মনিব-ঘর পাকৃড়াইয়াছে। এখন সে নির্ম্মলাকে সাক্ষাৎ যমের মত দেখে, নির্ম্মলা ডাকিলে সে "হাঁ খুড়ীমা যাই" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যায়। গর্ব্বের নিকট সকলকেই নত হইতে হয়—নতুবা পরিত্রাণ কই।

রামেশ্বর আহারাদির পর দাদার দপ্তরখানায় গমন করিলেন। সর্ব্বেশ্বর তখন ভড়িংকে লইয়া দোকানের হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন, অতিথিশালার জন্ম কত চাল ডাল এবং গৃহের জন্মই বা কত আসিয়াছে—তাহার একটা মীমাংসা করিতেছিলেন। এমন সময় রামেশ্বরকে দেখিয়া বলিলেন—ভাই! এখন যে, কিছু দরকার আছে কি?

রামেশ্বর। না, দরকার এমন কিছু নাই—এখন কি বেশী কিছু কাজ আছে?

সর্ব্বেশ্বর। না, তবে মুদীর হিসেবটা দেখ্‌ছি—এবার কিছু বেশী খরচ হ'য়েছে বলছে?

রামেশ্বর। তা দেখ, তবে বল্‌ছিলুম কি, ভবর বিয়ের জন্ম একটী লোক বড় ধরেছে—তাকে কি বলা যায়—এইজন্ম তোমার মত নিতে এসেছিলাম।

সর্ব্বেশ্বর। ভাই! সেজন্ম আর আমাকে এত বলা কেন, যদি ভাল হয়—বুঝ ত' তাই ক'র্ব্বে, তোমার কথায় আমি আর কি বল্‌বো!

রামেশ্বর। তা বটে; তবে বৌ পছন্দ ক'র্ব্বে না—মেয়েটী একবার দেখবে না?

সর্ব্বেশ্বর। আমার চেয়ে তোমার পছন্দ কি কম, আর সে কেবল আমার বউ হবে—তোমার কি নয়?

রামেশ্বর দাদার অনুমতি ভিন্ন ত' কোন কাজ করেন না—যখন অনুমতি পাইলেন—তখন আর ভাবনা কি? প্রমোদার নিকট গিয়া বলিলেন—বউদিদি! ভবর তবে বিয়ের উদ্যোগ কর, আগামী ১৫ই বিবাহ হইবে? কাল পাকা দেখা! প্রমোদা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। নির্ম্মলা কপাটের আড়াল থেকে বল্‌লেন—মেয়েটী মনের মত না হ'লে বিয়ে দেবো না?

প্রমোদা বলিলেন—ঠাকুর-পো! শুনছো, ছোট বউ কি বলে,—বল্‌ছে—মেয়েটী মনের মত না হ'লে ছেলের বিয়ে দেবে না।

রামেশ্বর। তবে চঞ্চলাকে পাঠিয়ে একবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাও, না হয় নিজেরা যাও।

প্রমোদা। এ আবার কি, এখন এ রকম হ'চ্ছে নাকি?

রামেশ্বর। কত শত; বর নিজে দেখ্‌তে আস্‌ছে—তা, শাশুড়ী ত' কোন্ ছার!

প্রমোদা। না ভাই; ও মতিগতিতে আর কাজ নাই, তোমার বউ তুমি দেখলেই হ'লো!

রামেশ্বর বহুকষ্টে শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর, ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়া—এখন কিরূপভাবে সংসার করিতেছেন—পাঠক, একবার দেখিতেছেন কি? তবে নির্লিপ্ত ভাবে—কোন প্রকার বাঁধাধরার ভিতর নয়। সন্ধ্যাকালে সিদ্ধাসনে যাইয়া সমস্ত রাত্রি কাটানোর বিষয়ে একদিনও ত্রুটী হয় না—দিবাভাগে ঘরের কাজ, পরের কাজেই

ব্যস্ত থাকেন। মায়ের সংসারে তিনি নিয়োজিত দাস—এইভাবে সংসার করায় তিনি দোষ বলিয়া মনে করেন না; কর্ত্তব্যকর্ম্মই ত' ধর্ম্ম—কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল শেষ করিয়া সিদ্ধাসনে স্থিরভাবে বসিতে পারিবেন বলিয়া এ সকল কার্য্য তিনি এত সত্বর সমাধা করিতেছেন।

রামেশ্বরের বাল্যবন্ধুর একটী সুন্দরী সুশীলা কন্যা আছে, বহুদিন হইতে তিনি রামেশ্বরের ন্যায় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যের সহিত বন্ধুত্ব অটুট রাখিবার জন্য একটী সম্বন্ধ পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। মেয়েটী একটু বড়—বাসুদেবের উপযুক্ত নয়, কাজেই ভবানীর সহিত বিবাহ দিতে পারিলেও তাহার আশার অর্দ্ধেক ফল হয়; তাঁহাকে বেহাই সম্বোধনে পরম আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধিয়া পরম কৃতার্থ হন—এই আশা!

বন্ধুটী বেশ সঙ্গতিপন্ন; ঘর ভাল—মেয়েটীও মনের মত; কাজেই রামেশ্বর, কথা এড়াইতে পারিলেন না; দাদা ও বৌদির মত লইয়া তথায় বাক্‌দান করিলেন। কন্যা দেখাশুনা হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। প্রমোদা যাহা খুঁজিয়াছিলেন—ঠিক সেই রকম চাঁদপানা, গুণবতী বধূ পাইয়া সুখী হইলেন।

রামেশ্বর এখন আর কোন কাজ করিতে পারেন না, তাই বিরু সমস্ত যজমানের ভার লইয়াছেন। ভবানী বিরুদাদার কাছে থাকিয়া বেশ সংস্কৃত শিখিয়া এখন চতুষ্পাঠী চালাইতেছেন; বিরূপাক্ষ অবসর সময়ে কি হইল, কি না হইল ইত্যাদি দেখাশুনা করেন। এ কাজ ছাড়া ভবানী কলিকাতার একটী স্কুলে মাষ্টারী করেন, ইংরাজীতে তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পুরাতন ভট্টাচার্য্য-সংসার এখন বেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াছে। রামেশ্বর কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিলেও প্রণামী-স্বরূপ মাসিক প্রায় দুই শত টাকা শিষ্যগণের নিকট পাইয়া থাকেন—ইহা তাঁহার বাঁধা আয়; অতিথিশালার জন্য শিষ্যগণ ইহা প্রদান করে।

ইচ্ছা ত' সকলেরই আছে। নির্ম্মলাও ছাড়িবেন কেন, যত শীঘ্র হয়—সংসারের সকাম কার্য্য সকল মিটাইয়া পরকালের জন্ম স্বামী সহিত মিলিত হইবেন। কাজেই বাসুদেবের বিবাহ দিতে তাঁহা ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারিল না, ছুইটী বউ ঘরে আসিল—অ: একটী আসিলেই তাঁহার সংসার-বাঁধন একটু শিথিল হয়—তাহা ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া তিনি স্বামীর সহিত পরকালের কাজে লিপ্ত হইতে পারেন—নতুবা এ যে দু-নায়ে পা রহিয়াছে। বয়স হইতেছে—আর কতদিন মনটাকে এমন দু ভাগে বিভাগ করিয়া রাখিবেন!

ভাব দেখিয়া একদিন রামেশ্বর বলিলেন—কি গো! তোমারও ছেলের বিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? রামেশ্বর হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তা আর কার না হয়, ছেলে ত' বিয়ের উপযুক্ত হ'য়েছে" বলিয়া নির্ম্মলা ঈষৎ হাসিয়া পূজাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

রামেশ্বর। বউদিদি! দাদাকে তবে বাসুর বিয়ের যোগাড় ক'র্ত্তে বলো; আমি আর রোজ রোজ এক কাজ নিয়ে ঘুর্ত্তে পারি না।

প্রমোদা। এতে আর দুই জনে চটাচটী কল্লে কি হবে ভাই! সকলের সাধ হয়, আর ওর সাধ হয় না; আচ্ছা, আজ তোমার দাদা আসুন। আমি আজই তাঁকে মেয়ের সন্ধান ক'র্ত্তে বল্‌বো!

রামেশ্বর পূজায় বসিয়াছেন; নির্ম্মলা আরতির উদ্যোগ করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর পৌষের তত্ত্ব-সামগ্রী কিনিবার জন্ম কলিকাতায় যাইবেন—তাই তিনি ও তড়িৎ সকালে আহারে বসিয়াছেন। গোবর্দ্ধনও সঙ্গে যাইবে বলিয়া সত্বর পাট-ঝাঁট সারিয়া লইতেছে। ভুবনেশ্বরী তাহাদিগকে আহার্য্য দিয়া দাঁড়াইয়া প্রমোদাকে ইঙ্গিত করিলেন—এই সময় বল!

প্রমোদা বাড়ীর বড় বউ, তাঁহার ততটা লজ্জা নাই; তিনি একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—আজ যে তোমার মা-লক্ষ্মী বড় রেগেছেন।

সর্ব্বেশ্বর নির্ম্মলাকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আহারের গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া সাগ্রহে বলিলেন—কেন, কেন! রাম কি কিছু বলেছে নাকি?

প্রমোদা। সে রকম কিছু না তবে ছোটবউ বলে—সকলের সাধ যায়, আর আমার যায় না; আমার বাসুর বিয়ে দিয়ে একটী বউ ঘরে আন না। ঠাকুরপো তাতে রেগে বল্লেন—আমি রোজ রোজ ঐ কাজ কর্ত্তে পারবো না—দাদাকে বলো। এই জন্য তার একটু মনঃকষ্ট হয়েছে।

প্রমোদা স্বামীকে এই কথা বলিতেছেন—এমন সময়ে নির্ম্মলা ঠাকুর ঘরে ধূনা দিবার জন্য খুঁটে পুড়াইতে আসিলেন। সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা! এর জন্য আর ভাবনা কি? আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি—আজই বাসুর বিয়ের সম্বন্ধ করে আস্‌বো, আর এই মাঘ মাসেই তার বিয়ে দিবো।

বিরূপাক্ষ আজ যজমান বাড়ী পূজায় গিয়াছে, ভবানীও কলিকাতায় গিয়াছে, এখনও কাল্‌কের পড়া শেষ ক'র্ত্তে পারে নাই বলিয়া বাসু চতুষ্পাঠীতেই পাঠাভ্যাস করিতেছে, কাজেই রামেশ্বর স্নান করিয়া পূজায় বসিয়াছেন, আর সেইজন্যই আজ পূজার এত বিলম্ব, রামেশ্বরের ত' আর শুধু মন্ত্র পড়িয়া পূজা নয়, এ যে মনে প্রাণে পূজা, আবেদন নিবেদন যে অনেক, ছেলের প্রাণের কথা পিতামাতার নিকট ব্যক্ত করিতে যে অনেক সময় লাগে, মা না শুনিলে যে সে ছাড়ে না, তাই আজ গৃহদেবতার প্রফুল্ল মুখের প্রতি পুত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। নির্ম্মলা সব ভুলিয়া

তাই দেখিতেছেন, ছেলের বিবাহের কথা তখন তাঁহার মনে নাই। ছল-ছলনেত্রে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন—"মা! আর কতদিন এমন ক'রে রাখ্‌বি," বলিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীর সমাধি ভঙ্গ হইলে আরতির দ্রব্য সকল একে একে নিকটে দিলেন, তাতেও কি ঠিক হয়—সব ভুল হইতেছে, পঞ্চপ্রদীপ তুলিতে শঙ্খ তুলিতে-ছেন, বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ফুল দিয়া আরতি করিতেছেন - এখানে কেবল নির্ম্মলা ছিলেন, তাই স্বামীর তন্ময়তা দেখিয়া তিনি ভক্তি-বিগলিতা হইলেন, অন্য কেহ থাকিলে—রামেশ্বরের পূজার প্রণালী দেখিয়া হাসিয়া কুটোকুটী হইত।

আহারাদির পর সর্ব্বেশ্বর কলিকাতায় গমন করিলেন। তাঁর পরিচিত বন্ধুর একটী কন্যা আছে, তাহার সন্ধান অগ্রে লইয়া তবে তত্ত্বের দ্রব্যাদি খরিদ করিবেন। তড়িৎ ও গোবর্দ্ধন সঙ্গে গেল।

আরও এক ঘণ্টা পরে রামেশ্বর পূজাদি শেষ করিয়া জলযোগ করিলেন। ছাত্র ও অতিথিগণকে আহার করাইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ যজমান-বাটীর কার্য্য শেষ করিয়া ঘরে আসিলেন। রামেশ্বর, বিরূ ও বাসুর সহিত আহার করিলেন। তাঁহারা আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলে—স্ত্রীলোকদের ভোজন হইল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। বর্দ্ধিষ্ঠ গৃহের মালক্ষ্মীগণ তখন এইরূপ সময়েই আপনাদের আহারাদি সমাপন করিতেন। এখনকার মত কর্ত্তাদের সহিত কুঠার ভাতে উদর পূরণ করিয়া নাটক নভেল লইয়া বিছানায় আশ্রয় লইতেন না।

কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বেশ্বর প্রথমে বন্ধুর বাটী আসিয়া কন্যাটীকে দেখিলেন, তড়িৎ ও গোবর্দ্ধনকে দেখাইলেন। সকলেই বলিল—দিব্বি মেয়ে, বাসু যেমন ছেলে, মেয়েটীও ঠিক সেইরূপ উপযুক্ত হবে। সর্ব্বেশ্বর

তখন বিবাহের কথা পাড়িলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ রামেশ্বরের পুত্র শুনিয়া কন্যার পিতা হাতে স্বর্গ পাইলেন, মনে মনে বলিলেন—এমন ভাগ্য কি হবে ভাই! যে তিনি অনুগ্রহ করে আমার মেয়েটী বউ করবেন?

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—আমি যাহা বলিব—তাহাই হইবে, আমার কথার অমত সে কখনও করিবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, দুই চারিদিনের মধ্যে আমি পাকা দেখা দেখিতে আসিব—বলিয়া সর্ব্বেশ্বর কলিকাতার বাজার হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে গেলেন এবং যথাসময়ে বাড়ী গিয়া ছোট বউমাকে পাত্রী স্থির হইয়াছে বলিলেন। গোবর্দ্ধনও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিল—ছোট-মা! মেয়েটী যেন পরী, আর বেশী বড়ও নয়, বাসুকে বেশ সাজ্‌বে। তারপর সর্ব্বেশ্বর ভ্রাতার সহিত বাসুদেবের বিবাহের পরামর্শ করিলেন। রামেশ্বর বলিলেন—দাদা বাটীর সকলের যদি মত হ'য়ে থাকে এবং মেয়েটী দেখে যদি পছন্দ করে থাক, তা' হ'লে করো, আমার তাতে অমত নাই। তবে কন্যার পিতাকে পীড়ন করিবার দরকার নাই, তিনি যাহা সহজে দিতে পারেন—তাই বন, না পারেন—কিছুই আবশ্যক নাই। গহনাপত্র তুমি নিজেই বাড়ীর মেয়েদের মনোমত গড়াইয়া দাও। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—কন্যার পিতা একেবারে নিঃস্ব নয়, আর খুব বড়লোকও নয়—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। দেখা যাক্—তিনি কি দেন, তার পর আমি গড়াইয়া দিব। একদিন শুভদিনে উভয় পক্ষে পাকা দেখা হইয়া গেল, তার পর মাঘ মাসের প্রথম লগ্নেই বাসুদেবের সহিত বেলিয়াঘাটার প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নন্দরাণী দেবীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহে অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব আসিয়াছিল। রামেশ্বর প্রাণের শ্যালক কমলেশ্বরকে দেবীপুরের বাটীতে সপরিবারে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের আসা ত' পরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত আসিল না। নির্ম্মলা বড়ই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন।

যে ভাই প্রতি সপ্তাহে পত্রের দ্বারা ভাগিনেয়ের সংবাদ গ্রহণ করেন, উভয় বাটীর কুশল সংবাদ জানিতে বা লইতে তিলমাত্র বিলম্ব করেন না, সেই দাদা আজ তাঁহার প্রাণের ভাগিনেয়ের শুভ-বিবাহ—কোথায় সদলবলে আসিয়া শুভ-কার্য্যে কর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্ম করিবেন—তাহা না হইয়া একেবারে সংবাদ পর্য্যন্ত বন্ধ—কি হইল? মাধুরীও ত' চুপ করে থাক্‌বার লোক নয়—বাসুর বিয়ে তার কত আনন্দ! নির্ম্মলা সাতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন।

বিবাহের আমোদ-প্রমোদ চুকিয়া গেল—ইহাতে যোগ না দিলে পুত্রের অকল্যাণ হইবে—এইজন্য দৈত্যের হাসি হাসিয়া কার্য্য সমাধা করিলেন। আত্মীয়-স্বজন স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রামেশ্বর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করা যায় ভাই! যে কমল উৎসবের কথা শুনিলে আত্মহারা হইয়া দৌড়িয়া আসে, এরূপ একটা মহৎ কাজে সে আসা চুলোয় যাক্—পত্রের উত্তর দিল না. নিশ্চয়ই কোন বিপদ হ'য়েছে, এখন কি করা যায়। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—কি আর করা যাইবে; যাইতে হইবে, বলিয়া সকলেই উতলা হইলেন। নববধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। এমন সময় একদিন রামেশ্বরের নামে একখানি পত্র আসিল; তাহা কমলেশ্বরের হস্তাক্ষর দেখিয়া রামেশ্বর পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। কমলেশ্বর লিখিয়াছেন,—"ভাই রামেশ্বর! মায়ের সাংঘাতিক পীড়া, তাঁর অনুমতি মত কাশীতে আসিয়াছি। তোমার পত্র redirect হইয়া এখানে আসিয়াছে। বাসুর বিবাহ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলাম কিন্তু আমরা এ আনন্দে যোগদান ক'র্ত্তে পারলাম না ব'লে তুমি ও নির্ম্মলা কিছু মনে ক'রো না, বাসু বাবাকেও দুঃখ করিতে নিষেধ করিও, অত্যন্ত কারে পড়িয়াছি। বিবাহ-কার্য্য শেষ হইলে নির্ম্মলাকে লইয়া কাশীর গণেশ মহল্লায় আসিবে, সত্বর না আসিলে মার সহিত দেখা হইবে না—অবস্থা বড় খারাপ!"

শক্তি-সাধনা।

পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া এবং মায়ের অবস্থা খারাপ শুনিয়া নির্ম্মলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। পত্রে যেরূপ লেখা আছে, তাহাতে আর কালবিলম্ব করা চলে না। সেইদিনই রামেশ্বর পুত্র ও নির্ম্মলাকে লইয়া কাশী-যাত্রা করিলেন। দাদা যখন আছেন, তখন ত' আর সংসারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে না? তাঁহারা অনায়াসে সমস্ত ভার সর্ব্বেশ্বরের ঘাড়ে ফেলিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মতের পরিণাম।

যখন কন্যা ও জামাতা দৌহিত্রসহ কাশীর গণেশ মহল্লায় কমলেশ্বরের বাসায় উপস্থিত হইলেন, তখন সৌদামিনীর ইহলোক ত্যাগ করিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রের দর্শনাশায় নিরাশ হইয়া বৃদ্ধা মনে মনে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইয়াছেন—এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া জননীর পদতলে কাঁদিয়া পড়িল। বাসুদেব দিদিমার শিয়রে বসিয়া ডাকিলেন—"দিদিমা, আমরা এসেছি।" সৌদামিনী অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা, আমার সদাশিব জামাই কোথায়?"

"এই যে দেবী, আমি তোমার পদতলে" বলিয়া রামেশ্বর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মলা মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ শাশুড়ীর কাণে রামেশ্বর মায়ের নাম শুনাইলেন—সৌদামিনী বেশ মনোযোগসহকারে শুনিলেন। তার পর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইল। বিকারের ঘোরে কত কি বকিতে লাগিলেন। ডাকিলে আর সাড়া দিলেন না, ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে সৌদামিনী সকলকে ফাঁকী দিয়া ইহ-লোক ত্যাগ করিলেন। কাশীতে মরিলে সকলেরই শিবত্ব প্রাপ্তি হয়—হিন্দুমাত্রের ইহাই ধারণা। সকলে সেই পবিত্র দেহ বহন করিয়া শ্মশানে দাহ করিলেন। বহুদিনের সৌদামিনী আজ পবিত্র কাশীধামে পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র, প্রভৃতির নিকট হইতে চিরজন্মের মত বিদায় হইলেন।

মাতৃবিয়োগে কমলেশ্বর উদ্‌ভ্রান্ত—যে জননীর কোমল-কোলে

বৰ্দ্ধিত হইয়াছেন, যাঁহার মঙ্গলময় স্নেহাশীর্ব্বাদে তিনি অতি সহজে জীবন-পথে এতদূর উন্নতি করিয়াছেন; একমাত্র পুত্র বলিয়া যিনি তাঁহার সুখের জন্য আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রগতপ্রাণে তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে কিছুমাত্র যত্নের ক্রটী করেন নাই, আজ তাঁহার সেই স্নেহময়ী মা, জগতের একমাত্র আরাধ্যদেবী চিরদিনের মত তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহ-জীবনে আর তাঁহার সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, ভাবিলে মাতৃভক্ত পুত্রের প্রাণ যে উদ্‌ভ্রান্ত—উদাস হইয়া পড়িবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মাধুরী জননী-সমা শাশুড়ীর শোকে দুই তিন দিন উঠিতে পারেন নাই—প্রবোধ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। নির্ম্মলা ও বাসুদেব সেই বিষম শোকের হাত এড়াইতে পারেন নাই কিন্তু ব্রহ্মভাবের ভাবুক—জ্ঞানানন্দ রামেশ্বর বহু-দিন হইতে মায়ামুক্ত। জগতের গতিই এই, মানুষ যাইবার জন্যই জগতে আসে—আসা-যাওয়াই জগতের কার্য্য। ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন, তখন শোক কিসের?

রামেশ্বর সকলকে সান্ত্বনা দিয়া পৃথিবীর নশ্বরত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। আত্মা অবিনাশী; কেবল দেহটাই মরে—আত্মা অজর, অমর; ভোগদেহ লইয়া আবার আসিবে—জগতের কাজই এই। তিনি ত' আর অসময়ে মরেন নাই—তবে শোকে এত অধীর কেন? কমলেশ্বর, নিতান্ত অবুঝের মত অত কাতর কেন, ধৈর্য্য ধরে তাঁহার পারত্রিক কার্য্য সকল সমাধা কর। দিন ত' আর বেশী নাই?

সকলের শোক কতকটা প্রশমিত হইল। কমলেশ্বর কিন্তু সেই ভাবেই বলিলেন—ভাই! দারাগঞ্জে যাইয়া ত' আর শ্রাদ্ধ করা হয় না—পথেই সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অতএব তুমি এইখানেই অশৌচান্তের ব্যবস্থা করিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দাও।

তার পর বাৎসরিকের সময় না হয় দেশে সমারোহে কার্য্য সম্পন্ন করিব।

রামেশ্বর তাহাই করিলেন। নিজেই পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিলেন এবং উপস্থিত নিয়ম পালনের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণও ভোজন করান হইল। কমলেশ্বরের প্রাণ হইতে মাতৃ-শোক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও, পুত্র হইয়া তাঁহাকে যে কাশীতে আনিয়া তাঁহার সৎকার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রাণে অসীম সন্তোষলাভ হইয়াছে। মায়ের সদ্গতিলাভ হইয়াছে-ইহার চেয়ে পুত্রের আর আনন্দের বিষয় কি আছে, তিনি কিছুদিন কাশীতে উদভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; বড়লোকের ছেলে অর্থের ত' অভাব নাই?

রামেশ্বর সেও একবার পিতৃমাতৃবিয়োগের সময় কাশী আসিয়াছিলেন। সেই একদিন আর এই একদিন। রামেশ্বর তখন মোহাচ্ছন্ন সংসারের কীট, অষ্টপাশবদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানহীন। আর এখন তিনি মায়া-মুক্ত, সংসারে নির্লিপ্ত, পাশমুক্ত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। তখনকার দেবদর্শনে আর এখনকার দর্শনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তিনি স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন—কাশী আনন্দময় ভগবানের আনন্দ-নিকেতন। অন্নসত্রে অন্নের ছড়াছড়ি, এখানে অন্নপূর্ণা অন্ন প্রদান না করিলে জগতের জীব খাইতে পায় না। জগৎপালয়িত্রীরূপে মা আমার কাশীতে বিরাজমানা। অন্নপূর্ণা অন্ন বিতরণ না করিলে, কাহারও ঘরে অন্ন থাকে না। সদাশিব একদিন মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে—অন্যত্র অন্নভোজনের আ
গিয়াছিলেন—ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়া কোথাও অন্ন না পাইয়া
মা লক্ষ্মীর নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া অন্নভিক্ষা ক
অন্ন কই? কোথাও যে কণিকামাত্র কিছু নাই, লক্ষ্মী

সন্তোষ করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন সদাশিব বুঝিলেন—অন্ন-বিতরণ অন্নপূর্ণারই কাজ। এ কার্য্যে অন্য কাহারও হাত নাই। তাই তিনি সদুঃখে "অভাগা যথায় যায়—সাগর শুখায়ে যায়, হাদে লক্ষ্মী হ'লো লক্ষ্মীছাড়া" বলিয়া কাশীতে আসিয়া জননীর সহিত অন্নক্ষেত্র প্রস্তুত করতঃ জীব সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর মনে মনে বলিলেন—এই সেই কাশী, আমার মায়ের অন্নক্ষেত্র, জীব! এখানে মায়ের হাতের দেওয়া অন্নব্যঞ্জন খাইয়া তোমাদের উদ্ধার হয় না? এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! মায়ের আনন্দ-দুলাল, মাতৃপ্রেমে বিভোর রামেশ্বর আজ মা-ময় প্রাণ লইয়া অন্নপূর্ণার দ্বারে বসিয়াছেন—সেই জগৎপালিনী মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া প্রেমাশ্রুতে যখন বুক ভাসিয়া যাইতেছে—তখন আবেগভরে, রুদ্ধস্বরে বলিতেছেন—স্নেহময়ী! এতদিন পরে তোমার স্নেহবন্যার পলি পড়ে আমার মরুময় হৃদয়-ক্ষেত্র কেমন উর্ব্বর হ'য়েছে; তোমার প্রেমবীজ তাতে উপ্ত হ'য়ে কেমন মধুর ফল-ফুলের গাছ বেরিয়েছে দেখো মা? দয়াময়ী! বিশ্বজননীরূপে আমার এই ছায়াশীতল হৃদয়-সিংহাসনে আসন পেতে বসো, আমি মনোময় পুষ্পে, ভক্তিচন্দন মাখাইয়া তোমার পূজা করি, আনন্দ-নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তোমার ভোগদানে ধন্য হই! শব-সাধনায় সুসিদ্ধ মাতৃহ্রদে নিমজ্জিত, সাধকের প্রাণের ডাক কি মা অবহেলা করিতে পারেন—অমনি হাসি হাসি মুখে হৃদয়-মন্দিরে সমাসীনা হইয়া সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। মায়ের কোলের ছেলে জ্ঞানানন্দ রামেশ্বর বিভোরপ্রাণে প্রায় দুই ঘণ্টা সমাধিমগ্ন হইলেন। তারপর মাতৃস্তনের অমিয়সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া মত্ত-প্রাণে টলিতে টলিতে বাসায় গেলেন।

পন বেশীক্ষণ রামেশ্বরের বিলম্ব হইলেই নির্ম্মলার প্রাণ ধড়ফড়

করে ... কৰণ, এখন ত' আর সকল সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কখন কোথায় বসিয়া থাকিবেন—এইজন্য হয় বাসু, নয় বিন্নু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আজ কেহ সঙ্গে নাই—নির্ম্মলা বিষম উৎকণ্ঠিতা, ভগ্নীর মুখে কমলেশ্বর ভগ্নীপতির অবস্থা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাসুদেব পিতার জন্য ঘরবার করিতেছেন, কাশীর রাস্তা ঘাট ত' তাঁহার জানা নাই, নতুবা এতক্ষণ পিতৃ-অন্বেষণে নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। বেলা অনেক দেখিয়া কমলেশ্বর আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন- এমন সময় আনন্দময় পুরুষ প্রেমপুলক-পুলকিত প্রাণে গৃহে আসিলেন। নির্ম্মলার দেহে প্রাণ আসিল—বাসু অস্থির হইয়া বলিলেন—বাবা। এত দেরী হবে যদি জানেন—একলা না গিয়ে আমাকে সঙ্গে নিলেই হতো! রামেশ্বর বলিলেন,- বাবা? আমি কোথাও আর একা যাই না, সর্ব্বদাই মা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, সেজন্য ভয় কি? বলিয়া হাত-পা ধুইলেন।

বালকভাবের ভাবুক রামেশ্বরের ভক্তিযুক্ত প্রাণের কথা শুনিয়া কমলেশ্বর ও মাধুরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

কাশীতে আসিয়া তিনি অনবরত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামেশ্বর এখন পাকা সাধক, কমলেশ্বর সময় পাইলে ভগ্নী-পতির নিকট তত্ত্বকথা শুনিবেন, পূর্ব্বের মত ধর্ম্মভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন—এই ইচ্ছা কিন্তু রামেশ্বরকে এখন আর সেভাবে দেখিতে পান না। এখন তাঁহার যেরূপ উন্নতি দেখিতে-ছেন—তাহা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বেশী, সাধারণ লোক তাঁহার এ ভাব অনুকরণ করিতে পারে না। এরূপ মহাপুরুষের করে ভগ্নী সমর্পণ করিয়া তাহারা যে ধন্য হইয়াছেন—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যেমন বাপ—পুত্র তাঁর তেমনি। বাসুদেব সাধনমার্গে তত অগ্রসর

না হইলেও, ধর্ম্মকর্ম্মের কথা সাধনভজনের কথা সেও এমন সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুত্র যে পিতার আত্মা, একাধারে যে ভিন্ন মূর্ত্তি—গুণের অধিকারী না হইবে কেন?

রামেশ্বরকে না পাইলে কমলেশ্বর ভাগিনেয়ের সহিত বাসায় বসিয়া ধর্ম্মালাপে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। এত অল্প বয়সে তাহার প্রাণের ভাব দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কাশীতে গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। কমলেশ্বর একদিন দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ নিবারণার্থ কেদার-ঘাটে বসিয়া আছেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে ঘাটে লোকজন তত নাই। সেদিন জননীর স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, মায়ের সদগতি হইয়াছে, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন—কমলেশ্বর ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া তাই প্রার্থনা করিতেছেন—মা! ছেলে মেয়ে ছেড়ে পিতার সহিত স্বর্গবাস করিতেছ—এ অধম পুত্র বহুদিন তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পায় নাই—বাহ্যচক্ষে দর্শন না হইলেও অন্তরে যে পাদপদ্ম সতত জাগিয়া রহিয়াছে। কমলেশ্বর বড় মাতৃভক্ত, চরিত্র সংশোধিত হইবার পর হইতে তিনি জননীকে বড়ই ভক্তি করিতেন। আজ প্রায় একমাস হইল তাঁহার সেই আরাধ্য-ধন স্বর্গগত হইয়াছেন। কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অতএব মুক্তি সম্বন্ধে আর কোনও প্রকার দ্বিধা থাকিতে পারে না।

তিনি স্বর্গে আছেন—কমলেশ্বর এইজন্য মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কে বলিল—মিথ্যা চিন্তা; তাঁর উদ্ধার হয় নাই—তিনি শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, শূকরী হইয়াছেন, কমলেশ্বর বিষম উদ্বেলিত-চিত্তে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—একজন পাগল সন্ন্যাসী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে ভয় ও ভক্তির উদয়

হইল, এ কে সন্ন্যাসী, আজ আমার প্রাণের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিলেন! আমার স্থির-বিশ্বাস যে, আমার জননী মুক্তিলাভ করিয়াছেন কিন্তু এ সন্ন্যাসী কি বলেন? তবে কি আমার জননীর সদ্গতি হয় নাই? সন্ন্যাসীরা সব বলিতে বা করিতে পারেন। মরা যখন বাঁচাইতে পারেন—আমার মরা ছেলের যখন প্রাণদান করিতে পারেন—তখন তাঁরা এ জগতে না পারেন কি? প্রবোধের জীবন প্রাপ্তির দিন হইতে কমলেশ্বর সন্ন্যাসী দেখিলেই—সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার চরণে নত হইতেন।

আজ এই সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া চরণে প্রণিপাত করতঃ বলিলেন—প্রভু! আপনি আমার প্রাণের অটল বিশ্বাস টলাইয়া দিলেন—কাশীতে মৃত্যু হইলে আমার বিশ্বাস—মৃতের সদ্গতি অনিবার্য্য কিন্তু প্রভো! আপনি একি কথা বলিলেন—তবে কি আমার জননীর মুক্তি হয় নাই- সত্যই কি তিনি শুকরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন?

তোমারই দোষে বৎস—তোমারই দোষে, বলিয়া সেই কৌপীনধারী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ঘাটে নামিলেন। কমলেশ্বর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না, বলিলেন—"প্রভু! আমার দোষে কেমন করিয়া—আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তাঁহাকে শূকরী হইতে হইল?"

"পাষণ্ড জান না? ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থের লোভে শূকরের ব্যবসা করিয়াছ, দারাগঞ্জের কোতয়ালীতে শূকর সরবরাহ করিয়াছ! মৃত্যু-সময়ে মনের চিন্তানুসারে জীবের জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

মৃত্যু-সময়ে হঠাৎ সেই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য করিয়া জননীর মুক্তির পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছ।" কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিতে হইলে সকল দ্রব্যই সরবরাহ করিতে হয়; কমলেশ্বর একদিন কোতয়ালীর কর্ত্তার হুকুম অনুসারে চণ্ডাল দ্বারা বহু শূকর আনিয়া একটী খোঁয়াড়ে পুরিয়া রাখিয়া পরদিন তাহা চালান দিয়াছিলেন। তখন সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল, দুঃখে, ক্ষোভে অধীর হইয়া সেই মহাপুরুষের পা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন—ঠাকুর! এখন উপায়; অন্তর্য্যামী আপনি, দেবতা আপনি, আমার জননীর প্রতি দয়া করুন!

সন্ন্যাসিগণ যেমনি রুষ্ট—তেমনি সহজেই তুষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি বলিলেন—বৎস! এইজন্য ভগবান জাতি অনুসারে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অর্থের লোভে যা তা করিলে পাপভাগী হইতে হইবে।

কমলেশ্বর। আপৎকালে ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তিও ত' মনুসংহিতায় লেখা রহিয়াছে!

সন্ন্যাসী। বৈশ্যবৃত্তি বলিয়া একেবারে শূকরের ব্যবসা? ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডাল-বৃত্তি অবলম্বন করা -তোমার এমন কি আপৎকাল উপস্থিত হইয়াছিল? সদানন্দের ত' যথেষ্ট অর্থ ছিল; তিনি ত' সৎ উপায়ে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন—তবে তুমি ঐ ব্যবসা করিতে গিয়াছিলে কেন? পিতা তোমার ঐ ব্যবসার বিপক্ষ ছিলেন- উহার জন্য বহু তিরস্কার করিয়া তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃ তোমার মাতা সেই সদানন্দময় পুরুষ—স্বামীর প্রতি একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন,—সেইজন্যই তাঁর এই পরিণাম।

কমলেশ্বর। সন্ন্যাসীর মুখে নিজের সমস্ত পরিচয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; ইনি মহাপুরুষ না হইলে, এত তথ্য জানিলেন কেমন করিয়া?

কমলেশ্বর পা ছাড়িলেন না, এমনি করিয়া পুত্রের জীবন-ভিক্ষা করিয়া একদিন কালীঘাটে এক মহাপুরুষের পদানত হইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। কমলেশ্বর পায়ে পড়িয়া বলিলেন—আপনাকে ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে—নতুবা আমি আপনার পায়ে প্রাণপাত করিব। ক্ষমার নিদান সন্ন্যাসী কমলেশ্বরকে ছলনা করিয়া বলিলেন—পুনরায় শ্রাদ্ধ কর।

কমল। কিরূপে করিব—উপদেশ দিন!

সন্ন্যাসী। অদূরে ঐ নিভৃত স্থানে আমার আশ্রম; আমি তোমার জননীর শ্রাদ্ধ করাইব—তবে তোমাকে তেত্রিশকোটী দেবতা, পৃথিবীর সমস্ত বাদ্য-ভাণ্ড, সকল প্রকার ফুল এবং সকল তীর্থের বারি সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে, যেদিন ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ হইবে সেদিন তোমার পুত্রের সহিত তুমি ঐ স্থানে আসিও; এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

কমলেশ্বর সাতিশয় মনের দুঃখে বাসায় ফিরিলেন—সন্ন্যাসী যাহা বলিয়া দিয়াছেন, সে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা কেমন করিয়া সম্ভব! বাসায় আসিয়া দুর্ব্বিসহ চিন্তায় নিদ্রা হইল না। এ গোপনীয় কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবারও উপায় নাই—তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। তবে রামেশ্বরকে একথা না জানাইলে নয়, কমলেশ্বরের প্রাণের কথা রামেশ্বর ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। প্রাতঃকালে একবার তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান মানসে বাটীর বাহির হইয়াছেন, কমলেশ্বরও সেদিন তাঁহার অনুগমন করিলেন। রামেশ্বর বলিলেন—কমল! আজ যে এত সকালে স্নান ক'র্বে?

শক্তি-সাধনা।

কমলেশ্বর বলিলেন—দারুণ গ্রীষ্মে প্রাতঃস্নানই ভাল, চল আজ তোমার সঙ্গে স্নানে যাই। এই বলিয়া দুইজনে বাটীর বাহির হইলেন। কমলেশ্বর প্রাণের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিলেন! রামেশ্বর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—যে সন্ন্যাসী এ কথা বলিয়াছেন—তিনিও সামান্য সন্ন্যাসী নহেন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ, জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কোথায় থাকেন, কমল!

কমল। কাল রাত্রে কেদার ঘাটে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম; তিনি ঐখানে একটী নিভৃত কুটীরে অবস্থান করেন।

রামেশ্বর। চল ভাই! একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি?

কমল। ভাই, কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে যাইলে যদি তিনি বেশী লোক-সমাগম দেখে অন্তর্হিত হন, তাহা হইলে সমস্ত নষ্ট হইবে। অতএব জননীর পারত্রিক কার্য্য শেষ করিয়া যাইলে ভাল হয় না? এ সকল পুরুষের মতিগতির বিষয় তুমি ত' জান?

রামেশ্বর। আচ্ছা, সেই ভাল; এখন তুমি কি করিবে?

কমল। যে সকল দ্রব্য চাহিয়াছেন—তাহা ত' অতি অসম্ভব, কেমন করিয়া সংগ্রহ হইবে?

রামেশ্বর। অসম্ভব কিছুই নহে—তিনি তোমাকে ছলনা করেছেন, যাহাতে তুমি বুঝিতে না পার এবং সংগ্রহ করিতে না পার।

কমল। তাই তো তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—কি ক'র্‌ব বলো?

রামেশ্বর বলিলেন—তেত্রিশ কোটী দেবতার সমান নারায়ণ শিলা। অতএব নারায়ণ শিলা সংগ্রহ করিলেই, তেত্রিশ কোটী দেবতাকে একত্র করা হইল। পৃথিবীর সমস্ত বাদ্যভাণ্ড "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" একটী ঘণ্টা সংগ্রহ করিলেই হইবে। সকল পুষ্পের সংগ্রহ করিতে না পারিলে "দূর্ব্বাদল" তাহার স্থানে বিনিয়োগ করা যায়। আর তীর্থের

সার গঙ্গাজল—তিনি অতি সামান্য দ্রব্যই সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন কিন্তু এরূপ ছলনা করিয়া বলিয়াছেন—যাহাতে তুমি আশ্চর্য্য হইয়া যাও এবং অসম্ভব বিবেচনায় কার্য্যে নিরস্ত হও।

কমলেশ্বর। এ ত' অতি সামান্য! মহাপুরুষের কৃপাই তাঁহার উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়, তবে আজই প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হই না কেন? শ্রাদ্ধের কাল মধ্যাহ্ন ত' এখন উত্তীর্ণ হয় নাই। বিলম্ব হইলে, কি জানি যদি অদৃষ্টক্রমে তিনি কোথাও চলিয়া যান?

রামেশ্বর। হাঁ "শুভস্য শীঘ্রং" তার আর কথা আছে। কমলেশ্বর সত্বর স্নান করিয়া বাটী গমন করিলেন এবং পিতা পুত্রে রামেশ্বর-কথিত শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সেইদিনই মহাপুরুষের কুটিরে উপস্থিত হইলেন।

পাগল তাঁহাদের দেখিয়া বলিলেন—কিরে তোরা এসেছিস্? আমি মনে করিলাম, তোরা ইহার কিছুই সংগ্রহ ক'র্ত্তে পারবিনি, অসম্ভব বিবেচনা ক'রে ভেগে পড়বি? এখন দেখছি কোন ভাল শাস্ত্রপাঠী লোকের সঙ্গে তোর আলাপ আছে, যাহা হউক, শ্রাদ্ধ করিতে বস্।

প্রবোধচন্দ্র সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন পিতা শ্রাদ্ধে বসিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর এই ছেলেটী এখন বেশ ভাল আছে, আর কোন ব্যায়রাম স্যায়রাম হয় না? আহা! দিব্বি চেহারাটী হয়েছে!

কমলেশ্বর কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার প্রাণে জননীর উদ্ধার-চিন্তা জাগিয়াছে, অতীত চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, তিনি তন্ময়ভাবে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে পিণ্ডদানের সময় কোথা হইতে একটী শূকরী মূর্ত্তি আচম্বিতে আসিয়া সেই পিণ্ড ভক্ষণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কমলেশ্বর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—তোর জননীর শূকরী-দেহ নাশ হইল—ইহাকে দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণ কর, দশদিন অন্তে আবার এইরূপ দ্রব্যাদি লইয়া এখানে আসিস্।

কমলেশ্বর ও তাহার পুত্র সন্ন্যাসীর আদেশমত শূকরের শবদেহ দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণান্তে বাড়ী গেলেন এবং দশদিন পরে আবার আসিলেন। সে দিন শ্রাদ্ধান্তে দেখিলেন—তাঁহার জননী দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিযা মুক্তিপথে যাত্রা করিতেছেন, কমলেশ্বর জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং পরম পুলকিতচিত্তে মহাপুরুষের পদে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিবেন—ঠিক সেই সময় "এ শক্তি কার, সাধারণ মানব-শক্তি এরূপ দৈবশক্তির আধার হইতে পারে না, এ যে আমারই ইষ্টদেব" এই বলিয়া ছুটিয়া, আসিয়া রামেশ্বর পাগলের পদতলে গড়াগড়ি দিয়া বলিলেন—ঠাকুর, এমন করিয়া কি ফাঁকী দিতে হয়, চক্ষের সম্মুখে থেকেও গোপন করা; কালীঘাটে প্রবোধের জীবন-দানের কর্ত্তা যে তুমি, তাহা কি আর আমার জানিতে বাকী আছে? এরূপ ছলনা আর কতদিন ক'র্ব্বে প্রভু!

মহাপুরুষ। বৎস রামেশ্বর! এই শেষ, শ্মশানে তোমাকে বলে এসেছিলাম—আর একবার দেখা হ'লেও হতে পারে—আজ তাই হ'লো! এইবার তুমি দেশের কাজে ব্রতী হও, আমি চলিলাম লোকালয়ে আর আসিব না। তুমি কিরূপ উন্নতি কচ্ছো, গোপনে থেকে এতদিন, দেখলাম। এই বলিয়া মহাপুরুষ চকিতের ন্যায় সেই সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহারা উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিলেন। প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন আহা! ইনিই আমার জীবনদাতা, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিরাট মূর্ত্তি।

রামেশ্বরের দেশে আসিতে বিলম্ব হইতেছে, সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এখন যে সে স্নেহময় সহোদরকে এক দণ্ড না দেখিলে তাঁহাদের প্রাণ অস্থির হয়। রামেশ্বর পাড়ায় না থাকিলে প্রতিবাসীরাও সকলে মনে করে, যেন কোন বিজন-বনে বাস করিতেছে, পুত্র-কলত্র সঙ্গে সংসারবাসেও তাঁহাদের প্রাণ যেন শূন্যময় বোধ হয়। আর বিরূপাক্ষ এ কয়দিন শূন্যপ্রাণে গৃহে অবস্থান করিতেছে, আহারে রুচি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই অশান্তি, এই কয়দিনে সে একেবারে দিশাহারা—কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রে বিরূপাক্ষকে ডাকিয়া সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—বিরূ! কি করা যায়, রাম যদি কাল না আসে, তাহ'লে আমাদের যেতে হবে দেখ্‌ছি?

বিরূপাক্ষ বলিলেন—জেঠামশাই! আমি ত' আর থাকৃতে পার্‌ছি না, আজই মনে করেছিলাম—চলে যাব কিন্তু ওপাড়ায় একটা কাজের জন্য যেতে পারলাম না, কাল আমিত যাবই।

পাড়ার মাতব্বর কয়েক জন প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করেন—হাঁরে, সর্ব্বেশ্বর, রামেশ্বর কি আর আস্‌বে না নাকি?

সকলের প্রাণের টান পড়িলে, দেবতার আসনও টলে। রামেশ্বর পরদিন প্রাতঃকালে তাহার সাধের পল্লীবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর নিজের সিদ্ধাসন কি কখনও শূন্য ফেলিয়া রাখিতে পারেন? তাঁহারও প্রাণ যে আনচান্ করিতেছিল। তবে সেখানে মাতৃদর্শন ও

ভগবদ্দর্শনে কিছুদিন মনের আনন্দে ছিলেন বলিয়া রামেশ্বর এ দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভু যে শেষ দর্শন দিয়া কিয়দ্দিন দেশের সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, কাজেই স্বগ্রামের সেবা আগে বলিয়া রামেশ্বর বাটী ফিরিয়াছেন, কমলেশ্বরও গুরুস্থানীয় রামেশ্বরের নিকট বিদায় হইয়া দারাগঞ্জ যাত্রা করিয়াছেন।

রামেশ্বরের আগমনে গ্রামে আবার শান্তি বিরাজিত হইল। সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দোসরকে পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আনন্দময় রামেশ্বর বিহনে এ কয় দিন গৃহ যেন নিরানন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিরূপাক্ষ দেবদেবীর দর্শনে পুলকপূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া চরণে প্রণাম করিলেন। নির্ম্মলা বাৎসল্য-স্নেহে অধীরা হইয়া বলিলেন—কিরে বাবা! এই কয়দিনে যে আধখানি হ'য়ে গেছিস্। কোনও অসুক করে নাই ত' ?

বিরূ। সবই অসুখ। করে নাই আবার কি ? আর দুই চার দিন না এলে দেখাই হতো না—ভেবে ভেবে মরে যেতাম।

নির্ম্মলা সাদর নম্রস্বরে বলিলেন—কি ক'র্ব্বো বাবা! কার্য্য শেষ না হ'লে ত' আর আস্‌তে পা'র না।

প্রতিবাসিনী রমণীসকল আসিয়া কত আদরের সহিত তিরস্কার করিতে লাগিল। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা সকলকেই সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন! বিরূপাক্ষ সোদরপ্রতিম বাসুদেবকে পাইয়া বলিল—কি রে বাসু! তুইও কি বাপ-মায়ের মত নির্দ্দয়, একখানা পত্রও দিতে পারিস্‌নি ?

বাসুদেব মিনতিস্বরে বলিল—কি ক'র্ব্বো দাদা সময় পাইনি, আর নূতন স্থানের কোথায় কি পাওয়া যায়—ভাল সন্ধান জানি না বলে দিতে পারি নাই।

ভবানী অভিমানে খুড়া খুড়ীর সঙ্গে কথা কহিল না, একেবারে মুখ লাল করিয়া বসিয়া রহিল। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা আসিয়া তাহার মুখে চুমো খাইয়া বলিলেন—ছিঃ বাবা! রাগ ক'র্ত্তে আছে কি; আমরা কি আর ইচ্ছে ক'রে বসেছিলাম--বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। যে খাবার আনিয়াছিলেন—কাছে বসিয়া খাওয়াইলেন। ছেলে অত বড়, তথাপি মাতৃস্নেহের কাছে—সে কত কচি, মরি মরি ইহাই না বাৎসল্যের চরম! ভবানী বাসুদেবের সঙ্গে দুই একটা অভিমানের ঝগড়া করিয়া বড়ঘরের দাওয়ায় গিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল।

সেইদিন হইতে রামেশ্বর গুরুর আদেশে—নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় কাহার কি অভাব আছে, কে কষ্ট পাইতেছে, তাহা দেখিয়া তাহাদের অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন। রোগীর সেবা, আর্ত্তের দুঃখ-মোচন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি প্রায় এক বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অজস্র অর্থও খরচ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অভাব হইল না। সকলেই ত' মায়ের সন্তান—মা ছাড়া যে কিছুই নাই। অতএব তাঁহার সহোদর ভাই ভগ্নী কষ্ট পাইবেন আর তিনি সুখে কালযাপন করিবেন—ইহা কি সম্ভব। রামেশ্বর একদিন কৃষক-পল্লীতে গিয়া দেখিলেন—দুইটী বৃদ্ধার এমন বস্ত্রাভাব হইয়াছে, যে তাহারা বাটীর বাহির হইতে পারে না। তিনি আপনার কাপড়খানি একজনকে দিলেন এবং স্কন্ধের চাদরখানি আর একজনকে দিয়া গামছা পরিধানে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে বাড়ী ফিরিলেন। সর্ব্বেশ্বর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রামেশ্বর মানুষ না দেবতা!

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" সর্ব্বেশ্বর এই ভায়ের সঙ্গে কালযাপন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইল। তিনিও এখন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা, দেবসেবা না করিয়া জল খান না।

হায়! অসৎসঙ্গে পড়িয়া তিনি জীবনের কত অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছেন; এতদিন রামেশ্বরের সঙ্গে থাকিলে কি আর তাঁহাকে জীবন-সন্ধ্যায় এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণের অযোগ্য হইয়া থাকিতে হইত? মতি ফিরিয়াছে—তাই সর্ব্বেশ্বর জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া, পরকাল-চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

অতিথিশালা ত' আছেই—তথাপি নির্ম্মলা পাড়ার দুস্থ-ভদ্র মহিলা-গণকে, যাহারা মানের দায়ে বাড়ীর বাহির হইতে পারে না, তাহাদিগকে অযাচিত ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল—দেবানন্দের পুত্র ও পুত্রবধূটি শাপভ্রষ্টা দেবদেবী।

রামেশ্বর একদিন কাজকর্ম্ম সারিয়া সিদ্ধাসনে আসিয়া বসিয়াছেন, প্রাণে একটু অহংভাব জাগিয়াছে। কাছে কেহ নাই, তাই তন্ময়ভাবে—একদৃষ্টে মায়ের পটের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন। ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মময়ীর জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন, সেই ক্ষুদ্র মাতৃমূর্ত্তি ক্রমশঃ বিশাল বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিল। দেখিলেন—মূর্ত্তির শিরোদেশ অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছে, কত শত গিরিনদী সেই বিশাল বিস্তৃত দেহে শোভা পাইতেছে, কত বড় বড় হর্ম্ম্যশ্রেণী, কত বৃক্ষলতা, কত সুরাসুর, নর. মৃগ, জলচর, সুন্দর-অসুন্দর, ছোট বড়, নানাবিধ কীট-পতঙ্গ—সেই বিশাল অঙ্গে জন্মিতেছে—আবার লয় পাইতেছে। তারপর সেই ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি অপূর্ব্ব মাধুরীময় বৈষ্ণবীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এইবার সাধক সেই নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এতক্ষণ ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছিল—এক্ষণে সেই মধুর শুভঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সাধক দেখিলেন—বিশ্বেশ্বরী মায়ের বহু ভুজ, লক্ষ লক্ষ স্তন, অগণিত সুকুমার শিশু তাহা পান করিতেছে। বহু-ভুজে

খাদ্য-দ্রব্য বিতরণ করিতেছেন, জগদ্‌বাসী সেই খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। তার পর জননীর সংহার-মূর্ত্তি বড়ই ভীষণ! ভীষণ দশনে সমস্ত চর্ব্বণ করিতেছেন; সৃক্ক বহিয়া রুধির-ধারা—ওঃ কি ভয়ানক বদন-ব্যাদান! রক্তবর্ণ বিশাল চক্ষুদ্বয় ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে—ভালের তৃতীয় নয়ন হইতে প্রলয়কালীন অগ্নি বাহির হইয়া বিশ্ব-বিনাশে উদ্যত। সাধক ভয়-চকিত প্রাণে—"মা ওরূপ সম্বরণ কর, আর দেখিতে পারি না—দেবী প্রসন্না হও; তুমি জগতের মূলাধার, তুমি অজ্ঞাননাশিনী—জগৎপ্রসবিনী; জগতের পালনভার তুমিই গ্রহণ কর, আবার লয়ও তোমাতে হয়। সয়ম্ভু হৃদে বসিয়া সংহার-কার্য্যে তুমি তৎপরা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তুমিই সব মা; সামান্য-বুদ্ধি সন্তান—আমি কি বুঝিব; যখন বুদ্ধ, শঙ্কর, কপিল পাতঞ্জল প্রভৃতি অবতার-কল্প মহাপুরুষগণ তোমার মহিমা বুঝিতে পারেন নাই, পাগলের মত আত্মহারা হইয়া কেবল তোমাতে মিশিয়া গিয়াছেন, তখন আমি কোন্ ছার—নগণ্য! ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর, আজ আমার অহংজ্ঞান চূর্ণ হইয়াছে, অহংভাবে লোকের সেবা করিয়াছি বলিয়া আমার দর্প চূর্ণ হইল। আমি কেহ নহি—তুমিই সব; আজ এ অজ্ঞতা নাশ করিয়া তুমি পুত্রকে সৎপথে চালিত করিলে। এক্ষণে মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দাও—" বলিয়া সাধক ভক্তিপ্রণত চিত্তে সিদ্ধাসনে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

প্রতি পদে পদস্খলন এবং প্রতি পদে চৈতন্যময়ী মা আমাদের নানা ছলে চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। পাপের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কত শত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন; আবার এই হৃদয়ের অন্তস্থলে থাকিয়া ঠিক আপনার জনের মত, স্নেহময়ী জননীর মত কত ভাবে আমাদের চৈতন্য সম্পাদনে তৎপর হইতেছেন কিন্তু কই চৈতন্য হয়। বড় বড় সাধক যখন সময়ে সময়ে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন মায়ামুগ্ধ

সংসারাসক্ত, আমাদের সে ক্ষমতা কোথায়! তিনি ক্ষমতা না দিলে, তিনি অজ্ঞান নাশ না করিলে—কার সাধ্য যে এ অন্ধকূপ হ'তে পরিত্রাণ পায়। সাধক জ্ঞানানন্দের এক দিনের সামান্য মাত্র ত্রুটীতে মা তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহার কৃপা না হইলে জপ তপ সকলই অসার।

সাধক কতক্ষণ এই ভাবে ছিলেন—তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিরূপাক্ষ আসিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। প্রাণের বিরূকে দেখিয়া তিনি মনশ্চাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ করিয়া কত কাঁদিলেন; তার পর পঞ্চবটীতলে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মায়ের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তাঁহার স্নেহ-করুণা লাভের জন্য জপে বসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মভাব।

সাধক জ্ঞানানন্দ এখন যথার্থ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া স্থির ধীর হইয়া বসিয়াছেন, এখন আর কোথাও যান না, কাহারও সহিত দেখা করেন না। আহার যদি কেহ দেয় তবেই খান—নতুবা চেষ্টা করিয়া আর কিছু করিতে পারেন না, করিবার সময়ও নাই। সর্ব্বদাই বিভোর-প্রাণে বসিয়া মাতৃসত্তায় স্থির হইয়া থাকেন। তিনি দেখেন—জগতে আর কিছু নাই—চারিদিকেই মা বিরাজিতা—এই বিশ্বচরাচর মায়েরই রাজস্বরূপে বিস্তৃত; জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে বিশ্বেশ্বরী মা আমার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সত্ব, রজঃ, তমঃ, সব মাখামাখী হইয়া মায়ের অঙ্গে মিশিয়াছে—তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। এ পৃথিবী নাই—স্ত্রী-পুত্র নাই—এমন কি তিনি পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মময়ীর সুবিশাল অঙ্গে মিশিয়া অস্তিত্ব-হারা হইয়াছেন। এই অবস্থাই জীবের যথার্থ শিবত্বপ্রাপ্তির অবস্থা—ব্রহ্মে লয় হইবার অবস্থা নির্ব্বিকল্প বিধিকল্প ব্রহ্মভাব।

সাধকের এই মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। আজ রামেশ্বরের ব্রাহ্মণ-জন্ম সফল, আজ তিনি পৃথিবীর দেবতারূপে সকলের পূজ্য। মায়ের সমস্ত মাতৃত্ব পূর্ণরূপে রামেশ্বরে প্রকটিত! আজ মাতৃসত্তার অপূর্ব্ব স্ফুরণ দেখিতে, ব্রহ্মভাবের ভাবুক রামেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে তাঁহার শিষ্যগণ দলে দলে তাঁহার সেই সিদ্ধাসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বরের এ ভাব বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই—ব্রহ্মশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে চিনিবার শক্তি মানবের নাই—বুঝি দেবতারাও—চিনিয়া

লইতে অক্ষম। রামেশ্বর এখন আর প্রায়ই কথা কন না, সর্ব্বদা ভাব-সমাধিতে মগ্ন থাকেন।

সর্ব্বেশ্বর দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছেন ও কিছু না বুঝিলেও ভ্রাতৃ-অঙ্গে ব্রহ্মশক্তির স্ফুরণ, দেহের অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন আর বলিতেছেন—আজ আমি এই সাধক-চূড়ামণি রামেশ্বরের ভাই বলিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্য-শালী মনে করিতেছি—আজ আমি ধন্য—আমার বংশ ধন্য—আমার কুল পবিত্র, এমন কুলপাবন পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া দেবীপুরও পবিত্রাদপি—স্বর্গ-তুল্য। প্রমোদা এই দেবতা-স্বরূপ দেবরকে পূর্ব্বে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন বলিয়া—নিজেকে কত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা এখন সমস্ত ত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গ লইয়াছেন। শিব-শক্তিরূপে এখন সতী সদাই পতি-পার্শ্বে বিরাজিতা। তিনি সংসার ভুলিয়াছেন, সমস্ত কামনা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভৈরবীরূপে এই আনন্দভৈরবের পদতল সার করিয়াছেন। আর বিরূপাক্ষ—সে ত' আত্মহারা, গুরু ও গুরুপত্নীর চির-দাসানুদাস রূপে নিকটে অবস্থিত। জ্ঞানানন্দের আহার-নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে যখন একবার চৈতন্য হয়—সেই সময় নির্ম্মলা ঠিক ছোট বালকটীর মত কোলে করিয়া সেই দেবতার বদনে কিছু কিছু আহারীয় প্রদান করেন। বিরূপাক্ষ কাছে কাছে ভৃত্যের মত করযোড়ে অবস্থান করেন—প্রভু যদি কখন কিছু অনুমতি করেন—তাহা পালন করিয়া ধন্য হইবেন।

এই অবস্থাই জীবের শিবভাবের অবস্থা, শঙ্করের সুমহান্ উদারভাব এই অবস্থাতেই জীব-দেহে সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে। এমন সময় জীব ভালমন্দ, উন্নতি-অবনতির, কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্ক্রিয়

অবস্থায় কেবল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। তখন তার পিতামাতা নাই—স্বদেশ-বিদেশ নাই, আপন-পর নাই, শত্রু-মিত্র নাই; তখন জীব কেবল দেখে :—

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

অথবা সে দেখে আমিই সব—আমি ছাড়া আর কেহই নাই—এ জগৎ আমাতেই উৎপন্ন—আমাতেই আবার লয় হইবে। আমিই চৈতন্যময় পরমাত্মা শিবোঽহং শিবোঽহং—আমার শক্তিতেই জগৎ শক্তিময়—আমি সাক্ষাৎ শিব।

সর্ব্বেশ্বর এখন ভ্রাতার কীর্ত্তি সকল বজায় রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে—এখন চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালার উপর। এই অতিথিশালাই ত' রামেশ্বরের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল-কারণ; তাই মনে-প্রাণে অতিথিগণের সেবা করিতে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে সর্ব্বেশ্বর এখন কিছুমাত্র ত্রুটী করেন না, প্রমোদাও নির্ম্মলার ন্যায় এখন চতুষ্পাঠীর বালকদের সেবা করেন। যে প্রমোদা পূর্ব্বে ধর্ম্ম করিতে পারিতেন না, ধর্ম্ম করিতে জানিতেন না, আজ তিনিই ধর্ম্মকে বুক পাতিয়া লইয়াছেন—এই বয়সে অহোরাত্র কর্ম্ম করিতেও প্রমোদা আর কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা নহেন। এমন করিয়া, কর্ম্মে এত মত্ত থাকিয়াও তাঁহারা প্রতিদিন অন্ততঃ একঘণ্টা সময় সেই পবিত্র সিদ্ধাসনে—সেই দেবদেবীর দর্শনে না কাটাইলে থাকিতে পারেন না। এই দেবদেবীদ্বয়ে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিয়া কর্ম্মে প্রমত্ত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, বয়সে ছোট হইলেও তাঁহারা যে তাঁহাদের কঠিন প্রাণে ধর্ম্মের কোমল প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার গুরু-গুর্ব্বিণী!

ভবানী ও বাসুদেব গৃহের কাজকর্ম্ম করেন কিন্তু মন পড়িয়া থাকে

তাহাদের সেই রাজীব-চরণের প্রতি। কখন গিয়া সেই পিতার দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দর্শন করিবে—কখন জননীর পদ-বন্দনা করিয়া ধন্য হইবে—এই ভাব সদাসর্ব্বদা তাহাদের প্রাণে জাগিয়া থাকে। কর্ম্ম-সাধনার মধ্যে এই গুপ্ত ভাবই এক সময়ে জীবকে মহা জাগরণের পথে আনিয়া ফেলে।

জ্ঞানানন্দ সমস্ত দিনের মধ্যে যখন এক একবার চৈতন্যলাভ করেন—তখন তাঁহার প্রাণের বিরূপাক্ষের সঙ্গেই দুই একটী কথা কহেন—বিরূপাক্ষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে তাহার উত্তর প্রদান করেন।

আজ কিছুক্ষণ ধরিয়া সাধক বিরূর সহিত কথা কহিতেছেন। মহাশক্তির অংশস্বরূপা নির্ম্মলা প্রভুর পশ্চাৎ বসিয়া আছেন।

বিরূপাক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু! আদ্যাশক্তি কি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন?

জ্ঞানানন্দ। আদ্যাশক্তিই ব্রহ্মের চিৎশক্তি, তথা ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছা হইলে—তবে তাহা বিকশিল। যাই ইচ্ছা—তাই বিকাশ, অমনি সৃষ্টির জন্য মাতৃশক্তির প্রকাশ কিন্তু শুধু মাতৃশক্তিতে ত' আর সৃষ্টি হয় না, তাই মা আমার ত্রিগুণময়ী আদ্যাশক্তি, পরম শিব অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। শিব প্রলয়ের অবস্থা—মোক্ষের অবস্থা। এই জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব যখন নাই, তখনই ব্যোম। "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং" ইত্যাদি মাণ্ডুক্য শ্রুতি বলেছেন। মোক্ষের বা প্রলয়ের অবস্থায় কিছুই থাকে না, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জীব ও জগৎ কিছুই নাই—এইজন্য ভেদাভেদ-রহিত, শিবের পূজায় তাই স্ত্রী-শূদ্র প্রভেদ নাই। শিব শব্দে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝায়। সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপতঃ এক—তথাপি ইহার দুইটী ভাব আছে—বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। শিব কারণরূপী

সুষুপ্তির অবস্থা, বিষ্ণু সূক্ষ্মরূপী স্বপ্নাবস্থা, আর ব্রহ্মা স্থূলরূপী জাগ্রদবস্থা। ব্রহ্মোপনিষৎ বলেছেন—"জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্রঃ, তুরীয়ে পরমাক্ষরম্" জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার উৎপত্তি ও লয় স্থান সুষুপ্তি। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিব হইতেই উৎপন্ন এবং উহাতেই লয়। এই শিবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনই বীজভাবে বর্ত্তমান—এই তিনই এক—একই তিন। ঐ পরমশিবের শক্তিই আদ্যাশক্তি—উহাতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বিরু। মায়ের পদতলে যে মূর্ত্তি উহা কি?

রামেশ্বর। ঐ মূর্ত্তিই পরমশিব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চৈতন্য। সব আছে কিন্তু কারণ নাই—কার্য্য নাই—কেবল গুণ, কেবল ভাব অর্থাৎ কেবল মাত্র চৈতন্যটী আছে। যাই চৈতন্যের ইচ্ছা, সৃষ্টি করিব—অমনি মা আমার বক্ষঃস্থলে ইচ্ছাশক্তি মনের জিনিষ—তাই বক্ষে। বক্ষে থাকায় তিনি আবার নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তারামূর্ত্তি ধরিলেন—তার পর ওঁকার মূর্ত্তি ষোড়শী সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, মধ্যে পরম শিব, ব্রহ্ম-বীজ ওঁকার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হ'য়েছে—ভুবনত্রয় সৃষ্টি হ'য়েছে।

বিরু। আমাদের দেহেও ত' এই ত্রিভুবন বিরাজ কর্চ্ছে?

জ্ঞানানন্দ। সে ত' নিত্য সন্ধ্যা কর্‌বার সময় জান্‌তে পার—ভূর্ভুব স্বঃ!

বিরু। আচ্ছা প্রভু! কুণ্ডলিনী শক্তি, গুহ্যদেশে আছেন কেন?

জ্ঞান। জীব ঐ শক্তিকে জাগাতে পার্‌লে -গুহ্যদেশ কিনা মর্ত্ত্য হইতে, আন্তরীক্ষ কিনা ভ্রূমধ্যে, তার পর সহস্রারে স্বর্গে পরমশিবের সহিত মিলিত ক'র্ত্তে পারলে জীব ঘরে বসে শিবত্ব লাভ করে। কোথাও যেতে হয় না।

বিরূ। আমাদের এই চারিটী আশ্রম কি ?

জ্ঞান। ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মানুসন্ধান, গার্হস্থ্য—ব্রহ্ম বিচরণ, বাণপ্রস্থ—ব্রহ্মে স্থিতি, আর সন্ন্যাস—ব্রহ্মে লীন হওয়া। বলিতে বলিতে জ্ঞানানন্দ একটু হাসিলেন—একটু কটাক্ষ করিলেন—তারপর আর চৈতন্ত নাই। আর কোনও কথা কহিলেন না। সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঠিক বসিয়া রহিলেন—আর কেবল নেত্র হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল—কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মরি মরি, জীবের এ অবস্থা চক্ষে দর্শন করিলেও ব্রহ্ম দর্শনের ফল লাভ হয়। নির্ম্মলা স্বামীর এ ভাব দেখিয়া আপনাকে কিরূপ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন—তাহা বলা যায় না। বিরূপাক্ষ কিন্তু বলিতেন—পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি ছিল বলিয়া এইরূপ দেবদেবীর পদতলে থাকিয়া মানবজন্ম সফল করিতেছি।

বিরূপাক্ষের কাজকর্ম্ম করিতে আর তত মন নাই। তবে বৃহৎ সংসার—কর্ম্ম না করিলেও নয়, তাই করেন—আর গুরুর আদেশও যে তাই, কর্ম্মই যে যোগ—ইহা কখনও ছেড়ো না, যখন ছাড়িবার হইবে—মা আপনি ছাড়িয়ে দিবেন—জোর ক'রে কিছু ক'র্ত্তে যেও না, তাহ হ'লে পতন হবে। কাজেই গুরুবাক্য দেববাক্য—শিরোধার্য্য, অন্তথা করিবে কে ?

বিরূপাক্ষ যজমানের বাড়ী কাজকর্ম্ম করাইয়া যত সত্বর পারেন চলিয়া আসেন—কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন না, যতটুকু শক্তি—যতটুকু প্রাণ, ততটুকু লইয়া তাহাদের কার্য্য করেন—এইজন্ত যজমানের কার্য্যেও সুফল হয়। আজকাল রামেশ্বর আর কোথাও যাইতে পারেন না, যাইবার মত শক্তিও আর নাই ; তাহার ভাবশক্তি এত প্রবল হইয়াছে যে, যাহা দেখেন—তাহাতেই কি এক ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্ত হইয়া পড়েন, এমন অবস্থায় যাতায়াত আর কেমন করিয়া হইবে ?

পিতার পুত্র হইয়া বাসুদেবও সময়ে সময়ে যজমান-বাড়ী গমনাগমন করেন। বাসুদেব ঠিক পিতার অনুরূপ পুত্র, সাধনশক্তি তাহাতেও জন্মিয়াছে, তাই পিতার অভাবে পুত্রকে পাইলেও শিষ্যবর্গ আপনাকে ধন্যজ্ঞান করতঃ পাদ্য-অর্ঘ দানে তাঁহার পূজা করে।

একদিন বৈকালে বিরূপাক্ষ ও বাসুদেব নিকটে বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণের পর পিতার জ্ঞান হইল। আত্মার প্রতিমূর্ত্তি পুত্রকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন—বাবা! এসেছ! এস, বলিয়া কোলে করিলেন, তার পর আবার আত্মভোলা ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজা ক'চ্ছ ত' বাবা?

বাসু। হাঁ বাবা! প্রত্যহই করি।

জ্ঞান। উহা নিত্যকর্ম্ম বাবা! ভুলো না, এ কর্ম্মই কর্ম্মযোগের মূল।

বিরূপাক্ষ বলিল—বাবা! শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে অবধি কি আপনার এইরূপ ভাব হ'য়েছে?

জ্ঞান। হাঁ তা বটে, তবে এখন নিত্যই শব সাধনা হয়। এই দেহই যে শব, জীবাত্মা-রূপী সাধক তাতে বসে কুণ্ডলিনীর জাগরণ করতঃ পরমশিবে মিলিত হয়ে নিত্যই শিবত্বলাভ ক'চ্ছে। এখন আমার সেই শিবোহহং অবস্থা আর আমার উপর এ ব্রহ্মশক্তি বিরাজ ক'চ্ছেন—এই কথা বলিয়া সাধক নির্ম্মলাকে দেখাইয়া দিলেন।

বাসুদেব একদিন মাতুল কমলেশ্বরের পত্রের উত্তরে পিতামাতার এই মহাভাবের বিষয় জানাইলে—তাঁহারা আসিয়া এই ভাব দর্শনে ধন্য হইলেন। মাধুরী তাঁহার প্রাণের প্রতিমা ননদিনী ও তাঁহার আরাধ্য-দেবতা রামেশ্বরকে মনে মনে প্রণাম করিয়া নারীজন্ম সফল করিলেন।

কমলেশ্বর ও মাধুরী দেবীপুরে আসিবার পর পাড়ায় কোথা হইতে একটা পাগল আসিয়াছে—সে নগ্ন অবস্থায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—লোকের ছোট ছেলেপিলে পাইলে ভয় দেখায়—আবার তাড়া করিলে পলাইয়া যায়। একদিন সে জোর করিয়া সিদ্ধাসনে আসিবার উপক্রম করিল কিন্তু সেখানে ত' সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার নাই—পাছে যোগী-যোগিনীর সাধনার কোন প্রকার ব্যাঘাত হয়।

তথাপি পাগল বলিল—সকলে যাচ্ছে, আর আমি যেতে পারবো না কেন? আমি সাধু-দর্শন ক'র্বো, আমাকে ছাড়, নইলে কামড়াবো—মারবো, এই বলিয়া সে বিকটাকার মূর্ত্তি ধরিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার তখনকার সেই কষ্টের অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, একটা বিষম যাতনায় যে তাহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হ'চ্ছে, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখ্‌লে বেশ বুঝতে পারা যায়।

সর্ব্বেশ্বর সিদ্ধাসনে কাহাকেও আসিতে দিতেন না, খুব অন্তরঙ্গ না হইলে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ সাধক দম্পতি কখন কি অবস্থায় থাকেন—তাহার ত' স্থিরতা নাই। বাহ্যজ্ঞান কখনও থাকে, কখনও থাকে না, হয়ত নগ্ন হইয়া বসিয়া থাকেন, সে সময় অপর কেহ দেখিলে পাছে নিন্দা করে এবং ব্রহ্মভাবের ভাবুক সাধকের নিন্দা শুনিলে পাছে তাঁহাদের প্রাণে পাপ স্পর্শ হয়, এইজন্য সর্ব্বেশ্বরের নিষেধ ছিল—কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আজ সর্ব্বেশ্বর কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। বিরূপাক্ষ কাছে বসিয়া আছেন। নির্ম্মলা স্বামীকে একখানি বাঘছাল পাতিয়া দিয়া আর একখানি রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্য আসনের কিছু দূরে পাতিয়া তাহার মধ্যে মাটী পরিষ্কার করিতেছেন। দ্বার-রক্ষক গোবর্দ্ধন একটু স্থানান্তরে হইয়াছে, এমন সময় সেই পাগলটা দৌড়িয়া আসিয়া নির্ম্মলার পাশে

পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা! সকলকে পায়ে রাখলি—সকলকে সোজা করলি—আমি কি এতই পতিত—পুত্র অপরাধী হইলেও ত' মা তাকে ছাড়ে না; তবে শিবের শক্তি হ'য়ে বুঝি পাষাণে প্রাণ বেঁধেছিস্? তুই যতই যা হ; আমি কিন্তু এই পড়্‌লাম, পা ছাড়্‌বো না" বলিয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল।

নির্ম্মলা শশব্যস্তে বিরু বিরু করিয়া ডাকিলেন—বিরূপাক্ষ দৌড়িয়া আসিলেন, ভাল চিনিতে পারিলেন না, তারপর গোবর্দ্ধন দৌড়িয়া আসিয়া অনেকক্ষণের পর চিনিল, এ যে বড়বাবুর শালা—মহিম, এর এমন চেহারা কেন?

মহিম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—গোব্‌রা রে! আমার যে চেহারা আছে—এই ঢের, এত পাপে কি আর চেহারা থাকে, পাপেই যে আকৃতির বিকৃতি হয়, আমি যে মহাপাপী, এই বলিয়া নির্ম্মলার প্রতি চাহিয়া বলিল—মা! সকলকে ক্ষমা ক'রলি, আর আমার প্রতি কি দয়া হবে না, বলিয়া অজস্রোরে কাঁদিতে লাগিল! ক্ষণিকের জন্ম পাগলের জ্ঞান হইয়াছে—সে কেবল পায়ের ধূলা মাথায় দেয় আর কাঁদে।

সকলের কথায় নির্ম্মলা যখন বুঝিলেন—এ মহিম, তখন ঠিক বাৎসল্য-প্রতিমা জননীর মত অতি স্নেহ-করুণ আশ্বাস বাক্যে বলিলেন—মহিম! তুমি কি পাপ করিয়াছ ভাই, তোমার এত শাস্তি, তোমার উপর আমার কোন অভিশাপ নাই—তুমি আশ্বস্ত হও। গোবর্দ্ধনের মুখে সংবাদ পাইয়া প্রমোদা ও সর্ব্বেশ্বর দৌড়িয়া আসিলেন। প্রমোদাকে দেখিয়া মহিম বলিল—"পাপিনি! তোর আদরেই ত' আমার এই সর্ব্বনাশ" বলিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সর্ব্বেশ্বর তাহাকে তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন এবং চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন কিন্তু মহিমের মস্তিষ্ক বিকৃতি আর সারিল না। শুনা যায়—খুনী-মকর্দ্দমায়

রামকমলের ফাঁসী হইলে, তাহার পক্ষীয় কোন লোক মহিমকে বিষ খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছিল। একমাসকাল সমস্ত পরিবারকে কষ্ট দিয়া মহিম অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রামেশ্বরের গুজার নাই, এত শীঘ্র মহিমের পাপ-দেহের অবসান হইল শুনিয়া নির্ম্মলা একটু দুঃখিত হইলেন। মা যে কখন কাকে কিরূপ করেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না, বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জ্ঞানানন্দ ও নির্ম্মলা সংসারের মধ্যে আর বাস করেন না। সর্ব্বেশ্বরই সমস্ত ভার লইয়া এতদিন বেশ সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু অতিরিক্ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। তিনি আর তাদৃশ কাজ-কর্ম্ম করিতে পারেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অবস্থাও শোচনীয় হইতে থাকে যদি তাহাকে ধর্ম্ম রসায়ণে সরল না করা যায়। দেহকে বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে যোগযুক্ত হওয়া দরকার কিন্তু আমাদের তাহা কই! ভবানী ও বাসুদেব বিরূদাদার সহিত সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া পিতাকে অব্যাহতি দিলেন। বিরূপাক্ষ পর হইলেও এখন সংসারের কর্ত্তা—তিনি এমন ভাবে এ সংসারে মিশিয়া গিয়াছেন যে—ভবানী ও বাসুদেব তাহাকে পর বলিয়া চিন্তা করিতেই পারে না—সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বিরূদার অনুমতি না লইয়া করে না—তিনি যাহাতে অমত করিতেন, ভবানী ও বাসুদেব কদাচ তাহা সম্পন্ন করিত না।

তড়িৎ খুব বুড়া হইয়া সেই যে দেশে গিয়াছে, আর আসে নাই—কিছুদিন পরে শুনিতে পাওয়া গেল—সে দেশেই মারা গিয়াছে। তড়িৎই সর্ব্বেশ্বরের বাহুবল ছিল। তাহার মৃত্যু-সংবাদ বড়বাবুকে বিষম লাগিল। তার পর হইতে তিনিও সংসার-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রায় বৎসরেক-কাল রোগ-ভোগ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছেন—রামেশ্বর ও নির্ম্মলা তাহাতে শোকাভিভূত না হইয়া ভবানীকে পিতার শ্রাদ্ধ বেশ জাঁকাইয়া করিতে অনুমতি দিলেন।

ইহার পর আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। পুত্রগণ বেশ সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রমোদা স্থবিরার ন্যায় জীবিত আছেন বটে কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বধূগণই এখন সংসারের কর্ত্রীরূপে নির্ম্মলার শিক্ষানুসারে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন। তবে আর কেন—কলির গতই ধন্য।

সাধক-দম্পতি একদিন ভাবে বসিলেন। ভবানী ও বাসুদেব পিতামাতাকে আহারাদি প্রদান করিয়া অনেক রাত্রি অবধি তাঁহাদের পদতলে বসিয়া কত ধর্ম্মের কথা, সংসারে পাকা হইবার জন্য কত প্রকার সৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া গৃহে শয়ন করিতে আসিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। রামেশ্বর ও নির্ম্মলা সেদিন গৃহের মধ্যে শয়ন না করিয়া আসনেই বসিয়া আছেন। যেন ভাব-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন—শরীরের স্পন্দন নাই, দেহের কোন বিকৃতি নাই। বাসুদেব মনে করিলেন—অন্যান্য দিনের ন্যায় জনক-জননী সমাধিস্থ হইয়াছেন কিন্তু এ যে ভাব-সমাধি, মহাপ্রস্থানের জন্য মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন—বাসুদেব তাহা বুঝিতে পারিল না। প্রায় দুই ঘণ্টা কোনপ্রকার বিরক্ত না করিয়া দেবদেবীর পদতলে বসিয়া তাঁহাদের চৈতন্যলাভের অপেক্ষা করিতে লাগিল কিন্তু বাহ্য-চৈতন্য আর হইল না। বেলা অবসান হইল—তথাপি পিতামাতার সাড়া নাই। বাসুদেব কাঁদিয়া অধীর হইলেন। বিরূপাক্ষ যজমান-বাড়ী গিয়াছিলেন, আসিয়া পরীক্ষা করিলেন—সব শেষ হইয়াছে। মায়ের ছেলে বহুক্ষণ হইল, মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। সংসারের মায়া তাঁহারা বহুদিন

হইতে কাটাইয়াছিলেন। ভবানী ও বাসুদেব এমন দেবোপম জনক-জননীর মৃত্যুতে যে কিরূপ আত্মহারা, কিরূপ দিশাহারা হইল—তাহা লিখিয়া জানাইবার ভাষা আমাদের নাই। তাহারা আকুলি বিকুলি করিয়া কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। প্রতিবাসী, আত্মীয়-স্বজন এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া পিতৃমাতৃ-হীনের ন্যায় শোক-সন্তপ্ত হইল। সেদিন এই দারুণ শোকে পাড়ার লোকের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না! সকলেই হায় হায় করিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাটিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিল।

সাধক-দেহের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় নাই—মৃত্যু জন্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহ কোনও প্রকার মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। সেই হাসি হাসি মুখ, সেই যোগ-জ্যোতিপূর্ণ অঙ্গ-শোভা সমভাবেই রহিয়াছে—দেখিলে মৃত-দেহ বলিয়া কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। রামেশ্বর ও নির্ম্মলার স্বর্গারোহণের কথা যে শুনিল সেই দেখিতে আসিল—তাঁহাদের পরম পবিত্র পদধূলি লইয়া কৃতকৃতার্থ হইল। দেবীপুরে সেদিন মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শিষ্যবর্গ যাহারা শুনিল—তাহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই সাধন-পীঠে দেব-দর্শনে আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। ডেপুটী অনাথশরণ ও বিভূতিভূষণ এই দেবকল্প সাধক-দম্পতির শেষ দর্শনে দেবীপুরে আসিয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে শব-সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যয়ে রামেশ্বর ও নির্ম্মলার দানসাগর শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। নির্ম্মলা শাশুড়ীর মৃত্যু দেখিয়া যেরূপ আশা করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার আশীর্ব্বাদে তিনি তৎফললাভে পতিসহ স্বর্গে গমন করিলেন। রামেশ্বর ও নির্ম্মলার বিয়োগে দেবীপুর আজ শ্মশানে পরিণত হইল। যতদিন তাঁহারা জীবিত ছিলেন—কোন প্রকার আধি-ব্যাধি এ পবিত্র স্থানের দিক দিয়াও আসিতে পারে নাই।

মহাপুরুষ যেখানে অবস্থান করেন, ক্রোশব্যাপিস্থানের গগন-পবন পবিত্র করিয়া যে তথায় স্বর্গীয় সুধাধারা সিঞ্চিত হইতে থাকে ? মঙ্গলময়ী মা যে সে স্থানের রক্ষণাবেক্ষণে সদা নিযুক্ত থাকেন কোনও প্রকার অমঙ্গল তথায় প্রবেশ করিতে পারে কি ?

সাধকের মৃত্যুর পর অবধূত-প্রদত্ত সেই চণ্ডীর পুঁথিখানি, যাহার দ্বারা রামেশ্বর কত অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন—বিরূপাক্ষ তাহার সাহায্যে সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্ত এক দিন গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। হটাৎ পুঁথিখানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া গেল। আর পাওয়া গেল না। মহাপুরুষের বাক্য সফল হইল।

"গীতা" যোগ শাস্ত্র, "চণ্ডী" সাধন তন্ত্রের অমোঘ অস্ত্র, যাহার তাহার হাতে এ শাস্ত্র, এ অস্ত্র, যদি শোভা পাইত—সুফল প্রদান করিত, তাহা হইলে এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, এত কৃচ্ছ্র সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হইত না। আজকাল আমরা এই দুইখানি শাস্ত্রকেই নকড়া-ছকড়া করিতেছি।

উপসংহার

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া একে একে সিঁড়ি ভাঙ্গিবার মত সাধন-বৃক্ষে আরোহণ করিলে যে অতি শুভ ফল লাভ হয়, তাহা আমরা রামেশ্বর ও নির্ম্মলার পরমপবিত্র চরিত্রে বিশেষভাবে দেখাইয়াছি। ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া, পিতৃ-পিতামহের ক্রিয়া-কলাপে শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া অহংভাবে বিভোর হইলে পরিণামে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদাই তাহার একমাত্র প্রমাণ স্থল।

এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে মানুষ একেবারে কাম-কামনা বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগের পথে ধাবমান হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য কেহ তাহা পারে নাই—পারিবার আশাও যেন না করে। ত্যাগ বা সন্ন্যাস জিনিসটা সহজ নহে, তাহার সাধক হইতে হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ আশ্রয় না করিলে উপায় নাই; একেবারে বড় হইতে যাইলেই পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। তবে যাঁহাদিগকে এক জন্মেই বড় হইতে দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের যে বহুজন্মার্জ্জিত সাধন-সংস্কার ছিল—তাহাতে কেহ কোন সন্দেহ করিবেন না।

সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। এইজন্য সাধনার আবশ্যক। কলির জীবের পক্ষে তন্ত্রোক্ত সাধনাই প্রশস্ত। বৈদিক সাধনার সময় ইহা নহে। জীবের পরমায়ু অতি অল্প, এইজন্য পরম করুণাময় সদাশিব কলির জীবকে তন্ত্র মানিয়া সাধনা করিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে আশু সিদ্ধিলাভ করিয়া জীব শিব হইতে পারে—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবার শক্তি সহজেই লাভ হইয়া থাকে। বেদ

ও তন্ত্র ভিন্ন-শাস্ত্র নহে—আগম-নিগম একই শাস্ত্র কিন্তু তন্ত্রের নামে এখন অনেক আধুনিক শিক্ষিত বাবু নাসিকা কুঞ্চিত করেন কেন তাহা বলিতে পারি না, তবে তন্ত্রশাস্ত্র যে জীবের অবস্থানুসারে সাধনার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন—ইহা সত্য। খাঁটি মানুষ না হইলে, পরম পবিত্র সাধু-চিত্ত না হইলে, বৈদিক সাধনা যেমন অবলম্বন করা যায় না। তান্ত্রিক সাধনা তাহা নহে—ইহা সার্ব্বজনীন; তুমি যে অবস্থারই লোক হও—সকাম নিষ্কাম হও, কাম-কামনায় যেরূপভাবেই আসক্ত হও, তন্ত্রের শীতল ছায়াতলে আইস, তোমাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া খাঁটি করিয়া ঠিক সাধনার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া দিবে—এমন উদার ভাব আর কোন সাধনায় নাই।

তবে অনেক হীনমতি পাষণ্ড লোক তন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া, এই সাধন-পন্থায় লোকের অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে। কিছু জানে না, বুঝে না—অজস্র মদ্যপান, নারী সংসর্গ করিয়া ঢলাঢলি করিয়া ফেলে। এজন্য সকলে তন্ত্রের এই উপাসনার পন্থা দেখিয়া ভয় পায় কিন্তু ভুলেও বিশ্বাস করে না যে, ভগবদারাধনার সুগম-পন্থা প্রদর্শন করিতে গিয়া সকল জ্ঞানের আধার দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেব কি ভ্রষ্টাচারের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন? এ কথা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে; পরম কারুণিক মঙ্গলনিদান সদাশিব কখনও এরূপ উপদেশ দিতে পারেন না। তবে জগদ্গুরু শিব সাধকের অবস্থানুসারে সাধনার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন-কর্ত্তা; জগতের সৃষ্টি তাহা হইতেই আরম্ভ। জীবের ধাতুজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান তাঁহার যেমন আছে—তেমন আর কাহারও নাই। কোন্ অসুখে কি খাওয়াইতে হয়, কোথায় নিম্-কোথায় শর্করার প্রয়োজন, তাহা তিনি যেমন বুঝেন—সেরূপ আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

এই জন্য অধিকারী-ভেদে তিনি তন্ত্রের সাধন-ভেদ করিয়াছেন। সকামীর জন্য সকামভাবের সাধনা—নিষ্কামীর জন্য নিষ্কামভাবে সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই প্রধান। যাহার পন্থা অনুকরণ করিয়া কার্য্য করিলে, সাধক নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন। এই গ্রন্থের শ্রোতা—ভগবতী পার্ব্বতী দেবী, বক্তা—দেবদেব মহেশ্বর। প্রথম মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে ব্রহ্ম-উপাসনার প্রণালী, নিষ্কাম-সাধনার পন্থা লিপিবদ্ধ করিয়া ভগবান্ বলিলেন—দেবী! তুমি জগতের আদিভূতা– আদ্যাশক্তি. তোমার উপাসনায় জীব—ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়া অন্তে পরমগতি লাভ করিতে পারে কিন্তু যাহারা একেবারে অজ্ঞ, কোন ভয় যাহাদের নাই—হৃদয় যাহাদের পাষাণ, ব্যভিচার যাহাদের চির-অভ্যস্থ—না হইলে থাকিতে পারে না, তাহাদের কি তবে উপায় হইবে না! তাহাদের জন্য ভগবান্ সদাশিব সকামভাবের উপাসনা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, লোকের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে লোক মদ্য-মাংস না হইলে উপাসনার দিকে ঘেঁসে না, তাহাকে সেই কামনার মধ্য দিয়াই নিষ্কামী হইবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। আর যাহাদের হৃদয় গঠিত হইয়া মানুষের মত হইয়াছে, সাধনার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, তাহাদের সুগম পন্থাও তিনি দেখাইয়াছেন।

যাহারা বুঝে না—তাহারাই তন্ত্রকে একটা ঘৃকারজনক সাধনা বলিয়া বিবৃত করে এবং আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিতে যায়। তন্ত্র আধুনিক নহে—যতদিন বেদ, ততদিন তন্ত্র। ত্রিতাপতপ্ত অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে এমন প্রাণারাম সাধনা আর নাই।

হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষয়ভাণ্ডারে না আছে কি? ইহপরকালের কত অজানিত, অগণিত, অপ্রকাশিত তত্ত্ব সরল ভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে

অনুসন্ধান করিয়া সাধনায় জীবন সার্থক করিতে না পারিলে দোষ কার? তাই বলি—হিন্দুধর্ম্মের সুবিমল কিরণে পরিপ্লুত হইয়া ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ করিতে হইলে, অমৃতের সন্তান—তোমরা ইহার অমর দুন্দুভি নাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত কর, এই অতুলনীয় ধর্ম্মের সুযশ মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়া চির অমরত্ব লাভ কর। তোমাদের ধর্ম্মে কিছু নাই—ইহার সমস্ত মিথ্যা, পরের মুখে এ কথা শুনিয়া বিচলিত হইও না। ঘরের অমৃত ফেলিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণের জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়া কি উচিত? আত্ম-মর্য্যাদা ভুলিয়া পরের পদলেহন করিয়া এত বড় একটা মহৎ জাতির কলঙ্ক ঘোষণা করা বাতুলতা নয় কি? যে দেশের যে জাতির মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ করিতে না পারিয়া পরের দোহাই দেওয়া নীচতার কার্য্য। যে দেশে তুমি জন্মিয়াছ—ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা কত কত মহাপুরুষের, কত কত অবতারকল্প সাধু-সন্ন্যাসীর পদ-রজে স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও পবিত্র হইয়াছে। এ দেশের মাটী গায়ে মাখিলেও জীবন ধন্য হয়-প্রাণ পবিত্র হয়। এ দেশের একটা সামান্য বালক অধ্যাত্ম-তত্ত্বের যে সন্ধান রাখে, অন্য দেশের অতি শিক্ষিত লোকেও তাহার কিছুই জানে না। এইজন্য তোমার এই দেশ—এই জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। অতএব মহা সৌভাগ্যবান্ না হইলে—এই দেশে জন্মিয়া, এই পবিত্র ধর্ম্মের সাধন-ভজনের অধিকার লাভ করিতে পার না।

নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে—এবং আমাদের কর্ম্মদোষে ইহা পতিত হইয়া গিয়াছে; নতুবা ইহার যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহা অদ্যাবধি কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এই দেশের এবং ধর্ম্মের কণিকামাত্র আভাষ লইয়া অন্য দেশ আজকাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—বড় হইয়াছে।

এককালে ভারত আধ্যাত্মিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। জগতের কোন দেশ অদ্যাবধি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে

নাই—পারিবেও না, ইহার সামান্য পশুপক্ষীও যে আধ্যাত্মিক রসের রসিক। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে কখনও কোন অভাব ছিল না তাই দেশের লোককে দেশ ছাড়িয়া কোথায় যাইতে হইত না; ঘরে বসিয়াই আপনাদের অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিত, জড়-বিজ্ঞানের সাহায্য তাহাদের আবশ্যক হইত না, কারণ ভারত চিরদিনই সুজলা সুফলা ছিল—ভাতের ভাবনা, উদরের চিন্তা তাহাদিগকে করিতে হইত না—তাই ভারত ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণে এত বড় হইয়াছে। ভারতের পবিত্র তপোবনে তাই বেদঝঙ্কার মুখরিত হইত, পশু-পক্ষী তাহার তালে তালে নৃত্য করিত, হিংসা ও দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন ধন্য করিত!

আজ সেই আর্য্য ঋষির পরম পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা সমস্ত ভুলিয়াছি—পরের ভাবভাবে মত্ত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত দীন-দরিদ্রের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি আজ সাধন-ভজনে, আচার বিচারে—পরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছি—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা—ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

ভাই মাতৃভক্ত সাধক—মায়ের সুসন্তান ভারতবাসী! ভগবানের সেই অমোঘ বাণী "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" স্মরণ করিয়া আবার ধর্ম্মের জন্য, আত্মোন্নতির জন্য কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত হও; রামের ... বর্ম্মলার ন্যায় মাতৃ-মহামন্ত্র জপে হৃদয়-মন দৃঢ় কর। মাতৃশক্তি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে—আবার তোমরা যোগ-যাগে অলৌকিক শক্তিমন্ত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে, দেশের সমস্ত অভাব-অভিযোগ বিদূরিত করিতে পারিবে। বিনা শক্তির সাধনা—এ ভারত কখনও জাগিবে না। সব-সাধনাই শক্তি-সাধনা, ভারত-শ্মশানে

...রুর সান্নিধ্যে এই মহামন্ত্র সাধনে তৎপর হও, জীবনে নির্ভীক হইয়া, ...র প্রাণে মৃত্যু-পরপারে যাইবে। ভাই! এমন উন্নত সাধনা আর ...। উঠ—জাগ, সাধক। ঐ দেখ, ত্রিদিবেশ্বরী বরাভয়-হস্তে তোমা- ...শিয়রে দণ্ডায়মানা! গললগ্নীকৃতবাসে এস, তাঁহার ভবারাধ্য-পদে ...ম করিয়া আজ আমিও আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

...মা ভবানী, ভবরাণী! তোমার চিরতৃষিত অধম সন্তানের প্রতি কৃপা ...ক্ষ করিলে কই মা! আমি কি ভারবাহী বলদের মত চিরদিনই এই ...র-ভারে প্রপীড়িতই থাকিব? ভূভার হরণের জন্য তুমি কতরূপে ...সাধকের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতেছ, তোমার কৃপাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত ...। তোমার এই দাসানুদাস মানবজন্ম সফল করিয়া তোমার শ্রীপাদ- ...র অধিকারী হইতে পারিবে না, দয়াময়ী মা থাকিতে কি আমার সে ... পূর্ণ হইবে না জননী? আমার আমিত্ব ভুলাইয়া তোমার পরম ...ত্বে আমাকে ডুবাইয়া দাও, আমি মা-ময় প্রাণে দেব জন্ম লাভ করি, প্রসীদ পরমেশ্বরী জগজ্জননী।

ওঁ তৎসৎ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

ব্রহ্মার্পণমস্তু।